রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়



করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দাম পঁচিশ টাকা

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী স্বর্গতা অপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই গ্রন্থ প্রণতচিত্তে অর্পিত হল।

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমান্ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় আমার ছাত্র এবং আমার কাছে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেছেন। গবেষণার বিষয়—বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ, 'রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ।' এম. এ. পাস করার পর তিনি আমার কাছে একদিন গবেষণাকর্মের বিষয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। ছাত্র হিসেবে যখন তিনি আমার সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তখনই তাঁর বিশ্লেষণশক্তির নৈপুণ্য দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম পরে তাঁকে কোন-একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকর্মে উৎসাহিত করব? কিন্তু তিনি নিজেই সেই প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং আমি সানন্দে তাঁর নির্দেশক হতে সম্মত হলাম। তাঁর গবেষণার বিষয়টি আমার কাছে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং মূল্যবান মনে হল।

রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী 'কবির্মনীষী'। মানুষের হৃদ্‌গত ও চিদ্‌গত—সর্ব-বিভাগেই তাঁর অবারিত পরিক্রমা। 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'—রবীন্দ্রনাথকেও সেইভাবে অভিহিত করা যায়। রসলোকের তীর্থযাত্রী হয়েও তিনি যে মননের মর্ত্যপরিক্রমায় সহজ পদচারণা করেছেন তা তর্কাতীত সত্য এবং তথ্যদ্বারা সমর্থিত। বস্তুত এ ধরনের বৈপরীত্যের সমাবেশ একমাত্র গ্যেঠে ছাড়া ওদেশেও আর কোনও সারস্বত-সাধকের মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনায় অসাধারণ চিন্তনের পরিচয় দিয়েছেন। আনন্দসরোবরের রাজহংস হয়েও তিনি বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির সাহায্যে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের মৌল তাৎপর্যগুলি বুঝি নেবার চেষ্টা করেছেন, পাঠককেও সে আলোকের অংশীদার করেছেন। কিন্তু স্বকৃত রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও আলোচনা যে অতিশয় মূল্যবান এবং যুক্তিনিষ্ঠ তা তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ- নিবন্ধ, চিঠিপত্র, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি থেকেই বোঝা যাবে। শ্রীমান্ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই দিকটি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব করলে আমি সাগ্রহে তাঁর গবেষণাকর্মের নির্দেশক হতে সম্মত হলাম। কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার অযুত সমারোহের মধ্যে তাঁর এই দিকটি কিছু উপেক্ষিত হয়েছে। নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ও মূল্য-বিচার যে কতটা যুক্তি-অনুযায়ী, এবং সেই আলোচনা থেকে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক মনঃপ্রকৃতির যে নিপুণ পরিচয় পাওয়া যায়—এ কথাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রমাণ করা সম্ভব।

[ছয়]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তা সম্বন্ধে দু-এক কথার অবতারণা করা যেতে পারে। সাহিত্য, সৌন্দর্য ও আনন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট ধারণা আছে। এই তত্ত্ববাদ তিনি দার্শনিকসুলভ মননচর্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেননি, এখানে তাঁর সঙ্গে কোলরীজের চারিত্রগত পার্থক্য আছে। অবশ্য কেউ কেউ সৌন্দর্যতত্ত্ব, রসবাদ, কল্পনা এবং দর্শনতত্ত্বের আলোয় তাঁর রসবিচারপদ্ধতি বুঝে নিতে চেয়েছেন। প্রথম যৌবনে কল্পনাশক্তির অতি-প্রাধান্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারে সৌন্দর্যবাদের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সমস্ত শিল্পকলার আদিম এবং মৌল লক্ষণ হল সৌন্দর্যসৃষ্টি, যে সৌন্দর্য স্রষ্টা বা ভোক্তাকে আনন্দলোকে নিয়ে যায়। এ ধরনের অস্পষ্ট সিদ্ধান্তের আভাস তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কোন কোন আলোচনায় পাওয়া যায়। পরে ধীরে ধীরে তিনি যখন আনন্দবাদের দ্বারা পরিপ্লাবিত হলেন তখন ঔপনিষদিক তত্ত্বরসে স্নান করে, রস এবং রসের পরিণাম যে নিঃশ্রেয়স নিঃস্পৃহ চিদানন্দময় ও সর্বাত্মক দিব্যানুভূতিতে উদ্বর্তিত হয়, তা জীবনপ্রত্যয়ের মধ্যে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। কিন্তু এখানে থেমে গেলে তাঁকে আমরা আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত ও লংগাইনাসের সমগোত্রীয় বলে মনে করতাম। পরবর্তীকালে তিনি জোর দিলেন 'অনন্ত'তত্ত্বের ওপর। শিল্প-সাহিত্য মূলত অনন্তবোধের সান্ত মূর্তিমাত্র। এই অনন্ততত্ত্বের দ্বারাই সর্বভূমিব্যাপ্ত বোধ ভোক্তার কাছে ব্যক্তিক রূপ গ্রহণ করে এবং অস্পষ্ট ও অধরা ব্যাপার ইন্দ্রিয়ময় রূপসত্তায় পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচার ও ব্যাখ্যায় বিশেষ কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি প্রধানত নিজস্ব বোধ ও চিন্তাপ্রণালীর দ্বারাই সাহিত্যসৃষ্টির মূল রহস্য বুঝে নিতে চেয়েছেন। সাময়িক পত্রের সমালোচক হিসেবে তাঁকে প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা করতে হয়েছে প্রচুর। তখনি তিনি সাহিত্যের মূল্য পরিমাপের কথা ভেবেছিলেন। সুতরাং পূর্ব-পরিকল্পিত কোন মনগড়া থিওরি নয়, নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতেই তিনি নানা সময়ে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা ভেবেছেন। এই ভাবনা যে সদাসর্বদা বিবর্তনবাদের বিকাশতত্ত্ব ধরে অগ্রসর হয়েছে তা মনে হয় না। তাঁর চিন্তাপ্রণালী বহুবার বাঁক নিয়েছে, অনেক সময়ে তাঁর পূর্বতন সিদ্ধান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্তের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। এর কারণ পেশাদার সমালোচকদের মতো তিনি কোন অটল অনড় তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। জীবনের পথে চলতে চলতে তিনি যা কুড়িয়ে পেয়েছেন তাকে সাগ্রহে সঞ্চয়ের ঝুলিতে স্থান দিয়েছেন।

তাঁর সাহিত্যবিচারপদ্ধতির একটা বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে স্বকৃত রচনার মূল্য বিশ্লেষণে। পৃথিবীতে সর্বযুগে অনেক রসস্রষ্টা রসপ্রমাতার ভূমিকা গ্রহণ করে সাহিত্যাঙ্গনে হাজির হয়েছেন। অনেক কবি সমালোচক বা রসবিশ্লেষক হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত হয়েছেন। বোধ হয় তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে রসসত্যকে মননসত্যরূপে চিনে নিতে অধিকতর উৎসাহী হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা সম্পর্কে নিজেই 'ধূম্রলোচন সমালোচক' হয়ে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর ঐতিহাসিক কারণ সহজেই অনুমেয়। উনিশ শতকের চলতি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যুবক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে সব সময়ে অভ্যর্থিত হয়নি তা বোধ হয় অনেকের জানা আছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গিমার অপূর্বতা ও সৃষ্টিকলার উপাদানগুলি সেকালের অভ্যস্তরুচির পাঠকসমাজে সহজে ছাড়পত্র পায়নি। তাঁকে অর্থসন্ধানী ও তাৎপর্যবাদী পাঠকদের যৌক্তিকতা ও ঔচিত্যের কাঠগড়ায় বহুবার আসামীরূপে হাজিরা দিতে হয়েছে। সহৃদয় ও অনুকূল পাঠকও অনেক সময়ে তাঁর অভিনবত্বের নাগাল ধরতে পারতেন না। চন্দ্রনাথ বসু তো স্পষ্টই সে কথা কবুল করে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ, তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ ·· রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।" এ তো অনেকটাই মুগ্ধ ভক্তের, পরাভূত অনুরাগীর সানন্দ-স্বীকৃতি। এর উল্টোও হয়েছে। অনেকে রবীন্দ্রকাব্যকলার গহনে অবতরণের সামর্থ্য রাখতেন না, ফলে তাঁর লেখার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তর্কযুদ্ধে যেমন স্তরভেদ আছে, সাহিত্যবোধেও তার অপ্রতুলতা নেই। পাঠকের চরিত্রগত অক্ষমতা যে সাহিত্যব্যাপারে বিভ্রাট সৃষ্টি করে, পরিতাপের বিষয়, অনেক 'দিঙনাগ' তা মানতে চান না। তাই উনিশ শতকের সমাপ্তি কাল থেকে বিশ্বসারস্বতক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যরসিক পাঠক তাঁর রচনায় ঠিক মানসিক স্বস্তি বোধ করতে পারতেন না, নিজেদের উপলব্ধি ও বোধের দারিদ্র্যকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবৈগুণ্য বলে মনে করতেন। ফলে আহত কবি (কারণ কবিরা সহজেই স্পর্শকাতর) নিজের রচনাকর্মগুলিকে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ মননবৃত্তির সাহায্যে নিজের কাছেই স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। প্রতিকূল সমালোচক, উদাসীন পাঠক ও অনুরাগী সুহৃদের কথা স্মরণ করে তাই তাঁকে নিজ রচনার সমালোচক সাজতে হয়েছিল। নিজের কাব্য, নাটক ও গদ্য রচনা সম্বন্ধে তিনি এত

বেশি বলেছেন ও লিখেছেন যে, সংগ্রহ করলে সেগুলি একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থের আকার লাভ করতে পারে। বর্তমান গবেষক ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিশাল পরিধি বিবেচনা করে শুধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধেই তাঁর অভিমতগুলির বিশ্লেষণ ও মাপজোখ করেছেন। ভালোই করেছেন। তা নইলে একটি গবেষণায় তার পূর্ণ রূপ অবধারণ করা সম্ভব হত না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি পর্বকে লেখক মোট পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত করেছেন—প্রাক্‌মানসী পর্ব, সোনার তরী-চিত্রা পর্ব, গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা পর্ব, পুনশ্চ পর্ব। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে আলাপে আলোচনায় চিঠিপত্রে ভাষণে নিজের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। কবিদের অন্তঃপুরের খবর পাঠকদের স্বতই কৌতূহল জাগিয়ে থাকে। কোন্ মানসিক অবস্থায়, পরিবেশে এবং অভিজ্ঞতায় অস্পষ্ট আবেগ, ভাবের ছায়ামূর্তি এবং অশরীরী বোধ কিসের শাখায় ভর করে কবির চিত্তলোক থেকে নেমে এসে বাঙ্‌মূর্তি গ্রহণ করে, মনোবিজ্ঞান তার সম্বন্ধে নানা গবেষণা করছে। কিন্তু যাঁরা কবিতার সহৃদয় পাঠক এবং তথ্য-তত্ত্বের প্রতি বিশেষ কৌতূহলী নন, তাঁরা কাব্য-উৎসের মূল রহস্য কবির অন্তর্জীবন থেকেই খুঁজে নিতে চান। সেক্ষেত্রে কবির মত ও মন্তব্যগুলি তাঁদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করতে বসে আমাদের লেখক রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় অভিমতগুলিকে বিশ্লেষণ ও তৌল করতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের অভিমতের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করেননি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন—যাঁরা রবীন্দ্র-জীবন, কাব্য ও সাধনা সম্পর্কে তথ্যের আকরবিশেষ, আমাদের গবেষক তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষসাক্ষাতের দ্বারা অনেক সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করেছেন।

সুখেন্দুসুন্দরের মূল উদ্দেশ্য—বড়ো কবি বড়ো সমালোচক হতে পারেন কিনা সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান। যাকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রীরা বলেছেন 'ভাবয়িত্রী' ও 'কারয়িত্রী' প্রতিভা। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল ও বিচারশীল মানসিকতার উপযুক্ত সমন্বয় রবীন্দ্রচেতনায় কতটা পরিলক্ষিত হয়েছে তা তিনি রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য সম্বন্ধে মতামত থেকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। তিনি নানা তথ্যাদি উল্লেখ করে য়ুরোপীয় সমালোচনাপদ্ধতির ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারা প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর আলোচনা করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্লেষণপদ্ধতির মৌল পন্থাগুলি ধ্বনি, রস, ঔচিত্য, বক্রোক্তি প্রভৃতি পারিভাষিক ব্যাপার। পরিশেষে তিনি বাংলা সাহিত্যবিচারের ধারাটিও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন।

এইভাবে তিনি সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে সাহিত্যবিচারপদ্ধতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি মানদণ্ড তৈরি করে নিয়ে তার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের মতামত বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত যাচাই করতে গিয়ে তিনি এই তথ্যগুলির উপর বেশী নির্ভর করেছেন.—জীবনস্মৃতি-আত্মপরিচয় ধরনের স্মৃতিমূলক ও আত্মকথানির্ভর গ্রন্থ, ডায়েরি ও ভ্রমণকাহিনী. চিঠিপত্র, নিজের গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, কারো কোন প্রশ্নের উত্তরে লেখা চিঠির মাধ্যমে নিজ সৃষ্টির ব্যাখ্যা, শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ, বক্তৃতা, আলোচনা, অন্যত্র প্রদত্ত ভাষণ, অন্যের রচিত গ্রন্থে নিজের প্রসঙ্গ (যেমন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ') এবং কোন কোন কবিতায় নিজের কাব্যধারা সম্বন্ধে মন্তব্য। সব দিক বিচার করলে লেখকের এই পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার ঊর্ধ্বে কতদূর উঠতে পেরেছেন, লেখকের প্রধান গবেষণার ক্ষেত্র এইটাই।

সুখেন্দুসুন্দর রবীন্দ্রনাথের মতামত বিশ্লেষণে সর্বদা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেগ যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। পাঠকগণ এই আলোচনায় লেখকের একটি নিঃস্পৃহ মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাবেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জীবনদেবতা তত্ত্ব ও উর্বশী কবিতার আলোচনা। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তার পাশা-পাশি রেখেছেন রবীন্দ্র-সমালোচকদের অভিমত এবং পরিশেষে তিনি নিজস্ব সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের তথ্য ও তত্ত্বের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার আর একটি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাবে 'পুনশ্চ' বর্গের কাব্যগ্রন্থের আলোচনায়। গদ্যকবিতার রূপ-রীতি প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত তথ্যের আয়োজন করেছেন এবং সেগুলিকে একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তের অভিমুখে পরিচালিত করেছেন, তাতে তাঁর বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী রীতির প্রতি বস্তুনিষ্ঠ আনুগত্যই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও তিনি উপসংহারে 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজোর' কথা বলেছেন, তবু এ গ্রন্থের সর্বত্র তাঁর নির্ভেজাল যৌক্তিক সিদ্ধান্তই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্য বাঙালীর সর্বসত্তার ঊর্ধ্বায়নজনিত মানসিক রসায়নে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে এখনও আমরা, যারা পাটোয়ারীবুদ্ধির অধিকারী নই এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভকে জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে করি না, তারা রবীন্দ্রভাবানুষঙ্গের মধ্যেই ডুবে আছি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নানা-

ভাবে দর্শন করে মানসিক সুখানুভূতিলাভ জীবনচর্যার একটা বড়ো সম্পদ বলে গণ্য হবে। লেখক সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্টিপর্বের একটি প্রায়-অনালোচিত দিক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। এর দ্বারা তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছেন এবং আমরা পেয়েছি একখানি মৌলিক আলোচনাগ্রন্থ, যাতে চিন্তার তির্যকতা ও প্রকাশের চারুত্ব উভয়ই মিশ্রিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক, তাঁরা এই আলোচনা থেকে রবীন্দ্র-রহস্যপ্রাসাদের অনেক অন্ধকার কক্ষ আলোকিত দেখতে পাবেন। একালে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি সম্পর্কে ছোট-বড়ো মাপের অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। তার ভিড়ে সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের বইটি হারিয়ে যাবে না বলেই আমার ধারণা। পরবর্তী গবেষণায় তিনি রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা গদ্য ও নাটক সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মতো বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনা করে এই দিকটির পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করুন, এই কামনা করি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার বাসনায় 'রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিতে যে চেষ্টা শুরু করি সেই চেষ্টারই প্রথম ফসল 'রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ' নামক আমার গবেষণা নিবন্ধটি। উক্ত 'থিসিস'-এর সাধারণ পাঠোপযোগী ঈষৎ সংক্ষেপিত সংস্করণ 'রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত হল। প্রস্তুত গ্রন্থটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকারকে পি-এইচ. ডি. উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রধান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন আমার গবেষণা নির্দেশক। অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। তিনজন পরীক্ষকই বর্তমান আলোচনায় প্রসন্ন হয়ে লেখককে আশাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। আজ সর্বপ্রথমে এঁদের সকলকেই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

গ্রন্থরচনার সূচনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত কল্যাণ কামনা ও শুভাশিস নিয়ে যিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন, যার সঙ্গে আলোচনায় গ্রন্থের বহু দুরূহ অংশ সহজ করে নিতে পেরেছি, তিনি আমার পিতৃদেব শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্বশাস্ত্রী। মা-কে জ্ঞানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তবু জীবনের মর্মমূলে বসে তিনিই আমাকে সব কাজে উৎসাহিত করছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। মায়ের স্মৃতি-উদ্দেশে পিতার চরণে গ্রন্থটি অর্পণ করে আজ কিছুটা তৃপ্তি বোধ করছি।

স্বকাব্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই দুরূহ ও শ্রমসাধ্য গবেষণা কাজে প্রতিনিয়ত যাঁর প্রেরণা, উপদেশ ও নির্দেশ লাভ করেছি, যাঁর সুচিন্তিত আলোচনার অকৃপণ সহায়তা লাভ করে সাফল্য লাভ করতে পেরেছি সেই আমার পরম ভক্তিভাজন আচার্যদেব ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার ঋণের কথা বহুভাবে বলেও শেষ করা যায় না। আচার্যদেব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার গ্রন্থটি পুনশ্চ পাঠ করে ছাত্রের প্রতি স্নেহবশে ও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই গ্রন্থটির একটি মূল্যবান 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছেন। তাঁর

সুলিখিত এই ভূমিকাটি গ্রন্থের বিশেষ গৌরব। আজ শিক্ষাগুরুর প্রতি সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। প্রণাম জানাই অধ্যাপিকা বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে—যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ভিন্ন এই গ্রন্থ আদৌ লিখিত হত কিনা সন্দেহ। গবেষণা কাজের নানাস্তরে যাঁর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছি সেই আমার শিক্ষাগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকেও প্রণাম জানাই।

তথ্যাদির ব্যাপারে অনেকের সহায়তা লাভ করে ধন্য হয়েছি। গ্রন্থমধ্যে তাঁদের সকলের নাম ও গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সব গ্রন্থকার ও গ্রন্থাদির প্রতি ঋণ স্বীকার করছি যাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছি। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় আমার প্রধান কৃতজ্ঞতা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ পৃথক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থমধ্যে অতি বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্র-বক্তব্য উদ্ধৃত করতে হয়েছে তার কারণ প্রস্তাবনাতেই জানিয়েছি। রবীন্দ্রজীবনী চারখণ্ড থেকেও আমরা প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে মূল্যবান উপদেশ লাভ করেছি। এই গবেষণা বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য ও সংবাদ দিয়ে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রতথ্যাবলীর ভাণ্ডারী শ্রীপুলিন-বিহারী সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা। তাঁদের সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সদনের আবেক্ষক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিছু কিছু চিঠিপত্র পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়েছি। রবীন্দ্রসাহিত্যসংক্রান্ত নানা উপাদান—দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাদি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। তাঁর বিশেষ সৌজন্যে 'বলাকা'র কবিকৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার মূল পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং উক্ত পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করতে পেরেছি। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গ্রন্থপ্রকাশের আনন্দে আজ কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসাহ, পরামর্শদাতা শুভৈষী সকলের ঋণ স্বীকার করি। সকলের নাম করা সম্ভব নয় তবু কয়েকজনের নাম করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক অগ্রজপ্রতিম ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গ্রন্থবিষয়ে নানা আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তাঁর সস্নেহ ব্যবহার আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ডায়মণ্ডহারবার

ফকিরচাঁদ কলেজের বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় লেখককে গবেষণার কাজে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। গ্রন্থের প্রকাশ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন—বঙ্গবাসী কলেজের (নৈশবিভাগ) অধ্যক্ষ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, দেশবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্যামাপ্রসাদ কলেজের কার্যকরী অধ্যক্ষ শ্রীসমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধুবর অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের গ্রন্থগারিক শ্রীতপনকুমার সরকার। এঁদের সকলের প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা অসীম।

গ্রন্থপ্রকাশের কাজে অগ্রসর হয়ে নানাজনের কাছ থেকেই নানাভাবে উৎসাহ পেয়েছি। উৎসাহ দিয়েছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নীলরতন সেন, সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দর্শন চৌধুরী, শ্রীরামেশ্বর শ', ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমরেন্দ্র গণাই ও শ্রীজানকীনাথ পাঠক।

আত্মীয়স্বজনদের শুভেচ্ছা উৎসাহ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আজ গ্রন্থ প্রকাশে আমারই মত আনন্দিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত জগৎপতি চোধুরী, শ্রীমতী সবিতারাণী দেবী। এঁদের উভয়কেই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

গ্রন্থের ভাষাগত প্রাঞ্জলতার দিকে যাঁর দৃষ্টি ছিল সুতীক্ষ্ণ এবং নির্ঘণ্ট প্রণয়নের বিরক্তিকর কাজ যিনি অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন তিনি আমার সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী শ্রীমতী রেণু গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থ রচনাকালে যাদের মুখের দিকে চেয়ে পরিশ্রম অনেক লাঘব হয়েছে তারা সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়।

'করুণা প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রুফ দেখার কাজে যাঁর সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থ যে পরিমাণে মুদ্রা প্রমাদযুক্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দোষযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হত সেই শ্রীতুলসী দাসকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কল্যাণী থেকে কলকাতা প্রুফ আনা নেওয়ার কাজে গ্রন্থপ্রকাশের শেষ পর্যায়ে যার সহযোগিতা লাভ করে উপকৃত হয়েছি সেই শ্রীমান প্রবালকান্তি হাজরা, এম. এ. কে আমার স্নেহাশিস জানাই।

পরিশেষে বলি, যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়েই গেছে যেমন, ১০ পৃষ্ঠায় 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতার নাম ভ্রমক্রমে দুবারই ছাপা হয়েছে 'হিন্দুমেলার উপহার', ৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর নাম রবীন্দ্রকান্ত ছাপা হয়েছে; এই জাতীয় মুদ্রণপ্রমাদের জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে আগে থেকেই প্রশ্রয় কামনা করি।

বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা ১-৬

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্ মানসী পর্ব ৭-৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসী-সোনারতরী-চিত্রাপর্ব ৫৬-১৭২

তৃতীয় অধ্যায়

গীতাঞ্জলি পর্ব ১৭৩-২১৮

চতুর্থ অধ্যায়

বলাকা পর্ব ২১৯-২৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

পুনশ্চ পর্ব ২৮৯-৩৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ৩৮৪-৪০৮

নির্ঘণ্ট ৪০৯-৪১৭

গল্প পদ্য লিখনু ফেঁদে,

তারাই আমায় আনবে বেঁধে,

অনেক লেখায় অনেক পাতক—

সে মহাপাপ করব মোচন।

আমায় হয়তো করতে হবে

আমার লেখা সমালোচন॥

প্রস্তাবনা

কবিরূপে যিনি বিশ্ববিখ্যাত, সমালোচকরূপেও যাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত সেই কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের কাব্যের ব্যাখ্যাতারূপে দেখা ও সেই সূত্রে স্বকাব্য সমালোচকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের এই কৌতূহল কেন হল সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। উত্তরে বলা চলে যুগপৎ কবি ও সমালোচকরূপে জেনেছি বলেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের এই জিজ্ঞাসা। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীর বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবসাহিত্য, আধুনিক বাংলাসাহিত্য, লোকসাহিত্য ও ইংরেজী কাব্যসাহিত্য বিষয়েও তাঁর উচ্চাঙ্গের নানাবিধ সমালোচনা আমরা পেয়েছি। অপরের সাহিত্য সমালোচকরূপে যাঁর এতখানি দক্ষতা নিজের কাব্যের সমঝ্‌দাররূপে তাঁকে যদি স্বকাব্য-সমালোচনা করতে দেখা যায় তবে সেই আলোচনা তাঁর কাব্যোপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হতে পারে, এই বিবেচনায় স্বীয় কাব্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ আবিষ্কারে আমাদের উৎসাহ হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়ের মূল্যবান তথ্যপঞ্জী আমাদের পথ দেখিয়েছে। "রবীন্দ্রনাথ বহু পত্রে প্রবন্ধে ও ভাষণে স্বীয় রচনার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার মর্মগ্রহণের পক্ষে সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়।"[১] এই অনুমানে গ্রন্থ সংকলয়িতারা পাঠকের সহায়তার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বসাহিত্য সমালোচনার কিছু কিছু অংশ গ্রন্থ-পরিচয়ে মুদ্রিত করেছেন, কিন্তু সমস্ত তথ্য আনুপূর্বিক আজ পর্যন্ত একত্রে সংগৃহীত হয়ে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমরা কার্যত: রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে সেই অসম্পূর্ণ তথ্যপঞ্জী সংকলনের কাজই আমাদের সাধ্যমতো সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বক্তব্য একত্র সংগ্রহ করে সেই তথ্যাবলীর আলোকে রবীন্দ্র-কাব্যোপলব্ধির বিষয়ে আমাদের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

এইখানে কবিকে তাঁর নিজের কাব্যের সমালোচকরূপে দেখার ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

বড়ো কবি শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতে পারেন কিনা এই তর্ক সব দেশে সব কালেই উঠেছে, আবার সৃষ্টিশক্তি ও সমালোচনী প্রতিভা যে যুগপৎ একই

ব্যক্তিতে অবিরোধে অবস্থান করতে পারে তারও প্রমাণ আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ইতিহাসে কালে কালেই পাওয়া গেছে। দান্তে, গ্যেটে, পোপ, ড্রাইডেন, বেন জনসন, ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরীজ, ম্যাথু আর্নল্ড, টি. এস. এলিয়ট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবি-সমালোচকদের নাম যেমন এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসবে তেমনি 'কাব্য-মীমাংসা'র রাজশেখর, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রভৃতি কবি-সমালোচকদের কথাও দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের মনে পড়বে। সমালোচকমাত্রেই যে ব্যর্থ কবি নন কিংবা বড়ো কবি হলেই যে তাঁকে কাঁচা ক্রিটিক হতে হবে এমন কথা গ্রহণীয় নয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে। বরং আমাদের ধারণা বিচারবুদ্ধি না থাকলে কোনও রকম শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব নয়, কাব্যের প্রধান অঙ্গ গীতিময়তা নয় বুদ্ধিমত্তা ; সমালোচনা কাজটি তাই সৃষ্টিকর্মের বিরোধী নয় আনুষঙ্গিক বলেই আমরা মনে করি। সুতরাং যিনি স্রষ্টা তিনিও এক অর্থে সমালোচক। এই সমালোচকের কাজ নিজের কাব্যের বিচার বিশ্লেষণ তত নয়, যতটা তার সংস্কারসাধন। কাব্যসৃষ্টিকালে কবির অন্তরে একজন ক্রিটিক বিরাজ করেন, তাঁরই নির্দেশে কবি নিজের লেখা নিজে কাটাকুটি, সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্জন, পরিবর্তন করেন। কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট এই কারণেই সৃষ্টিকর্মের বেশীর ভাগ শ্রমকেই সমালোচনামূলক শ্রম বলেছেন।[২] বস্তুতঃ অতি প্রখর অনুভূতির সঙ্গে নিরন্তর মানসক্রিয়ার সহযোগিতাই কবির কাব্যকে সার্থক করে তোলে—সমালোচনা বৃত্তি যে সৃষ্টিকর্মের অত্যাবশ্যক একটি অঙ্গ তাতে সন্দেহ নেই।

যিনি বড়ো কবি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা লেখা তাঁর পক্ষে যদি অসম্ভব না-ও হয়, কিংবা যিনি সমালোচক তাঁর পক্ষে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সম্ভব হয়ও তবু কোন কবি-সমালোচকের পক্ষে নিজের কাব্যের সম্যক্ আলোচনা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। সংশয়ের প্রথম কারণ সমালোচনা কথাটি যে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে তাতে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, পরিচয় প্রদান ছাড়াও মূল্যায়নের প্রশ্নটি জড়িত—নিজের কাব্যের সেই রকম বিচার বিশ্লেষণ করা কবির নিজের পক্ষে সম্ভব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ এইরূপ বিচার বিশ্লেষণের বিশেষ করে ঐ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নিজ কাব্য সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী—সমালোচনাকালে নিজের কাব্যকেও দেখতে হবে পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে—সচেতন ভোক্তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে। যিনি স্বয়ং স্রষ্টা—বিশেষতঃ মন্ময় (Subjective) সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর পক্ষে নিজের কাব্য সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া

যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে নিজের কাব্যের রসোপভোগ। তাছাড়া আছে ভদ্রতা বা সৌজন্যবোধের প্রশ্ন স্বাধীন মতামত প্রকাশ বা মুক্ত রসবিচারে যা প্রায়ই বাধা সৃষ্টি করে। আবার টি. এস. এলিয়টের অনুসরণে বলা যায়, কাব্যের ব্যাখ্যা সমঝ্‌দার সমালোচককে তার সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, কবি নিজে অনেক সময় যে সীমা লঙ্ঘন করেন না বা সেই সীমার বাইরে গিয়ে তিনি হয়তো স্বস্তি বোধ করেন না। ফলে কবির নিজের কাছে তাঁর কবিতা অনেক সময় একটি বিশেষ অর্থের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে—এটা কবিতার সম্পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে হানিজনক। এ ছাড়া কবি যে দৈব অনুপ্রেরণার বশে কাব্য-সৃষ্টি করেন কাব্যসৃষ্টির পরে সেই দিব্য আবেশ আর থাকে না, তখন সেই কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিজে বাইরের সমালোচক অপেক্ষা অধিক ওয়াকিবহাল না হতে পারেন। বিশেষ করে কাব্যসৃষ্টি ও তার ব্যাখ্যা-কাজের মধ্যে যদি কালগত ব্যবধান যথেষ্ট বেশী হয়, তবে সৃষ্টির পরম মুহূর্তে কাব্যের যে অর্থ তাঁর নিজের কাছে স্পষ্ট ছিল—যদি আদৌ সে রকম কিছু থাকেও—তবে সেই অর্থ পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকালে পরিবর্তিত হতে পারে কিংবা কবি তা বিস্মৃতও হতে পারেন।

নিজের কাব্যের নিজে ব্যাখ্যাতা হওয়ার এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কবিরা যে কখনও কখনও নিজেই নিজের লেখা সমালোচনা করতে নামেন তার কারণ, যোগ্য সমালোচকের যখন অভাব ঘটে, কবিকে তখন নিজের হাতেই তাঁর সৃষ্টি-কর্মের টীকাভাষ্য রচনা করতে হয়। বুঝিয়ে বলতে হয় কোন্‌ ভাবনাকে কী ভাবে কোথায় তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। আর এই ব্যাখ্যার কাজে স্বয়ংস্রষ্টার কতকগুলো সুযোগও আছে। কবির কাছ থেকে কাব্যসৃষ্টির আনুষঙ্গিকতার সাক্ষ্য—কবিতার জন্ম ইতিহাস, রচনার উপাদানগত পরিচয়, ভাবউৎস, প্রেরণা সম্পর্কে যেরকম নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় এমন আর কোনও বাইরের সমালোচকের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব নয়। এইজন্য সীমিত অর্থে হলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য কবিই তাঁর নিজের কাব্যের যোগ্যতর বোদ্ধা—কবিমানসের যথাযথ পরিচয় প্রদানে তিনিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। প্রত্যেক শিল্পকলায় শিল্পকর্মের গোড়াকার অনুবেদন হয় শিল্পীরই মনে। অতএব কবির নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁর নিজের বিচারটাই সবচেয়ে দরকারী, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে মূল্যবান।[৩] সাহিত্যস্রষ্টা যুগপৎ সমালোচক হলে স্বীয় সৃষ্টি সৌন্দর্যের একটা সুষ্ঠু মানসূচী তাঁর অন্তরে বিরাজিত থাকাটা

স্বাভাবিক, সেই মানদণ্ড—ইংরেজিতে যাকে বলে 'নর্ম্'-অনুসারে তাঁর সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ হোক—এ বাসনা তাঁর মনে জাগাটাও অস্বাভাবিক নয়।

এছাড়া আরও কথা আছে। যিনি যথার্থ বড়ো কবি তিনি যদি দীর্ঘজীবন লাভ করেন তবে তাঁর নিজের লেখার ভালো-মন্দ সমালোচনা দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাঁর প্রায়ই হয়। সমসাময়িককালের সমালোচনাকে তিনি যদি তাঁর কাব্য বিচারে পর্যাপ্ত মনে না করেন তাহলে নিজের লেখার নিজেই আলোচনা তাঁকে করতে হয়—রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কাজে সব্যসাচীরূপে অবতীর্ণ হয়ে পাঠক তৈরির কাজেও তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়, পাঠকদের রুচি বদলে দিতে হয়।

কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজে বিচারক হওয়া বেদস্তুর বিবেচনা করতেন তবু দায়ে পড়ে স্বরচিত কবিতার সপক্ষে তাঁকে বারবারই ওকালতি করতে হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্য তার আপন স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একসময় পাঠক সাধারণের মনে প্রতিবাদ জাগিয়েছিল। রবীন্দ্র-কবিতা বোঝা যায় না, তা অস্পষ্ট, অবাস্তব এই ধরনের নানা অভিযোগ কবি-জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে শুনতে হয়েছিল, সেই বদনাম রবীন্দ্রকাব্য বোঝবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য বোঝাবার কাজেও কবিকে হাত দিতে হয়েছে। অবশ্য শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরেই নয়, ভক্ত অনুরাগী শ্রোতা বা পাঠকের অনুরোধেও সমঝ্‌দার হিসাবে নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। এছাড়া গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর কাব্য অধ্যাপনাকালে স্বেচ্ছায় নিজের লেখার আলোচনা করেছেন দেখা যায়।

এইভাবে ভেতরের ও বাইরের তাগিদে নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের আলোচনায় প্রথম ও বৃহৎ উদ্দেশ্য কবির সেই সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ আকারে সংগ্রহ করা এবং তাদের যথাযথ বিন্যস্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সেই সব বক্তব্যের জাতি-চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে স্বকাব্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ নির্ণয়।

রবীন্দ্র-কবিজীবন সুদীর্ঘকাল ব্যাপ্ত—তা যেমন নানা পর্বে বিভক্ত, রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রবক্তব্যও আমরা তেমনি বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করেছি। বলাবাহুল্য আমাদের পর্ববিভাজন কিছুটা স্থূল এবং পাঠক ও সমালোচক মহলে তা মোটামুটি স্থিরীকৃত। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য যেহেতু একটু ভিন্ন

তাই কাজ-চলা-গোছের পাঁচটি পর্ব বিভাগ আমরা মেনে নিয়েছি। অবশ্য এ ব্যাপারেও যথাসম্ভব কবির কাছ থেকেই আমরা ইঙ্গিতলাভের চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর কাব্যের সূচনা থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কাব্যধারাকে একটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমরা কবিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ পর্বের আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। রবীন্দ্র-কাব্যের পরিণতির ঐশ্বর্যময় প্রথম পর্বটির আলোচনা 'মানসী' থেকে শুরু করে 'ক্ষণিকা'য় শেষ করা হয়েছে। 'ক্ষণিকা'র "যৌবন বিদায়" কবিতায় কবি তাঁর যৌবনের সোনার তরীটিতে কাব্যের স্বর্ণ ফসল বোঝাই করে চল্লিশের ঘাটের থেকে বিদায় দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় বিন্যাসে সহায়তা করেছেন। এরপর ১৯০১ থেকে 'নৈবেদ্য' কাব্য নিয়ে কবি বিশ্বদেবতার পূজামন্দিরে প্রবেশ করে যে গান ধরেছেন সে এক নতুন পর্বের গান। 'গীতালি'তে এই গানের পরিসমাপ্তি ধরে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে কবির অধ্যাত্মসাধনামূলক রচনার আলোচনা বিন্যস্ত করতে চেয়েছি। অবশ্য এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কাব্যের আলোচনাও আমাদের সশ্রদ্ধ লক্ষ্যের বিষয় হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি পূজার ঘর থেকে বৃহত্তর, মহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে কবি সমস্যাসঙ্কুল বাস্তব-জীবনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছেন যুদ্ধের ভাবনা মাথায় নিয়ে—'বলাকা' কাব্যখানি তাই এই পর্বের সূচনায় রয়েছে, পর্বের সমাপ্তি হয়েছে কবিরই সূক্ষ্ম নির্দেশ অনুসারে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে এসে। অতিদীর্ঘ পঞ্চম অধ্যায় 'পুনশ্চ' দিয়ে শুরু হয়ে সু-সমাপ্তির সংগীত রচনা করেছে 'শেষলেখা'র শেষ কবিতায়।

রবীন্দ্রকাব্য উপভোগের জন্য অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে কবির কাছে আমরা এসেছি তাঁর কাব্যাস্বাদনের সহায়তা তাঁর নিজের লেখাতেই পাওয়া যায় কিনা সেই অনুসন্ধানে। রবীন্দ্রকাব্য আলোচনামূলক এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা করা কিংবা সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক স্বরূপ নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নিজকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্র-বক্তব্য সংগ্রহ ও রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় তাদের গুরুত্ব বিচার আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। উপসংহারে আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সবিস্তারেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের আত্মকাব্য আলোচনায় কোন্ জাতীয় রচনার আধিক্য, কোন্ শ্রেণীর লেখায় সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ অধিক তা দেখাবার যেমন চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি স্বকাব্য আলোচনায় কবি-সমালোচক কতদূর উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পেরেছেন তার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করা হয়েছে। অপরের কাব্যের উৎকৃষ্ট

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যালোচনায় যদি অনুরূপ উৎকর্ষ দেখাতে না পারেন তবে তার হেতু কি, কবির নিজের পক্ষে নিজকাব্য আলোচনায় সীমাবদ্ধতা কোথায় তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মোট কথা, রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-বক্তব্য সংগ্রহ মাত্র নয় সেই বক্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রকাব্য বুঝবার চেষ্টাও করা হয়েছে—আমাদের সে প্রচেষ্টা গ্রন্থমধ্যে কতদূর সার্থক হয়েছে তার ওপরেই নির্ভর করছে গ্রন্থের 'রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ' এই নামকরণের সার্থকতা।

রবীন্দ্রকথায় রবীন্দ্রকাব্য আলোচনাটি আদ্যন্ত তথ্যভিত্তিক তাই আমাদের বক্তব্য সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রউক্তি যথেচ্ছ উদ্ধৃত করতে হয়েছে। রবীন্দ্রবক্তব্যই আমাদের আলোচনায় প্রামাণ্য তাই অসংখ্য উদ্ধৃতি কখনও সমগ্রতঃ কখনও স্থান সংক্ষেপের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হয়েছে, কখনও উক্তির উৎস নির্দেশ করেই আমরা ক্ষান্ত হয়েছি। বলা বাহুল্য বিনা বিচারে গুরুবাক্য শিরোধার্য করাকেই আমরা গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা মনে করি নি—রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ বক্তব্য তাঁর কাব্যোপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক তা যেমন দেখাতে চেষ্টা করেছি, তেমনি তাঁর কোন বক্তব্য যৌক্তিক মনে না করলে তার কারণ নির্দেশ করে আমাদের বক্তব্য রাখবার চেষ্টাও করেছি। তথ্য সংগ্রহের মূল উৎস নির্দেশের জন্য অধ্যায় শেষে উল্লেখপঞ্জী ও গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট সংযুক্ত হয়েছে।

---

১. গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী—(বিশ্বভারতী সং) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৫

২. "The function of criticism"—Selected Essays, (১৯৫১) টি. এস. এলিয়ট, পৃ. ২৯-৩০

৩. তদেব, পৃ. ৩০

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্‌-মানসী পর্ব

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৭-৮ বৎসর তখন থেকেই শুরু তাঁর 'ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা উল্কাবৃষ্টির মত'। কবির বয়স যখন পনেরো বছর পাঁচ মাস, সমালোচক হিসেবে তখন থেকেই তাঁর আত্মপ্রকাশ সাময়িক পত্রের পাতায়। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী' এই তিনটি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা রবীন্দ্ররচিত সমালোচনা-সাহিত্যের অগ্রদূত[১] প্রবন্ধটিতে পরোক্ষভাবে কবির নিজের সাহিত্যিকপ্রবণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য বিষয়ে অপূর্ব বিচক্ষণতার সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন সে সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি যতই লঘু মন্তব্য করুন না কেন, স্বীকার করতেই হবে পনেরো বছরের বালকের পক্ষে ঐ রচনা প্রশংসার যোগ্য। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লেখক এই প্রবন্ধে যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন তাতে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রবক্তব্য নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়। মহাকাব্য রচনার যুগ যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তা কবি কিশোর বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং অতীত যুগের সাহিত্য রচনার পথ পরিহার করে যুগোপযোগী গীতিকবিতার পথটিকেই কিশোর কবি বরণ করে নিয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের যথাযথ পথটি কবিকে সন্ধান করে বের করতে হয়েছে। কবির বাল্যকালে কাব্য রচনার যে দুটি পথ বাঙালী কবিদের সম্মুখে খোলা ছিল—মহাকবি মধুসূদন প্রবর্তিত হেম-নবীন অনুসৃত মহাকাব্যের রাজপথ রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই পরিত্যাগ করলেও দ্বিতীয় পথ অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের বাঁধাপথে প্রথম প্রথম তাঁকে অল্পস্বল্প বিচরণ করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে কবির নিজের উক্তি :—

"তখন (বাল্যকৈশোর পর্বে) আমার কাব্য লেখার আর একটি আদর্শ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ··ইহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"

বাল্যকালে প্রিয় কবির অনুকরণের মধ্য দিয়ে কাব্য রচনা শুরু করলেও ভিতরে ভিতরে কবির নিজের মধ্যে যে একটা অতৃপ্তি ছিল—সাহিত্যের যে

রূপটা অন্যের সেই রূপের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যথার্থ আনন্দ তিনি পান নি। তাই প্রথম জীবনে 'বনফুল' 'কবিকাহিনী,' 'ভগ্নহৃদয়' 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি কাহিনী কাব্য রচনা করে কবির মনে অহঙ্কার হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি যে ভিন্ন পথেরও সন্ধান করছিলেন তার পরিচয় পাই এই সব কাহিনীকাব্য-রচনার পাশাপাশি 'শৈশব সংগীতে'র গীতিকবিতাগুলি লেখার চেষ্টার মধ্যে; বাল্যকালে আর একজন কবিকে তিনি আদর্শ করেছিলেন, সে কথাও কবি স্বীকার করেছেন। ইনি আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তী। 'বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখব, তাঁর মতোই কাব্য লিখছি' এই কথা মনে করে বাল্যলীলায় সুখ পেলেও মনে মনে অশান্তিও কম ছিল না। তাই—

"এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা স্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জ্বলে উঠল। যে লেখাটা হল সেটার মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রধান সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেন না আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজের মধ্যে, বাইরের মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না।"[২]

নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভ সংকেত দিতে গিয়ে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ (কবির বয়স তখন ৭৩ বছর) যে মন্তব্য করেছেন তা ঐ কাব্যরচনার সমকালে তাঁর মনে না থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাব্যের সমঝ্‌দার যে তিনি নিজে অথবা তাঁরই আত্মীয়বন্ধুজন এই রকমের একটা আত্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। এই ধরনের আত্মসচেতনতা প্রায় সব কবিরই থাকে তবে যদি কবি সত্যিকারের প্রতিভাবান হন আর তাঁর পরিবারের আর পাঁচজনের কাছে তাঁর প্রতিভাসচেতনতার কিছু পরিচয় পান, তাহলে এই আত্মবিশ্বাসের শক্তি আরও বাড়ে। রবীন্দ্রনাথ কতবড়ো প্রতিভাবান তার পরিচয় আমরা পরবর্তী কালে যথেষ্ট পেয়েছি কিন্তু 'শৈশবসংগীত' রচনার সময়েই তিনি যে কতদূর প্রতিভাসচেতন ছিলেন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই ১৮৭৮ সালে ৬ই জুলাই, (কবির বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর) তাঁর লেখা 'অবসাদ' নামক কবিতাটিতে

এবং পরোক্ষ পরিচয় আছে সমকালীন কিছু কিছু গদ্য রচনায়। 'অবসাদ' কবিতার রচনা পটভূমিকারূপে 'জীবনস্মৃতি' থেকে কবির একটি মন্তব্য উদ্ধার করা চলে—

"কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।"

'অবসাদ' কবিতাটির মধ্যে কবির অবসন্ন বিষাদগ্রস্ত চিত্তের আক্ষেপ যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি কবির প্রতিভাসচেতনতা ও ভবিষ্যৎ সংকল্পের কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়ে গেছে—

'সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন দুর্বল পথিক' সংকল্প করেছেন—

"কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।"

এই প্রতিজ্ঞা যে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তা আমরা জানি, কিন্তু যে কথা আমাদের জানা নেই তা হল এই—ঐ অতটুকু বয়স থেকেই নিজের প্রতিভা সম্পর্কে কবি এতদূর সচেতন ছিলেন যে বাল্য রচনার খাতাগুলি 'মালতীপুথি', 'Lett's Diary' পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করেছেন—পরবর্তীকালে এই অক্ষম রচনাগুলিও যে সমাদৃত হবে এমন একটা আত্মপ্রত্যয় নিশ্চয়ই সেই সময় তাঁর মনে ছিল। আর এই আত্মবিশ্বাসেই কবিকে বাইরের মাপকাঠির সাক্ষ্যকে অস্বীকার করতে সাহস দিয়েছে এবং ভিতরকার ক্রমে ক্রমে গড়ে-ওঠা এক মানদণ্ডের উপরেই নির্ভরতা এনে দিয়েছে। অবশ্য ছেলেবেলায় কবির নিজের ভিতরকার সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ ঠিক কি ছিল সে কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে কিছু প্রত্যক্ষ ও কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য নিয়ে কবির স্বসাহিত্য সমালোচনার আদর্শ বিষয়ে একটা অনুমান করা চলে। পরোক্ষ সাক্ষ্য হিসাবে সমকালীন সাহিত্যসমালোচনার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অপরের কাব্যবিচারে ঐ অল্প বয়সেই যিনি ঐরূপ মননশক্তির পরিচয় দিয়েছেন নিজের কাব্য প্রকাশকালে তাঁর সেই সমালোচক মন একেবারে সুপ্ত ছিল একথা কোনও ক্রমেই বোধ হয় না। ঠাকুরবাড়ির আর পাঁচটি প্রতিভাবান ছেলের মতোই রবীন্দ্রনাথও বাল্যকাল থেকেই অতিশয় আত্মসচেতন ছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। পরবর্তীকালে নিজের কাব্যবিচারে তাই তাঁকে অতিরিক্ত কঠোর হতে দেখা যায়। অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত 'শৈশব সংগীতে'র সন-তারিখবর্জিত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষত বাল্যকালের লেখার উপর কেমন একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।"

লেখাগুলোর প্রতি যতই মায়া থাক তা যে লেখককে অন্ধ করে রাখে নি তার প্রমাণ তেরো থেকে আঠারো বছরের সব রচনাই 'শৈশব সংগীত' কাব্যগ্রন্থে নির্বিচারে গৃহীত হয় নি। কিছু রচনা সম্পূর্ণ, কিছু আংশিক বর্জিত হয়েছে। কোন রচনাকে বিস্মৃতি বা অস্বীকৃতির চরমদণ্ড দান করেছেন কবি আর এইভাবেই শুরু হয়েছে নিজের রচনার সমালোচনা।

কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ', দ্বিতীয় 'হোক্ ভারতের জয়',[৩] তৃতীয়, 'হিন্দুমেলার উপহার' চতুর্থ 'প্রকৃতির খেদ' 'শৈশব সংগীত' থেকে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বাল্যকালের অনেক রচনার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু প্রথম মুদ্রিত রচনা হিসাবে 'অভিলাষ' অতখানি অনাদরের যোগ্য কিনা তা বিচার্য। রবীন্দ্র-কাব্যগগনের 'ভোরের পাখি'র গান যে কবিতার কণ্ঠে শোনা গেছে, যে কবিতার 'ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অনাগত বৃহৎ জীবন প্রতিবিম্বিত' হতে দেখেছেন রবীন্দ্রকাব্য সমালোচক সেই কবিতা রবীন্দ্রস্মৃতিতে একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল একথা আমাদের মনে হয় না। আমরা জানি পরবর্তীকালে সেই সব বাল্য রচনার কথা কবি সহজে মনে করতে পেরেছেন যারা কোন না কোন স্মৃতি বিজড়িত—হয় কোন ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার সঙ্গে জড়িত, না হয় কোন ঐতিহাসিক ঘটনার অথবা স্বদেশপ্রীতির কোনও উত্তেজনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'অভিলাষ' কবিতাটি আদৌ কোনও লেখকের নাম যুক্ত ছিল না কিন্তু "রবীন্দ্র-নাথের নিকট উপস্থাপিত করলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।"[৪] সুতরাং অনুমান করা অযৌক্তিক নয় ব্যক্তিগত স্মৃতির সূত্রেই কবির মনে এই কবিতার কথাটি জাগ্রত হয়েছে। কবির স্বনামে মুদ্রিত প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন, কিন্তু এই কবিতাটি ১১ই ফেব্রুআরি ১৮৭৫ হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালক কবি

স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন। হিন্দুমেলায় পঠিত দিল্লির দরবার সম্পর্কে রচিত কবিতাটির কথা কবি 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। তিনি লিখেছেন,

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ ('অত্যুক্তি') লিখিয়াছি। লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখন প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।··· শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।"[৫]

এই কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও এক সময় কথাপ্রসঙ্গে কবি করেছিলেন। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি বলেছিলেন "সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনও ছাপা হয় নাই।"[৬]

কবির এই অনুমান যে সত্য নয় সে তথ্য শ্রীযতিনাথ ঘোষ আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে (১৮৮২) চতুর্থ অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগতোক্তিরূপে এই কবিতাটি মুদ্রিত হয়, কেবল কবিতাটিকে নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'ব্রিটিশ' কথার বদলে 'মোগল' শব্দটি বসানো হয়েছে।[৭]

কবির চতুর্থ মুদ্রিত কবিতা 'প্রকৃতির খেদ' অনামে প্রথমে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল-মে ১৮৭৫) সালে প্রকাশিত হয়, পুনরায় 'পরিমার্জিতরূপে' ১৮৭৫ জুন-জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৭৯৭ শক) তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মাত্র একমাস বা তার কিছু বেশী সময় পরে কবিতাটি যখন পুনর্মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করে তখনই কিশোর কবি তার পরিমার্জনের কথা চিন্তা করেন। এই পরিমার্জনাও যে একরকম আত্মকাব্য সমালোচনা তাতে সন্দেহ কি? কবির বহু কবিতাই পাঠান্তরের মধ্য দিয়ে এইভাবে সমালোচিত হয়েছে। কবির স্বকাব্য সমালোচনার শ্রেষ্ঠ নমুনা পাওয়া যায় কবিতার পাঠান্তর আলোচনায়।

'প্রকৃতির খেদ' সম্পর্কে কবি সরাসরি কোনও মন্তব্য করেন নি বটে কিন্তু সমকালীন রচনা সম্পর্কে পরিহাসমিশ্রিত সুরে 'জীবনস্মৃতি'তে একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"এমন সময় (অর্থাৎ ১৮৭৫ সালে) জ্ঞানাঙ্কুর (আসলে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব) নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা (প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিবিম্ব সম্পাদক কবির গৃহশিক্ষক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ) সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ ('প্রলাপ' নামক কবিতার তিন পর্যায় ও 'বনফুলে'র আট সর্গ) নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অঙ্কুরোদ্গত কবি বলেছেন—কথাটি যথার্থ হয়েছে, তবে মনে রাখতে হবে ঐ অঙ্কুর ভাবী কবি-মহীরুহের তাই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র কর্তৃপক্ষ বালক কবিকে উক্ত পত্রিকার একজন সম্ভ্রান্ত লেখকরূপেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে কবির স্নেহমধুর সম্পর্ক থাকলেও কর্তৃপক্ষ একেবারে স্নেহান্ধভাবে নির্বিচারে তাঁর গদ্যপদ্যপ্রলাপ ছাপাতেন একথা বললে কি রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা, কি উক্ত পত্রিকার সাহিত্যিক আদর্শ কোনওটির প্রতিই সুবিচার করা হয় না। সমকালীন পত্রিকার মধ্যে ঐ পত্রিকাটি সাহিত্যিক বিচারের দিক থেকে উৎকৃষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নেই, এবং রবীন্দ্রনাথের সব রচনাই যে 'অমৃতং বাল ভাষিতং' বলে তাঁরা গ্রহণ করতেন একথাও সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ জ্ঞানাঙ্কুরে মুদ্রিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি, পদ্যপ্রলাপগুলি যথেষ্ট কাঁচা হাতের লেখা হলেও সবগুলিই প্রলাপোক্তি নয়। কবির এই বাল্য রচনাগুলির মধ্যে যথেষ্ট অপরিণতির পরিচয় আছে কিন্তু এইগুলির মধ্যেই 'একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস' আছে। কাব্য হিসাবে এগুলি সমাদরের যোগ্য না হতে পারে কিন্তু ক্রমোন্মেষমান এক আশ্চর্য কবি মনের ইতিহাস হিসাবে এই বাল্যরচনার গুরুত্ব রয়েছে। বালকের রচনা হিসাবে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' সম্পাদক যদি এগুলির প্রতি সস্নেহ প্রশ্রয়ের মনোভাব প্রকাশ করেও থাকেন তবে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলা চলে। প্রত্যেক কবি বা সাহিত্যিকেরই বাল্যরচনাবলরী বিচারকালে তাঁর বয়সের কথা মনে রাখা দরকার, যদি অবশ্য কবি-জীবনীর সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে বিচার করার সুযোগ থাকে; রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের সেই সুযোগ ছিল বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের কথা মনে রেখে তাঁর কাব্য প্রকাশের দ্বারা তাঁকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, রামসর্বস্ব সুবিচারক ছিলেন তাই চৌদ্দ বছরের কিশোর কবির কৈশোর রচনাকে সম্মান দিয়ে তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন।

বনফুল [কাব্যরচনা ১৮৭৫, গ্রন্থপ্রকাশ ১৮৮০]

'বনফুল' কাব্যখানিও রবীন্দ্রনাথের এই অপরিণত বয়সের রচনা, কবির বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর। সুতরাং চৌদ্দ বছরের কিশোর কবির রচনা হিসাবেই তার সার্থকতা বিচার করতে হবে। কবি নিজেও পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিতেই বিচার করে 'বনফুল' কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"বনফুল বইখানার জন্য ততটা ক্ষোভ নেই, কেন না সেটা সত্যই কাঁচা।" কাঁচা বয়সের রচনা কাঁচা হবে এইটাই তো প্রত্যাশা করা উচিত।

নিজের বাল্যরচনার বিচারে পরিণত বুদ্ধি কবি-সমালোচককে প্রায়শঃই কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিতে দেখা যায়, কিন্তু সময় সময় বাল্যের রচনা সম্পর্কে কবির মায়ার ভাবটিও লক্ষ্য করা চলে। কঠোর মতামতের পরিচয় পাই 'শৈশব সংগীতে'র লেখাগুলি ছাপাতে না চাওয়ার মধ্যে। কিন্তু এই কবিতাগুলি যাঁর কাছে বসে লেখা, যাঁর স্নেহের স্মৃতি এই লেখাগুলির সঙ্গে জড়িত সেই রবীন্দ্র কবিজীবনের সাক্ষাৎ প্রেরণারূপিণীশক্তি কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর অভিঘাতেই এরা মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করেছিল। গ্রন্থের উপহারে মুদ্রিত কয়েকটি কথাই তার প্রমাণ—

'এ কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম। বহুকাল হল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।"

সমকালীন গদ্য নিবন্ধ সম্বন্ধেও লেখকের কৈফিয়ৎ অনুরূপ—

"আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি (গদ্য পদ্য উভয়বিধ) উৎসর্গ করিতেছি।⋯ এই লেখাগুলির মধ্যে কিছুদিনের গোটা কতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও।"

কবি নিজেই নিজের লেখাগুলিকে স্নেহের চোখে দেখছেন—এবং এগুলিতে তার মনের ভাব—গোটা কতক সুখদুঃখের কথা বলতেই তাঁর আগ্রহ—লেখাগুলি প্রবন্ধ হয়েছে কিনা তা তাঁর বিচার্য ছিল না। হয়তো এই কারণেই এগুলি প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠা ছিল। শোকের আঘাতে বিগতকুণ্ঠ হয়ে এদের প্রকাশ করলেও কবি যে সমালোচনা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন নি তার প্রমাণ 'শৈশব সংগীত' নামক কবিতাটির আলোচনাতেই স্পষ্ট হবে। এই কবিতার শেষাংশে

কবির ব্যক্তিগত বেদনার প্রসঙ্গ অতি প্রত্যক্ষ ছিল, তাই সেই অংশ বাদ দিয়ে এর প্রথমাংশ 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে মুদ্রিত হয়েছিল, কারণ প্রথমাংশে সে বেদনা বহুল পরিমাণে কাব্যিক ও আলঙ্কারিক আবরণে প্রচ্ছন্ন, ফলে সে অংশটুকু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুপভোগ্য না হতেও পারে।'[৯] 'কবিকাহিনী'তেও এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আছে, তবে আখ্যায়িকার অন্তরালে সেখানে আত্মগোপনের সুবিধা থাকায় 'কবিকাহিনী' প্রকাশে প্রথমে তিনি বাধা দেন নি পরে অবশ্য তাও পুনর্মুদ্রিত করেন নি।

কবিকাহিনী [রচনা ১৮৭৭ অক্টোবর, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮]

ষোলো বছর বয়সে লেখা 'কবিকাহিনী' কাব্যই রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে বের হয় ৫ই নভেম্বর ১৮৭৮ সনে। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনার উদ্দেশ্যে কিছুকাল আমেদাবাদে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এবং আরও কিছুদিন সত্যেন্দ্রনাথের এক মারাঠী বন্ধুর কাছে রেখে ইংরাজী ভাষা ও আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। কবির কলম থেকে ইংরাজী সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা এই সময়ই পেয়েছি। কাব্যচর্চা গান রচনারও তখন বিরাম নেই। 'কবিকাহিনী' কাব্য ইতিপূর্বেই ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে (পৌষ-চৈত্র ১২৮৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যখানি সেই সময় কবির কত প্রিয় ছিল তার প্রমাণ যৌবনকালের সাথী যাঁকে কবি 'আপন-মানুষের-দূতী' বলেছেন সেই আন্না তরখড়কে সাগ্রহে তর্জমা করে এই কাব্যটি শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁকে মুখস্থ করিয়ে দেন। তাঁর কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপিয়ে প্রকাশ করলে কবির মনে 'যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না।' 'জীবনস্মৃতি'তে এই কাব্য সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থরচনার প্রায় চৌত্রিশ বৎসর পরে লেখা এই সমালোচনায় এর দোষত্রুটির কথাই বিশেষ করে আলোচিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা

উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশ জনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি।”

কবির এই ‘অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তি’ এবং কাব্যে কবির নায়কত্ব সম্বন্ধে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এখানে যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য বলে মানা যায় না। স্বভাবতঃ যিনি গীতিকবি জগতের আর সমস্তের চেয়ে আপনার কবি-ব্যক্তিত্বকেই তিনি বড়ো করে দেখেন কিংবা এমনও বলা যায়, সমস্ত জগৎটাকেই তিনি নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে কবিকাহিনী’তেই, তবে অপরিণতির জন্য সেই কবিব্যক্তিত্ব ‘অপরিস্ফুট ছায়ামূর্তিতে’ বিরাজ করছে। কবি নিজেকেই নিজের কাব্যের নায়ক করেছিলেন, এই কবি-নায়ক যে লেখকের নিজেরই সত্তা তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী বিলুপ্ত রচনা ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’ প্রসঙ্গে একটি পত্রে কবি লিখেছিলেন—‘নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি বলে আর অনুভব করিনে’ কিন্তু এক সময়ে যে ‘আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত’ তাও তিনি স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রকাব্যে বারবার এই কবিই নায়ক হয়ে তার সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ‘পুরস্কার’ (‘সোনার তরী’) কবিতার কবির কথা এই প্রসঙ্গে মনে হবে। ‘কবিকাহিনী’ রচনাকালে ব্যক্তিজীবনেও নিজেকে কবিরূপে জানান দেওয়ার ইচ্ছাটা যে তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল এরূপ অনুমানেরও কারণ আছে। ‘ইহার নায়ক যে লেখকের সত্তা নহে’ এই সামান্য কথাটা বুঝাতে গিয়ে কবি যে পল্লবিত ভাষণের সাহায্য নিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয় একটা সঠিক কথা না বলতে কবি কি পরিমাণে ইতস্ততঃ করেছেন। কবি জীবনীর সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেই আমরা জানতে পারি এই সময় শুধু বান্ধবীর কাছেই নয় বাড়ির অভিভাবকদের কাছেও কবি আপন কবি-পরিচয়টি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। বিদেশিনী আন্না যত সহজে কবির কবিয়ানা মেনে নিয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা রবির কবিতা পছন্দ করলেও তাঁর ভবিষ্যৎ কবি-জীবনের সুনিশ্চিত পরিচয় তখনও পান নি সেই কারণেই রবিকে মানুষ গড়তে বিলাত পাঠাবার ষড়যন্ত্র করেছেন। কিন্তু ‘কবিকাহিনী’ রচনার সময়েই বালক রবীন্দ্রনাথ হয়তো অবচেতনভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। অভিভাবকদের পরিকল্পনা তাঁর এই স্বাধীন কবিজীবনের অবসান ঘটাতে উদ্যত হয়েছে ‘কবিকাহিনী’তে কবির সেই মনোবেদনারই

প্রকাশ। এই বেদনার কথা সমসাময়িক অন্য রচনাতেও আছে।[১০] 'কবি-কাহিনী' কাব্যখানিকে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তা কি কেবল গ্রন্থটি তাঁর মুদ্রিত প্রথম কাব্য বলেই ? সমালোচকদের অনুমান ভিন্ন রকম।[১১] আমাদেরও মনে হয় 'কবিকাহিনীর' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের কাহিনীই তাঁর অজ্ঞাতসারে লিখিত হয়ে গেছে। 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে কবি স্বয়ং এ সত্য হয়তো বুঝেছিলেন। কিন্তু কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের তথা কবির জীবনের সঙ্গে এর যোগের কথাকে বড়ো করে না দেখে সমালোচকগণ সাহিত্যবিচারের আদর্শে যদি এই কাব্যকে 'মেপে জুখে' দেখেন তবে এর মধ্যে যে সব দোষত্রুটি তাঁদের নজরে পড়বে তা কবি নিজেই আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং কঠোরভাবে নিজের অপরিণত বয়সের এই কাব্যখানির সমালোচনা করেছেন। এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত বিশ্বপ্রেমের ঘটা সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

"ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতঃই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"

'কবিকাহিনী'র চতুর্থ সর্গ সম্পর্কে কবির এই মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করেও বলা চলে রবীন্দ্রনাথের এই আত্মসমালোচনা অনাবশ্যক ব্যঙ্গমিশ্রিত। সত্য বটে 'কবিকাহিনী'তে বর্ণিত বিশ্বপ্রেমের আদর্শ পরের মুখের কথাকেই মূলধন করে রচিত হয়েছে. কিন্তু তাতে দোষের কিছু নেই, 'কবির চিত্ত ফুলবনমধু' আহরণ করে 'কাব্যমধুচক্র' নির্মাণের অধিকার কবিদের সাধারণ একটি অধিকার বলেই স্বীকৃত। স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা পরের অনুসরণের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কিন্তু পরের সম্পদ আত্মসাৎ করে যখন সে আপন কল্পনাশক্তির বলে কবিত্বের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে তখন আর ঐ ঋণ গ্রহণে লজ্জার কিছুই নেই। এটাই নিয়ম বলে স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্রকবি-মানসে বিশ্বপ্রেমের জাগরণ হয়তো আপনা থেকেই হত, শেলী, কীটস প্রমুখ ইংরেজ কবিদের প্রভাবে তার সূচনা হয়েছে 'কবিকাহিনী'তেই। পরের মুখের কথা বলে বিশ্বপ্রেমের কথা একটু ঘটা করেই হয়তো তিনি বর্ণনা

করেছেন, তা হলেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করতেই হয় যে, ঐ বিশ্ব-প্রেম একালের বাঁধাবুলির মত শুধু কথার কথা নয়। 'কবিকাহিনী'র পূর্ববর্তী 'অভিলাষ' হ'তে 'প্রকৃতির খেদ' পর্যন্ত কবিতায় যে একটি স্বদেশ প্রেমের সুর শুনতে পাওয়া যায় 'কবিকাহিনী'র বিশ্বপ্রেম তার অপেক্ষাকৃত পরিণত রূপ। পরবর্তী জীবনে যে কবি বিশ্বপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন 'কবিকাহিনী'তে সমগ্র মানবসমাজের জন্য আর্তক্রন্দনে তারই পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। শুধু বিশ্বপ্রেমের আদর্শই নয়, প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রীতি, ভগবদ্‌প্রেম ও রোমান্টিক অতৃপ্তি—এক কথায় পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যের সব কটি মূল সুরই যেন সূত্রাকারে এই কাব্যে বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবন যে কয়েকটি প্রধান সূত্রের আশ্চর্য ভাষ্য রচনা করেছে বাল্যকালের এই ক্ষুদ্র কাব্যেই সমালোচকগণ তার আভাস লক্ষ্য করেছেন।[১২]

তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এক পত্রে এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'কবি-কাহিনী'তে "ভগ্নহৃদয়ে" অল্পস্বল্প পাক ধরেছে। এইজন্যই ওদের কৃত্রিম প্রগল্‌ভতাকেই বলা যায় জ্যাঠামি।'

তখন কবির সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। 'বনফুলে'র মাত্র দু বছর পরে 'কবিকাহিনী' রচিত। 'বনফুল'কে কাঁচা বলে কবি-সমালোচক অব্যাহতি দিয়েছেন, কিন্তু 'কাঁচা-পাকা' কাব্য 'কবিকাহিনী'কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন নি। চৌদ্দ বৎসরের তুলনায় ষোল বছরে কবির মনের ও কাব্যের যে পরিণতি হয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য। 'কবিকাহিনী'তে কোনও কোনও স্থলে প্রগল্‌ভতা থাকলেও কৃত্রিমতা নেই। অবশ্য জ্যাঠামি কিছু এতে থাকলেও থাকতে পারে, তবে সে জ্যাঠামি কদর্থে নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র তার যে অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন সেই অর্থে। বাল্যকালে ইচ্ছামত অজস্র পাঠ্য অপাঠ্য বই তিনি পড়তেন সেই সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন—

"এই সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি।" রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত-কুমার একে বলেছেন, 'ইংরেজিতে যাহাকে বলে Precocious child'. রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই নচিকেতাধর্মী অসাধারণ বালক আর 'কবিকাহিনী' সেই বালক নচিকেতারই বাল্যরচনা।

বালক রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণত্বের পরিচয় বাল্যকালেই অনেকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়েই 'কবিকাহিনী' পড়ে কালীপ্রসন্ন

ঘোষ উদীয়মান কবির জয়ধ্বনি করেছিলেন। তাঁর সেই কাব্য সমালোচনা সেকালের রীতি অনুযায়ী একটু উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও 'কবিকাহিনীর' কাব্যগত ভাব ও কাব্যসৌন্দর্যের আলোচনা বলে স্বীকার করতে হয়।

তাই 'কবিকাহিনী'র কবিকৃত আলোচনার উপসংহারে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁর বাল্য-রচনাবলীকে তাঁর কাব্যের আবর্জনা মনে করলেও এই কাব্যখানি রবীন্দ্রকাব্য-বনস্পতির অঙ্কুর হিসাবেই পরিগণিত হবার যোগ্য। কবি নিজেও সে কথা প্রকারান্তরে 'জীবনস্মৃতি'তে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'কাঁচা বয়সে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য এবং প্রতি পদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেই সঙ্গে সত্যকে, সৌন্দর্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।...

"যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"

ব্যর্থ যে হয় নি তার প্রমাণ পরবর্তী বিপুল বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্য। তাই মনে হয়, পরিণত মননের আলোকে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা তাঁর বাল্যরচনার দুর্বলতার দিকটি যেমন তুলে ধরেছে, তেমনি যথার্থ কাব্যপ্রেরণা হিসাবে তাদের মূল্যের কথাও পরিস্ফুটিত করেছে। কবির এই আত্মসমীক্ষা তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যোপলব্ধির যতখানি সহায়ক ততখানি অপর কারও সমালোচনাই নয়।

মগ্নতরী (১৮৮০)

প্রথমবার বিলাত বাসকালে সমুদ্রতীরে বসে 'মগ্নতরী' ('ভগ্নতরী') নামে যে গাথা কাব্যটি লিখেছিলেন 'জীবনস্মৃতি'তে তার সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

"সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইখানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটা বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য দিবার জন্য বর্তমান। গ্রন্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবুও সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না।"

যে বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে লিখতে শুরু করেছিলেন সে বয়সের লেখা সম্পর্কে তাঁর পরিণত বয়সের মতামত কতদূর বিরূপ উল্লিখিত মন্তব্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার অধিকাংশকেই গ্রন্থাবলী থেকে নির্বাসিত করেই তিনি খুশী হন নি, তাদের অবলুপ্তি কামনা করেছেন। সেইসব কাঁচা লেখার জন্য কবি বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় অনুতাপ ও লজ্জাপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু কৈশোরের এই রচনায় অপরিণতিজনিত ত্রুটি থাকলেও এই কাহিনীর স্মৃতি যে পরবর্তীকালে 'নৌকাডুবি' উপন্যাস রচনায় লেখককে প্রেরণা যুগিয়েছে; তার প্রমাণ কেবল নামসাদৃশ্যেই নয়, ঘটনাগ্রন্থনেও উভয় কাহিনীর মধ্যেকার যে মিল লক্ষ্য করা যায় তাতেই পাওয়া যাবে।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)

এই প্রসঙ্গে বিলাতে বাসকালে আর যে একটি কাব্যের পত্তন হয়েছিল তার বিস্তারিত সমালোচনার কথা উল্লেখ করা চলে। 'ভগ্নহৃদয়' নামে এই কাব্য ছাপানো হয়েছিল। তখন লেখকের মনে হয়েছিল 'লেখাটা খুব ভালো হইয়াছে'। কিন্তু এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন নি এবং গ্রন্থাবলীতে এই কাব্যটিকেও স্থান দেন নি। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি এই কাব্যখানিরও বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কবির কথার আলোচনার পূর্বে এই কাব্য প্রকাশের মাত্র দশ বছর পরে ১৮৯১ সালে একখানি চিঠিতে কবি এর যে সমালোচনা করেছিলেন তার উল্লেখ করা চলে। কবি লিখেছেন—

"সল্লির (সরলা দেবী) একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'রুদ্রচণ্ড' সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত—এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কাছে মুরলা, চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনা কাননের লোক··· ।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'ভগ্নহৃদয়ে'র বহু অংশ বর্জিত হয়েছে ; এই গ্রন্থের উপহার কবিতা পরিবর্তিত হয়েছে, বহু ছত্রে পাঠভেদ ঘটেছে, এক কথায় এই কাব্যখানি নিয়ে কবি বিস্তর মাজাঘষা করেছেন এবং প্রিয়নাথ সেন 'যাঁর উৎসাহ ও আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্যরচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল' তাঁরই বিরূপ সমালোচনার ফলে এর প্রতি সগর্ব মমত্ব থাকলেও কাব্যখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করেন নি।

কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'র স্বল্পপরিসরে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ পাতা ধরে 'ভগ্নহৃদয়ে'র যে সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ লিপিবদ্ধ করেছেন তা এই কাব্য সম্পর্কে কবির মমত্বেরই পরিচয় দেয়। 'ভগ্নহৃদয়ে'র দোষত্রুটির কথা সেখানে কবি অবশ্যই উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেই দোষের কারণ অনুসন্ধান অথবা ঐ কাব্য সম্পর্কে সমকালীন পাঠকের প্রশংসার উল্লেখ, প্রমাণ করে এই কাব্যখানি এক সময় কবির প্রিয় ছিল। কবি লিখেছেন—

"মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে, কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন। কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

এই অভিনন্দনের কথা পরেও বারবার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রজীবনী-কারের মতে—'ভগ্নহৃদয়' নীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করেছিল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই ব্যাখ্যা করা চলে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি 'ভগ্নহৃদয়' রচনার কাল সম্পর্কে লিখেছেন—

'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়— আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পলোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন

করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল; তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"

শুধু 'ভগ্নহৃদয়'ই নয়, কবির এই আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত যে সব কবিতা রচিত তা অনেক পরিমাণেই বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনাসর্বস্ব রচনা, তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিল আর ছিল হৃদয় নামক মানবদেহের কোমলতম স্থান সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। 'ভগ্নহৃদয়ে'র বিস্তারিত সমালোচনায় কবি অতঃপর হৃদয়াবেগের বাড়াবাড়ির মূল অনুসন্ধান করেছেন—

"তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্স্‌পীয়র মিল্‌টন ও বায়্‌রন। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে-জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।...ইংরেজি-সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।"

সংযমহীন হৃদয়াবেগের প্রকাশই 'ভগ্নহৃদয়ে'র সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি বলিয়া বোধ হয় কবি এই কাব্যসম্পর্কে এত কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। 'হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ্য নহে—সাহিত্যের লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য, সুতরাং 'সংযম ও সরলতা'—এই কথাটাই কবি 'ভগ্নহৃদয়ে'র সমালোচনায় সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য তথা সংযম ও সরলতার আদর্শের দিকে বরাবরই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বাল্যকালে কবি-সমালোচক যে সব সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এই সৌন্দর্যবাদেরই প্রাধান্য। সুতরাং পরিণত রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ভগ্নহৃদয়ে'র ঐ হৃদয়াবেগের অতিশয়তা নিন্দিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য নাটকাদিতে এই হৃদয়াবেগের প্রবলতা যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি; সমালোচকদের মতে সমকালীন পাঠকের কাছে রবীন্দ্রকাব্য এই হৃদয়াবেগের

অতিশয়তার জন্তই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেও তাই আভাসিত হয়।

'ভগ্নহৃদয়' পাত্রপাত্রীর সংলাপের আকারে রচিত বলে এটি কাব্য না নাটক এবিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে তাই সে বিষয়ে কবির সাবধানবাণী গ্রন্থভূমিকায় এইরূপ—

"এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।"

নাটকাকারে গ্রথিত এই কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ঊষাকালে, তাঁর সাহিত্যিকে প্রবণতারও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দেয়। নাটক ও কাব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত এই রচনায় নাটক অপেক্ষা কাব্যের প্রভাব বেশী—হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করে করে 'যে রচনার সৃষ্টি তা যে নাটক নয় কাব্যই' কবি নিজেই সে কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়' পাঠ করে পাঠক আরও একটু বেশী জানতে পেরেছেন। এই কাব্যখানি যেন রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার আপন পথ সন্ধানের কাব্য। 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য কবিতা নাটকাদি রচনার মূল কথা হ'ল প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত বাহনটির অনুসন্ধান। মহাকাব্য তো নয়ই, আখ্যানকাব্যও নয়, নাটক কিংবা নাট্যকাব্যও নয়, গীতিকাব্যই যে কবির যথার্থ বাহন 'সন্ধ্যাসংগীতে' এসে কবি তা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন। 'ভগ্নহৃদয়ে'ই এই পথ অনুসন্ধানের শুরু। 'শৈশব সংগীতে' অস্পষ্টভাবে কবি যেন আপনার পথটি আবিষ্কার করেছেন। 'শৈশব সংগীতে'র যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে এই দিক থেকেই। এই কাব্যখানির বড়ো গুণ এর গীতিমাধুর্য। কবিতার এই লিরিক-শক্তিই পরবর্তী-কালের গীতিকবি ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস দেয়। পরিণত রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনারূপেই এই কাব্যের কবিতাগুলির সার্থকতা, কাব্যোৎকর্ষের বিচার এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। 'ভগ্নহৃদয়ে'রও সার্থকতা কাব্যবিচারের কষ্টিপাথরে কষে দেখা উচিত নয়। পরিণত রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্বাভাস এখানে কতটুকু পাওয়া যায় তাই আমাদের বিচার্য। সমালোচকের মতে—

"মানবহৃদয় ও প্রেমের সম্পর্কের যে আভাস এই কাব্যে তাহার পরিণততম ফল পূরবীতে, মহুয়ায় ও পরবর্তী সব কাব্যে।" আর একটি বিষয়েও এই

অপরিণত রচনায় পরিণতির আভাস আছে। "এই কাব্যের ললিতা, মুরলা ও নলিনী-কে প্রকৃতি-অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা চলে। ললিতা মুরলা এক জাতের মেয়ে, নলিনী অন্য জাতের। এই দুই শ্রেণীর মেয়েই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে বরাবর আকর্ষণ করেছে। ভগ্নহৃদয়ে ইহাদের প্রথম আভাস।"

কবি নিজেই এই দুই জাতের মেয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক পরবর্তীকালের লেখা 'দুইবোন' উপন্যাসের সূচনায় বলেছেন—

"মেয়েরা দুইজাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

"আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকার বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'বলাকার' ১৭ সংখ্যক কবিতা ('দুই নারী')-তেও কবির এই দুই নারী তত্ত্বকেই কাব্যরূপ দেওয়া হয়েছে। 'বলাকার' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেকথা বলেছি।

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২)

গীতিকবিতাই যে রবীন্দ্রপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম 'শৈশব সংগীতে' কবিমনে সে সম্পর্কে যদি বা কিছু সংশয় থাকে 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার পর তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। কবির সেই সত্যকার বাহন আবিষ্কারের ইতিহাস 'জীবনস্মৃতি'র 'সন্ধ্যাসংগীত অধ্যায়ে' এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

"যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে

যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।”

এইভাবে চিত্তের প্রসাদ থেকে যে কবিতার সৃষ্টি হ'ল তা সুন্দর বলে নয়, যথার্থ নিজের বলেই কবি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন। কবি লিখেছেন—

“এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল; বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই···নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে-পরিতৃপ্তি তাহাকে অহঙ্কার বলিব না। · এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম।···কোনো প্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে-জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে, যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই।”

গদ্যরচনায় কবির আত্মনির্ভরতা অনেক আগে অনেক বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করেছিল—‘মেঘনাদবধকাব্য’ সমালোচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাব্যের জলাভূমিতে এই আত্মবিশ্বাসের মৃত্তিকা আবিষ্কার কালক্রমেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে ‘সন্ধ্যাসংগীত’ রচনার সময়টাকে সকলের চেয়ে স্মরণীয় মনে করেছেন সে কি এই কারণেই? না হলে কাব্য হিসাবে ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র মূল্য যে বেশি নয়, ‘উহার কবিতাগুলি যে যথেষ্ট কাঁচা, উহার ছন্দ ভাষা ভাব মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই,’ সে কথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভালো করে আর কে বলেছেন? কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও কবি এই কাব্যের গুণের কথাটিও ধরে দিতে পেরেছেন—তিনি লিখেছেন—

“উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।”

এই খুশিটার মূল্য স্বীকার করেছেন বলেই কবি ১৯১৫ সালে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে ‘সন্ধ্যাসংগীতে’র পূর্ববর্তী তাঁর সমস্ত কবিতা কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বাদ দিয়েছেন কিন্তু ‘সন্ধ্যাসংগীত’কে বাদ দেন নি। বরং এই কাব্যের ‘কাঁচা ও

দুর্বল' লেখাগুলি সম্পর্কে 'কাব্যগ্রন্থে'র ভূমিকায় কবি দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

"সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,—নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো-মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেন-না সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়—অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে, সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।"

'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে এই আবর্জনার অংশ বাদ দেওয়ার জন্য কবি এই কাব্যের কবিতাগুলি পরবর্তীকালে যথেষ্ট সংস্কারও করেছেন। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পাঠান্তর সম্বলিত 'রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ—সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থখানির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। ঐ গ্রন্থে 'সন্ধ্যা' কবিতার একখানি প্রুফ দেখার পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ঐ পৃষ্ঠায় কবির স্বহস্তলিখিত যে কথা কয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল—

'এ কবিতাটি অসহ্য পুনরাবৃত্তি, সংশোধনের অতীত, এটা পরিত্যাজ্য'।

যৌবনেই নিজের কৈশোর রচনার কি নির্মম সমালোচক ছিলেন কবি তারই পরিচয় আছে এই কথা কয়টির মধ্যে।

১৯০৩ খ্রীঃ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে মাত্র ১০টি কবিতা গৃহীত হয়েছে; 'সঞ্চয়িতায়' "উপহার" (ভুলে গেছি কবে তুমি) কবিতার কয়েকটি মাত্র ছত্র গ্রহণ করে কবি সমগ্র কাব্য বর্জন করেছেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশকালে ইতিহাস রক্ষার খাতিরে কবি আপন কবিতা নির্বাচন সম্বন্ধে এরূপ নির্মম হতে পারেন নি, তবু এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাকে রক্ষা করিবার কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখেছেন—

"এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি···সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়।···প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা। সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে

তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়াছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।"

প্রাক্-সন্ধ্যাসংগীত পর্বকে কবি 'কপিবুক যুগ' বলেছেন, কবির এই অভিধা যথার্থ হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'কে কবি তুলনা করেছেন আমের গুটির সঙ্গে। আমের গুটিতে রসের মিষ্ট স্বাদ নেই, আছে অম্লকষায় আস্বাদ, তবু তারই মধ্যে রসাল ফলের মিষ্টতার পরিচয় সুপ্ত থাকে। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদও যে পাঠককে তৃপ্ত করবে 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই তার আভাস আছে। রসের পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকলেও 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই রবীন্দ্রকাব্যের স্বকীয় রূপের পরিচয় আছে, ছন্দেও অভিনবত্বের পরিচয় অতি প্রত্যক্ষ।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রতি কবির সস্নেহ মমত্ব এই কাব্যের রূপ সম্পূর্ণতার অভাবের কারণ বিশ্লেষণের মধ্যেও স্পষ্ট হয়েছে। নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থায় এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল তার পরিচয় দিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন—

"বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কর্মহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল, তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।"

নিজের হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে কবি পথ হারিয়েছিলেন, এইজন্য 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলি 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে লক্ষণীয় হৃদয়-অরণ্যে কবি শুধু পথ হারান নি রীতিমত পথ খুঁজেছেন—

"নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায় ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে, অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।"

ভাষার এই অস্পষ্টতার জন্য সমসাময়িক কাব্যসমালোকদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'এই একটা রব উঠিতেছিল যে, তিনি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি।' সমস্তই তার 'ধোঁওয়া-ধোঁওয়া, ছায়া-ছায়া'। কথাটা তাঁর পক্ষে যতই অপ্রিয় হোক-না-কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতঃই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না।

'সন্ধ্যাসংগীতে'র এই ভাঙা-ভাঙা ছন্দের কথা 'জীবনস্মৃতি'তে স্বীকার করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সপক্ষে একটু ওকালতিও করেছেন—

"যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা বিশেষ অবস্থার সত্য, তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থা বিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্য প্রকৃতিতে তাহা সত্য, সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক চলিতে পারে। কিন্তু একেবারেই নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না।"

'সন্ধ্যাসংগীতে'র মূল্য নেই একথা আমরাও বলি না—কাব্যরূপের ত্রুটি সত্ত্বেও 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলির মূল যেহেতু কবির গভীর অন্তরতম প্রদেশে নিহিত তাই কাব্যমূল্য ছাড়াও এই গ্রন্থখানির কবির প্রতিভাবিকাশের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কবির নিজের মন কাব্যরচনায় কিভাবে কাজ করেছে তার আভাস দিয়ে এই কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের একটা বড়ো দায়িত্বই পালন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

অবশ্য কাব্য হিসাবে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র একেবারেই মূল্য নেই এ কথা কি কবি, কি সমসাময়িক ও পরবর্তী সমালোচক কেউই বলেন নি। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র জন্মের পর রমেশচন্দ্র তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং এই 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার দ্বারাই কবি এমন একজন বন্ধু লাভ করেছিলেন "যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মতো আমার কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল—তিনি প্রিয়নাথ সেন।"

এইজন্য 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কাব্যরূপ সম্পর্কে কবির অসন্তোষ বহুভাবে ব্যক্ত হলেও কবি 'সন্ধ্যাসংগীত'কে দিয়েই রবীন্দ্রকাব্যপরিচয় শুরু করেছেন। কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় কবি যে কথা বলেছেন তাতেই এই কাব্যগ্রন্থখানি মূল্য কবির নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।"

'সন্ধ্যাসংগীতে'র কাছে এই ঋণ রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচক সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আমরাও লক্ষ্য করলাম 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্য ব্যাখ্যাকালে কবি-সমালোচক ঐ কাব্যরচনাকালের মানসিক পটভূমিকার কথাই বারবার উল্লেখ করেছেন। 'যে কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষা'র কথা কবি বলেছেন আমাদের মনে হয় তা রোমান্টিক কবিদের স্বাভাবিক মনোভাব—এই অকারণ বিষাদের ভাব যাকে ইংরেজিতে Nostalgia বলে তাই। 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনাকালীন কবিমানসে এই বিষণ্নতা অবশ্যই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সমালোচক হিসেবে সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। পরিণত বয়সে জীবনদেবতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে এক ভাষণে কবি সন্ধ্যাসংগীতের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"আমি যখন সাহাজাদপুরে ছিলাম তখন একটি গভীর আত্মচেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলাম, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতাগুলির মধ্যে আমার এই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, আমি যেন আমাকে পেয়ে আমাকে জেনে বেঁচে গেলাম। এর আগে আমি কি কি ছিলাম জানি না, হয়তো বিহারী চক্রবর্তী বা আর কিছু ছিলাম। কিন্তু এই সময় থেকে আমার রচনার মধ্যে স্বতঃস্ফুরণ হতে লাগল, সৃষ্টির আনন্দে আমার মন ভরে গেল।"[১৪]

এই সৃষ্টির আনন্দ থেকেই পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্য-গ্রন্থাবলীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে তাই রবীন্দ্রকাব্যসমূহের মধ্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কে পাদপীঠের মর্যাদা দেওয়া চলে। কবির মনের ভিতরের রহস্য সন্ধানে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র আলোচনা অপরিহার্য।

প্রভাতসংগীত (১৮৮৩)

'সঞ্চয়িতার' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যদিও 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', এবং 'ছবি ও গান' এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থকে একই মাপকাঠিতে বিচার করে ঐ তিন গ্রন্থ সম্পর্কেই এক রায় দিয়েছেন—

"ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারবো না।"

কিন্তু 'প্রভাতসংগীত' সম্পর্কে একেই কবির চূড়ান্ত রায় মনে না করার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনার মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থটি কবির নিজের চোখে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল বলেই আমাদের মনে হয়। 'জীবনস্মৃতি' রচনার কাল (১৯১২) থেকে শুরু করে বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথমখণ্ড প্রকাশের কাল (১৯৩৯) পর্যন্ত নানা সূত্রে এই কাব্য-সম্পর্কে কবি নানা কথা বলেছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার কথা কবি যে, কত প্রসঙ্গে কতভাবে বলেছেন তার হিসাব রাখা শক্ত। এই কাব্য সম্পর্কে কবি-সমালোচকের নির্মমতা 'সন্ধ্যাসংগীত' অপেক্ষা কম বরং এর সম্পর্কে 'কবির কেমন যেন একটু বিশেষ মায়ার ভাবই লক্ষ্য করা যায়। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র আলোচনায় কবি ঐ কাব্যের সামগ্রিক ভাব ব্যাখ্যার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন দেখা যায়। 'প্রভাতসংগীতে'র সমালোচনাকালে ভাবব্যাখ্যা ছাড়াও কোন কোন বিশেষ কবিতার আলোচনাও যুক্ত হয়েছে। তাই 'প্রভাতসংগীতের' কবিকৃত আলোচনা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর। 'জীবনস্মৃতি'র প্রায় সাড়ে সাত পাতা আলোচনা ছাড়াও ১৩৩৩ সালে 'মানুষের ধর্ম' রচনাকালে এই গ্রন্থখানির দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তা ছাড়া নানা প্রসঙ্গে এই কাব্য অথবা এর অন্তর্গত কোন কোন কবিতা সম্পর্কে কবির মন্তব্যের পরিমাণও সামান্য নয়। তাই 'প্রভাতসংগীতে' কবির বাল্যলীলার লজ্জার কালিমা যতই থাক রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম ব্যাখ্যাতা অজিতকুমার চক্রবর্তীর মত আমাদেরও "খুব বিশ্বাস যে 'প্রভাতসংগীতে'ই কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে।"[১৫] কবি নিজেই সমালোচক অজিতকুমারের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে 'জীবনস্মৃতি' রচনা ও আলোচনাকালে। কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে কবি স্বয়ং যে কাব্য-সমালোচনার সূত্রপাত করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী তার দুই গ্রন্থে রবীন্দ্রকবিমানস ও রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমায় সেই রীতিরই অনুবর্তন করেন।

প্রভাতসংগীতে'র একটি কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" সম্পর্কে কবির বক্তব্য কিছু বিস্তারিত। 'জীবনস্মৃতি'র একটি পাণ্ডুলিপিতে কবি লিখেছেন—

"একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।"[১৬]

এই অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির কথা কবি জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করেছেন

আবার পরিণত বার্ধক্যে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেও তার সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। সেখানে এই অভিজ্ঞতাকে কবি 'আধ্যাত্মিক' বলেছেন, সমালোচকের ভাষায় একে বলা চলে মিস্টিক'।[১৭] এই মিস্টিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা কবির নিজের ভাষায় এই রকম—

"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহির্জগতের এই যে 'দিব্যরূপ' দেখলেন তা তাঁর চোখের উপর থেকে অন্ধকারের পর্দাকেই শুধু সরিয়ে দিল না, 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনাকালে কবি হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে যে পথ হারিয়েছিলেন সেই হারানো পথেরও সন্ধান দিল। এতকাল কবি যে বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে দুঃখসংগীত গাইছিলেন এইবারে যেন তার অবসান হ'ল। সন্ধ্যার পর প্রভাতের হ'ল আবির্ভাব।

'প্রভাতসংগীতে'র ঐ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ব্যাখ্যা করে কবি বলবার চেষ্টা করলেও যেহেতু সেই কথাগুলি পরবর্তীকালে চিন্তা করে লেখা তাই তার উপর কবি নিজেই ততটা নির্ভর করতে চান নি, তিনি বলেছেন, "ঠিক সেই সময়ে (প্রভাতসংগীতের কবিতা রচনাকালে) বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাতসংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে কাব্য হিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য।"[১৮]

বস্তুতঃ, সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে 'প্রভাতসংগীতে'র অনেক কবিতাই কাব্যপদবাচ্য রচনা হয় নি বলতে হবে, তার 'ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা।' কিন্তু তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালার সারাংশ শান্তিনিকেতনে পাঠকালে কবি 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাই শুনিয়েছেন, অবশ্য একটু কুণ্ঠিতভাবেই। এতেই অনুমান করা যায়, 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাগুলির কাব্যমূল্য যাইহোক, তত্ত্বমূল্য একটা আছে। পরিণত বয়সে নিজের অপরিণত রচনা ব্যাখ্যা কালে কবি তার থেকে মূল্যবান কিছু তত্ত্ব নিষ্কাশন করতে পেরেছেন এবং আমাদের তাই উপহার দিয়েছেন। সংক্ষেপে এই তত্ত্ব হল—অহংতত্ত্ব ও মানবত্ব। অহং 'আপনাতে আবদ্ধ' অসীম থেকে বিচ্যুত, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন কবির মতে সেটা মিথ্যা। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নতুন জীবন লাভ করে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কবির সেই অহংমুক্ত ভূমানন্দের প্রকাশ।

দুচার দিন পরে লেখা 'প্রভাত-উৎসব' কবিতাতেও কবি ঐ তত্ত্বকথা আরোপ করে এই কবিতায় মানব সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা আনন্দ অনির্বচনীয়তার প্রকাশ তাই ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য 'সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আঁকু বাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনো রকমে, পরিস্ফুট হয় নি।'

অবশ্য 'প্রভাত-উৎসব' কবিতার মূল বক্তব্য ব্যাখ্যাকালে কবি 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক পত্রে এর অতিশয়োক্তিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

"জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর। ও-একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হ'য়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয়, তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবোদ্গতদন্ত শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন।··· প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর-প্রকৃতির প্রথম বহিরমুখী উচ্ছ্বাস, সেইজন্য ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধা ব্যবধান নেই।"

কিন্তু 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি বলেছেন—"সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা নয়। এ গান দু দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।"

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কবি 'মানুষের ধর্ম' রচনাকালে প্রভাতসংগীতের কবিতা-ব্যাখ্যায় তত্ত্ব আরোপ করেছেন। কবির সেই সময়কার তাত্ত্বিক উপলব্ধি কিভাবে কৈশোরের কবিতা ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করেছে তার আরও প্রমাণ এই রচনাতেই আছে। প্রভাতসংগীতের 'পুনর্মিলন' কবিতার প্রথম স্তবকের,

…আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন"…প্রভৃতি কথার ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে।…তখন স্পষ্ট দেখেছি জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে।… এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্তেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে।"

"সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে পরিপূর্ণভাবে" দেখা যদি বা সম্ভব হয় সেই অনুভূতিকে ঠিকমতো প্রকাশ করা অসম্ভব তাই ঐ 'অনুভূতির অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসংগীতের মধ্যে কবির এই উক্তি যদি বা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় তাঁর পরবর্তী উক্তি উপনিষদের বাণী 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি' তাঁর মুখে বার বার ধ্বনিত হওয়ার মূলে 'প্রভাত-সংগীতে'র ঐ ভুলে যাওয়া অনুভূতিই যে বরাবর কার্যকরী এমন কথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না বরং এর মূলে রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ষির প্রভাব ও ব্রাহ্মধর্মের আচার্য রবীন্দ্রনাথের বহুব্যবহৃত প্রিয় কতকগুলি শ্লোকের সঙ্গে বাল্যের অনুভূতির সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রয়াসই বিশেষ লক্ষণীয়।

'প্রতিধ্বনি' কবিতার দুর্বোধ্যতা দূর করতে গিয়ে কবি জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতেও কবির এই তাত্ত্বিক মনোভাবেরই পরিচয় মেলে—

"জগৎকে সাক্ষাৎ বস্তুরূপে যে দেখিতেছি—মাটিকে মাটি, জলকে জল, অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিতেছি তাহাতে আমাদের আবশ্যকের কাজ চলে সন্দেহ নাই। অনেকের পক্ষে অন্তত অধিকাংশ সময়ে জগৎ কেবল আবশ্যকের

জগৎ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই জগৎই যখন আমাদিগকে সৌন্দর্যে বিহ্বল, রহস্যে অভিভূত করে তখন ইহা কেবল আমাদের পেট ভরায় না অন্তরঙ্গভাবে আমাদের অন্তঃকরণকে আলিঙ্গন করে—বস্তু যেন তখন তাহার বস্তুত্বের মুখোশ ফেলিয়া দিয়া চিদ্‌ভাবে আমাদের চিত্তকে প্রণয় সম্ভাষণ করে। বস্তু জগৎ ভাবের অন্তঃপুরে সেই যে একটা বহুদূরের আভাস বহন করিয়া সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাকেই আমি প্রতিধ্বনি বলিতেছি।"[২০]

অতঃপর কবি উদ্ধৃতি তুলে তুলে কবিতাটির ভাব ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে কতকটা কষ্টকল্পনা কবি নিজেই তা বুঝেছিলেন, তাই জীবনস্মৃতি গ্রন্থ প্রকাশকালে ঐ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্জন করে কবি এই কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

"সেটা ভালো মন্দ যেমনি হোক, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধাঁ লাগাইবার জন্য সে কবিতাটি লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।"

আসলে 'প্রতিধ্বনি' কবিতায় কবির পরিণত বয়সের এক গভীর জিজ্ঞাসারই উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। কবি বিজ্ঞানে দর্শনে যে প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পান নি জীবনপ্রভাতে কল্পনায় সেই প্রশ্নের অস্পষ্ট সমাধান পেয়েছিলেন—এই কবিতাতেই তার প্রমাণ আছে—

কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-মাঝে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সং) প্রকাশকালে 'প্রভাতসংগীতে'র সূচনায় কবি এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন—

"যেভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে—বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে।"

'প্রভাতসংগীত' রচনাকালে "কতকগুলো মত মনের অন্দর-মহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম—অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ,…। 'অনন্ত জীবন' বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল—

বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে, আমার প্রতি মুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল, মৃত্যু তা হলে কী। এক রকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে—গাঁথা পড়ছে অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যু পরম্পরা দিয়ে মর্ত্য জীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। মনে আছে, এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।··· এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট, তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয় নি, তখনও পাই নি ভাষাভারতীর প্রসাদ।"

ভাব অস্পষ্ট; ভাষা অপটু তবুও কবির মন তখন সত্যকে স্পর্শ করেছিল, তাই একটা সুগভীর অনুভূতির অসম্পূর্ণ প্রকাশ 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। অক্‌সফোর্ডে বক্তৃতাদানকালে কবি এই অনুভূতির কথা অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে বলেছেন তাই কবি তার উপর নির্ভর করতে মানা করেছেন বরং 'প্রভাতসংগীতে'র অপটু হাতের রচনাগুলির উপরেই অধিক জোর দিয়েছেন। তবু 'প্রভাতসংগীত' রচনাকালে বালকের মনের খবর জানতে হলে, তার মন কোন্ অনুভূতির দ্বারা কিভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তার পরিচয় নিতে হলে, কবির পরিণত বয়সের চিন্তা করে লেখা রচনার উপরেই নির্ভর করতে হবে। ব্যাখ্যা যতই তত্ত্বপ্রধান হোক, মূল অনুভূতির কথাটি কবি নিজে যতখানি সার্থকভাবে পাঠককে ধরিয়ে

দিতে পারবেন এমন আর অন্য কোন সমালোচক? 'প্রভাতসংগীতে'র "পুনর্মিলন" কবিতাটির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর বয়সে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে উক্ত কবিতার ব্যাখ্যা একত্র মিলিয়ে পড়লেই আমাদের এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। 'পুনর্মিলন' কবিতায় কবি তাঁর স্বল্পকালীন কাব্যজীবনের একটি স্বচ্ছ বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—

সেই, সেই ছেলেবেলা
আনন্দে করেছি খেলা
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল—কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তার মাঝে হ'নু পথহারা।...

সন্ধ্যাসঙ্গীতে 'হৃদয় অরণ্যে' পথ হারাবার পর প্রভাতসঙ্গীতে নিষ্ক্রমণ—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখছেন—

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।... তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের

বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।”

'প্রভাতসংগীতে' কবি তাই গান 'সমাপন' করলেন—

আজ আমি কথা কহিব না
আর আমি গান গাহিব না।

এখন কবির সাধ শুধু 'চেয়ে থাকা'র—

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।

নিজ হৃদয়ের দিক থেকে দৃষ্টিকে বাইরে প্রসারিত করতেই কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ল বিশ্বের বিচিত্র ছবি। মুগ্ধ নেত্রে সেই সব ছবি দেখে কবি পুনরায় গান ধরলেন। রবীন্দ্রকাব্যে নতুন রূপ ও নতুন সুরের আর একটি পালা শুরু হল 'ছবি ও গানে'র মধ্যে।

তাই 'প্রভাতসংগীতে' কবির রচনার প্রথম অধ্যায়ের একটা পালার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেই কবি বললেন—“শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরও একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া আবার আরও একটা দুরূহ সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।” কবি এই তত্ত্বটি তাঁর কবিজীবন সম্পর্কে কতদূর সত্য মনে করতেন তা মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে 'উৎসর্গ' কাব্যরচনার মধ্যেই পরিস্ফুট করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'উৎসর্গ' কাব্যালোচনাকালে করা হবে।

ছবি ও গান (১৮৮৪)

'প্রভাতসংগীতে' রবীন্দ্রকাব্যের যে পালাটি শেষ হয়েছে 'ছবি ও গান' থেকে সেই পালাটাই আবার আর একরকম করে শুরু হল। এই নূতন

পালার প্রথমের দিকে বোধ করি বিস্তর বাজে জিনিস আছে। তবু এই কাব্যগ্রন্থেই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের একটা গোড়ার কথা বলা হয়ে গেছে। কবি নিজেই সে কথা সকলের আগে বলে রেখেছেন—'সাহিত্যের তাৎপর্য' ব্যাখ্যায় একস্থানে কবি বলেছেন—

"বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না।"[২১]

সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কথা যেমন সত্য তেমনি বিশেষভাবে এই কথা কবির নিজের কাব্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'চৈতালি'র সূচনায় কবি লিখেছেন—

"আমার অল্প বয়সের লেখাগুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই।"

বস্তুত নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করে দেখার একটা পালা এই 'ছবি ও গানে'ই আরম্ভ হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র শেষ দিকেই এই চেয়ে থাকার নেশা কবিকে পেয়ে বসেছিল আমরা তা লক্ষ্য করেছি। আবার শুধু চেয়ে থাকাই নয় গেয়ে ওঠার ঝোঁকও কবিকে আগের মতোই পেয়ে বসেছে দেখা যায়। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করে তোলে তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসিয়ে তুলে তার তুচ্ছতা মোচন করার ইচ্ছা ছবি ও গানে ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন—'না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না। এক একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার

প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে।···অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা সুরে ভরিয়া উঠে তখনই আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দূরে যাইতে হয় না।"[২২]

সদ্য বিবাহিত কবি তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, তাঁর বয়স বাইশ বছর। সুতরাং নব যৌবনের নানান রঙের দিনগুলিতে চোখ দিয়ে মনের জিনিসকে ও মন দিয়ে চোখের দেখাকে দেখতে পাবার ইচ্ছা কবিকে পেয়ে বসেছিল। "তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না।"—বলে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে আক্ষেপ করেছেন। ছবি আঁকার হাত খুলেছে কবির একেবারে শেষ বয়সে—প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার হাত এক-আধটু যদিও তাঁর ছিল কিন্তু তখন তার উপর ভরসা না করে কবি নির্ভর করেছেন কথা ও ছন্দের উপর। কিন্তু কথার তুলিতে তখনও স্পষ্ট রেখার টান দিতে শেখেন নি, তবু নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি কথার তুলিতে গড়ে তুলতে তাঁর ভারি ভালো লাগত। সেই ভালো লাগার দৃষ্টান্ত হিসেবে ছবি ও গানের একটি কবিতা 'পূর্ণিমা'-সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে কবির বিস্তারিত আলোচনার উল্লেখ করা চলে। কবিতাটি যে পরিবেশের স্মৃতি নিয়ে রচিত কারোয়ার সমুদ্রতীরের সেই রজনীর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে পরে এই কবিতা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে কবি এই কবিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

"কোনো সদ্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য রচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ্ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না। শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি

তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।"

এখানে সূত্রাকারে বলা এই কথা কটির মধ্যেই 'ছবি ও গানে'র দোষ-ক্রটির যেমন সুন্দর সমালোচনা করা হয়েছে তেমনি যথার্থ ভালো কবিতা সৃষ্টির মূল কথাটিও বলে রেখেছেন কবি। 'ছবি ও গানে'র অধিকাংশ কবিতাই সদ্য আবেগের গদ্‌গদ ভাষ। এই সময় কবি এমন ভাবাবিষ্ট থাকতেন যে তাঁর মনের উপরে প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি ছিল। ফলে তাঁর এই সময়কার রচনায় ভাবুকতাই বেশী, স্মরণের তুলিতে সেই কবিতাগুলি লেখা নয় বলেই কবিত্বের রঙ তাতে ভালো ফোটে নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, 'মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে' 'ছবি ও গানে' রচনার কর্তৃত্ব কবি সেই জীবনদেবতার হাতে তুলে দিতে পারেন নি। কারণ তখনও কবির মধ্যে সেই জীবনদেবতা-চেতনা জাগ্রত হয় নি। তাই এই সময়কার রচনায় বিষয়েরই প্রাধান্য ঘটেছে, ফলে রচনাগুলি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তবের প্রতিবিম্ব বা ছবি হয়েছে, ভাষার ভিতর দিয়ে একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে কবি তখনও সমর্থ হন নি। ফলে সাহিত্যে এই ধরণের রূপচিত্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবির মনে সন্দেহ জেগেছে।

'ছবি ও গানে'র কবিতাগুলির স্থায়ী মূল্য যাই হোক, এই লেখাগুলি যে কবির যৌবনকালের উন্মাদনার স্বাক্ষর বহন করছে সে কথা কবি পরেও স্বীকার করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা তাঁর একখানি পত্রে কবি সে কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছো এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়েছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্য লক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্র বলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।...সত্য কথা বলতে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি

ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরানো লেখায় হয় না।"২৩

'ছবি ও গানে'র প্রসঙ্গ কবির কাছে তখন কি মনোরম ছিল তার পরিচয় আরও একখানি পত্রে আছে—সে পত্রখানিও প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পত্র ৪, পৃ. ১৪৬ দ্রষ্টব্য)। 'ছবি ও গানে'র অপরিণতি—তার কাঁচা লাইন ও ঝাপ্‌সা রঙ্‌ সত্ত্বেও রবীন্দ্রকাব্যে তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি এই সময় বিশেষরূপে যা তাঁর নিজের জায়গা সেইখানে, তাঁর প্রতিষ্ঠাভূমিতে পৌছুতে চলেছেন—এই আত্মবিশ্বাসটুকু কবি অর্জন করেছেন। 'ছবি ও গানে'র অপরিণতির কারণটিও কবি পরিণত বয়সে ঠিকই ধরেছেন—"এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না।...কবি সংসারের ভিতর তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়।"২৪

'ছবি ও গানে'র পূর্ববর্তী রচনায় কবির মন আত্মকেন্দ্রিক—'ছবি ও গানে'র সময় হতে মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানালা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচর মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। মনে রাখতে হবে 'ছবি ও গানে'র কবি বাতায়নবাসী। তাই সংসারের দৃশ্য তিনি দেখেছেন দূর থেকে আর তারই সঙ্গে মনের নেশা মিলিয়ে প্রাণে বিকশিত যৌবন কুসুমগুলিকে কবিতার মধ্যে একে একে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। তাই বয়ঃসন্ধিকালের লেখা এই কাব্যের ভাষায় আছে ছেলেমানুষি কিন্তু ভাবে এসেছে কৈশোর—ফলে সহজ হবার চেষ্টা দেখা যায় এই কাব্যে। 'ছবি ও গানে'র অন্য মূল্য থাক আর নাই থাক একথা অসত্য নয় যে এই কাব্যই 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা করে দিল।

'কড়ি ও কোমলে'র আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আর একখানি কাব্য সম্পর্কে কবির কথাটা বলে নেওয়া দরকার। কারণ এই গ্রন্থভুক্ত কবিতা তাঁর ছোটো থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়সের রচনার সংকলন, এবং এই গ্রন্থখানি 'ছবি ও গান' যাঁকে উৎসর্গ করা—তাঁকেই উৎসর্গীকৃত। সুতরাং সেদিক থেকেও এই গ্রন্থের আলোচনা 'ছবি ও গানে'র সঙ্গেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'জীবনস্মৃতি'তেও কবি 'কড়ি ও কোমলে'র আগেই 'ভানুসিংহের কবিতা'র আলোচনা করেছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)

বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুলভাবে ব্যবহৃত কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা ব্রজবুলির প্রতি ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ছিল। শব্দতত্ত্বে পরবর্তীকালে কবির যে ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায় তার স্বাভাবিক সূচনা এখান থেকেই। যে বয়সে পদাবলী তাঁর হাতে আসে (তেরো-চৌদ্দ) সে বয়সে প্রকাশ্যে তার রসোপভোগ করার যোগ্যতা তাঁর হয় নি, সে ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কিন্তু বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলামিশ্রিত ভাষা অস্পষ্ট বলেই বেশী করে কিশোর কবির মনোযোগ আকর্ষণ করত। স্বাধীনচেতা কবি টীকার উপর নির্ভর না করে নিজে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং ক্রমে পদাবলী এমন গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে এর অনুকরণ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

ভানুসিংহের কবিতা রচনার কৈফিয়ৎ এবং পদাবলীর জালিয়াতির প্রেরণা সম্পর্কে কবি নিজে একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তবে সেইসব ব্যাখ্যায় কৌতুককাহিনীর বর্ণনা থাকলেও আসল কারণ অনুল্লেখিতই আছে। ভানুসিংহের কবিতা রচনার মূল প্রেরণার কথা জীবনস্মৃতিতে 'পিতৃদেব'-প্রসঙ্গে একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

'আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড় গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। …একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না ; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইনে অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীত-গোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং—

এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল।"

বস্তুত এই অসম্পূর্ণ কাব্যোপলব্ধিই বালক কবির মনকে সৌন্দর্যে ও আনন্দে এমন ভরিয়ে তুলেছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ কাব্য তিনি একখানি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তে পড়তে তাদের আপাত দুর্বোধ্য মৈথিলীমিশ্রিত ভাষার শব্দ ও ছন্দ সৌন্দর্যে কবিমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাই এবারে খাতায় শুধু পদ নকল করাই নয় বৈষ্ণব-কবিতার অনুকরণে পদ রচনাতেও কিশোর কবি মনোনিবেশ করেন। জয়দেবের মতো 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি এবং 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' গোবিন্দদাসাদি কবি রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনে নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের এমন একটা রসাবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যা থেকে সৃষ্টি হয় এই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই রসাবেশের সামান্য উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম—'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।"

আর এই খুশির জোয়ারেই একটি একটি করে পদ কবির মনে ভেসে এসেছে। সেই পদাবলীর কাব্যমূল্য যাই হোক—এই খুশির মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। যে কবিতা সৃষ্টির পিছনে এমন রসাবিষ্ট চিত্তের আনন্দহিল্লোল রয়েছে তার সম্পর্কে প্রৌঢ় কবি যতই কঠোর সমালোচনা করুন রসিক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে স্বীকৃত হবে না। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

"ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দেশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গেনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"

কবির এই অভিমত একটু কষে দেখলেই তার ফাঁকি ধরা পড়ে। কবির এই মন্তব্যে বৃদ্ধ বয়সের আত্মসমালোচনা অতি কঠোর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সত্য বটে, ভানুসিংহের কবিতা উৎকৃষ্ট কাব্য নয়, বৈষ্ণব কবিতার

সঙ্গে তুলনায় তা মেকিও হতে পারে, কিন্তু তাঁর কবিপ্রকৃতি ও কাব্যসৃষ্টির লক্ষণ বিচারে তথা কবিত্ব শক্তির উন্মেষ লক্ষ্য করার পক্ষে ঐ কবিতাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। ভানুসিংহের পদাবলীর সবগুলিতেই সস্তা বিলাতি আর্গেনের (আর্গেনের টুংটাং? না পিয়ানোর?) টুংটাং বাজে নি কারণ এই লেখাগুলিতে কবির চিত্তের আনন্দের প্রকাশ আছে। কবি নিজেও বলেছেন

"ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালো মন্দ সমান দরের নয়।"

অবশ্য ছোটো বয়স বলতে কবির যোলো বছর বয়স এবং বড়ো বয়স বলতে সর্বোচ্চ পঁচিশ বছর বয়স বুঝতে হবে। গ্রন্থখানি যদিও কবির তেইশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় (১২৯১) 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' পদটি ১২৯৩ সালে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়—তখন কবির বয়স পঁচিশ বৎসর। সুতরাং যোলো বছর বয়সের লেখার তুলনায় পঁচিশ বছর বয়সের লেখায় অবশ্যই কিছু পরিণতির চিহ্ন আছে। কিন্তু কবির সংকোচ পদাবলীর কাব্যরূপের অপরিণতি নিয়ে ততটা নয়, যত ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গতার অভাব লক্ষ্য করে। কবি বলেছেন—

"পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।"

পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কবি বৈষ্ণব কবিদের নকল করে ভানু-সিংহ ঠাকুরের পদ রচনা করেছেন, কিন্তু পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য তখন তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি, পরেও এই তত্ত্বকে ধর্মীয় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে তাঁর বাধা ছিল, যদিও বৈষ্ণবধর্ম মানবীয় প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করবার চেষ্টা লক্ষ্য করে সীমা ও অসীমের মিলনতত্ত্বে বিশ্বাসী কবি আনন্দিতই হয়েছেন। পরিণত বয়সে বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্বমূল্য অস্বীকার না করেও কবি তার তত্ত্বনিরপেক্ষ কাব্যমূল্য বিচারেই অধিক উৎসাহী হয়েছেন দেখা যায়। (তু "বৈষ্ণব কবিতা", 'সোনার তরী')। ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ যোগ থাকাটা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে ভানুসিংহের পদাবলীর সব রচনা 'ভাবের ঘরে চুরি' হতে যাবে কেন? ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রথম

গানটি রচনার যে ইতিহাস কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বিবৃত করেছেন তা পাঠ করে কবির সেই সমঝদার (?) শ্রোতার মতোই আমরা বলতে পারি, "বেশ তো, এতো বেশ হইয়াছে।" কারণ ষোল বছরের কিশোরের হাতে পরিণত প্রতিভার অধিকারী গোবিন্দদাসের ধ্বনি ঝঙ্কার অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গেই ফুটে উঠেছে—

"গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে···"

আবার শুধু শব্দ ও ধ্বনি ঝঙ্কারেই না কাব্যরসের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট কিছু পদ এই গ্রন্থে আছে। 'সঞ্চয়িতা'য় উদ্ধৃত কবির 'মরণ' ও 'প্রশ্ন' কবিতার কথা এই প্রসঙ্গেই মনে পড়বে। প্রকৃত বৈষ্ণব মরণকে শ্যাম সমান মনে করবেন কিনা সন্দেহ আছে, তাঁরা বড় জোর বিরহ মরণের দ্বন্দ্বে কৃষ্ণ মিলনের উপায় রূপে মরণকে বেছে নেবেন

"এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ।" (গোবিন্দদাস)

কিন্তু মরণকেই শ্যাম সমান বলবেন না। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে কবির মৃত্যু চিন্তার মধ্য দিয়ে পেয়েছি তার সার্থক পূর্বাভাস আছে এই কবিতায়। কবিতার ভণিতাংশে খাঁটি বৈষ্ণবীয় রীতিকেই মান্য করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যে শূন্যতা নয় বরং জীবনের পূর্ণতা—কবির কাছে মৃত্যু এক বরণীয় অতিথিরূপে প্রতিভাত হয়েছে —তাকে নবতর জীবনের সিংহদ্বাররূপে তিনি কল্পনা করেছেন—যৌবনেই কবির এই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই মৃত্যুকে শ্যামসমান মনে করার মধ্যে। সুতরাং যে কবিতায় কবির জীবনদর্শনের পরিচয় আছে, মৃত্যুচিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে তা পুরোপুরি বৈষ্ণব কবিতা না হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আবার শুধু 'মরণ' কবিতাটিই নয়, ভানুসিংহের পদাবলীতে এমন কিছু পদ আছে রাধিকার হৃদয় বিশ্লেষণের দিক থেকে সুরসিক পদাবলী পাঠক যাকে অমূল্যরতন বলে মনে করেছেন—

"রাধিকার ভাব বিশ্লেষণের দিক হইতে ষোড়শ সংখ্যক পদটিকে পদাবলী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া মনে করি। ··এই ধরনের পদ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের বয়স্ক বন্ধু যদি বলিয়া থাকেন 'এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের

হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না', (জীবনস্মৃতি পৃঃ ১৫) তাহা হইলে তাঁহাকে খুব বেশী অতিশয়োক্তি করার অপরাধে দোষী করা যায় না।"[২৫]

উক্ত বন্ধুর মন্তব্যের অতিশয়োক্তিটুকু বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি এমন পদ রচনা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পক্ষে অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু এই পদ রচনা করে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না।

অথচ পরিণত বয়সে কবি এমন একখানা কাব্যের জন্যও অন্তরে কুণ্ঠা বোধ করেছেন তার কারণ 'বৈষ্ণব চিত্তের সঙ্গে ভানুসিংহের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার অভাব' কবি-সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। কাব্যরসের দিক থেকে পদাবলীর আস্বাদন অসম্ভব না হলেও, বাংলার বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুপ্রেরণার ফলে ভক্তিমূলক রচনা বলে তার সম্বন্ধে যে ভিন্ন মনোভাব গড়ে উঠেছে কবি তাকে সমর্থন না করলেও পুরোপরি খণ্ডন করতে পারেন নি, তাই বুঝেছেন পদাবলীর আস্বাদনে না হোক পদ রচনায় বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন—বৈষ্ণব সাধনা—রাধাকৃষ্ণের যুগল-মধুর রসের ভজনাকে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বস্তু করে নিতে হয়। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী কবির নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস তার আনুকূল্য করেনি তাই পদাবলী 'জাল' করতে বসে তার ভাষা ছন্দ প্রভৃতি কাব্য প্রেরণার দিক থেকে সহজেই নকল করলেও ভাবের দিক থেকে খাটি বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারেন নি, আর সেই কারণেই কবি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীকে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' বলেই গণ্য করেছেন। আমরা তা মনে করি না। বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র আন্তর বিভেদ স্বীকার করেও আমরা একথা নিঃসংশয়েই বলতে পারি গীতি-কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদকর্তাদের সার্থক উত্তরসূরীরূপেই ভানুসিংহের কবিতা লিখেছেন—মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবিদের সিদ্ধকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উনিশ শতকের শেষ ভাগে যে পদসাহিত্য তিনি রচনা করেছেন তা রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় তেমন ভাবে না দিলেও বৈষ্ণব কবিতার কালজয়ী নমুনা হিসাবে সাহিত্যে আদরণীয় হবে। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশ করে নি, এমনকি রবীন্দ্রকাব্যেও তার প্রবেশাধিকার অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্র-কাব্যে যখন 'কপিবুকের যুগ' চলেছে তখন বৈষ্ণব কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর শিক্ষা করায় অগৌরবের কিছু নেই। কিন্তু আমরা দেখব পরবর্তীকালে কবি বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আহৃত ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ করে তাঁর কবিতা ও

গানে উপাদান হিসাবে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যের যে বাণী-সংগীত ও ছন্দসংগীত—বর্ণমালার বিশিষ্ট বিন্যাসজনিত ধ্বনি সংগীত ও গতি এবং যতির সমন্বয়জাত তালতরঙ্গ—আমাদের এত মুগ্ধ করে তার উৎসসন্ধানে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামক একটি স্বাক্ষরহীন ব্যঙ্গ রচনায় রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত অসার গবেষণার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করে বলেন—

"ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খ্রীষ্টাব্দের ৪১৫ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খ্রীষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোক পূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খ্রীষ্টশতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।"[২৬]

ভানুসিংহ সম্পর্কে কবির এই কৌতুককর মন্তব্যের পাশে ভানুসিংহের পদাবলী সম্পর্কে কবিরচিত কৌতুক কাহিনীর কথাও উল্লেখ করতে হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি কাহিনীটি এইভাবে বিবৃত করেছেন—

"ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্র-উক্তির শেষাংশ যে ভ্রম শূন্য নয় রবীন্দ্র জীবনীকার তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু কবি 'জীবনস্মৃতি'তে যখন এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন তখন নিঃসন্দেহেই বলা যায় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রতি পরিণত বয়সেও কবির মনে বিশেষ মমতাবোধ ছিল। এই বিষয়ে আরও দু'একটি মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ করা চলে। ১২৮৪ শ্রাবণ মাসে

'ভারতী'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় 'মেঘনাদবধকাব্য' সমালোচনাকালে কবি নিজনামের বিকল্প হিসাবে প্রবন্ধ শেষে 'ভ' অক্ষরটি ব্যবহার করেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার সূচনা হয়েছে এই ১২৮৪ সালেই। সুতরাং 'ভানু' নামটির প্রতি 'রবি'র যে গভীর প্রীতি ছিল তার পরিচয় এতেও পাওয়া যায়। এছাড়া পত্রধারা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর ২য় গ্রন্থরূপে ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী।' উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন—

'এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হয়েচে তার মধ্যে রাণুর (লেডী রাণু মুখার্জী) প্রতি ভানুদাদার আশীর্বাদ পূর্ণ রইল।'

কবির ২৩ বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', আর সাতান্ন বৎসর বয়সের রচনা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', এতকাল পরেও কবি নিজে যখন ভানুসিংহের নামটি ভুলতে পারেন নি নিজের মধ্যে ঐ ছদ্ম নামটিকে জীবিত রেখেছেন তখন 'ভানুসিংহের পদাবলী'কে তিনি যে স্নেহের চোখেই দেখতেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভানুসিংহের পদাবলী'কে রবীন্দ্রনাথ যদি সত্য সত্যই ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর বাল্যলীলার লজ্জা বলে বিবেচনা করতেন, কিংবা 'সাহিত্যে অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' হিসাবে গণ্য করতেন তা হলে পরিণত বয়সে ভানুসিংহের নামটিকে এমন ভাবে স্মরণ করতেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ভানুসিংহ সম্পর্কে কবির নিজের কথাই প্রমাণ করে ভানুসিংহের পদাবলীকে তিনি পরিণত বয়সেও নিজের রচনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন— স্বীকার যে করেছেন তার আরও প্রমাণ ১৩৩৮ সালে সংকলিত গীতবিতানে সমগ্রভাবে ঐ গ্রন্থখানি উদ্ধৃত হয়েছে, এবং আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) প্রকাশকালে 'শৈশবসংগীত'কে বর্জন করলেও শৈশবের এই রচনাটি সমগ্রত গৃহীত হয়েছে। সবশেষ কথা, 'সঞ্চয়িতা'য় নিজের কবিতা সংকলনের ভার নিজে গ্রহণ করে কবি এই গ্রন্থের সূচনা করেছেন যে কবিতা দিয়ে তা ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত 'মরণ' কবিতাটি।

কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)

'কড়ি ও কোমল'-এর পূর্ববর্তী কাব্য কবিত্বের জলাভূমি বলে রবীন্দ্রনাথ তাদের একরকম পরিত্যাগ করেছেন। 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন—

"কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ভাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।"

কবির এ উক্তি অযথার্থ নয়। 'কড়ি ও কোমল' রচনার আগে কাব্যের ভাষা কবির কাছে ধরা দেয়নি—'প্রভাতসংগীতে'র সূচনায় কবি সেকথাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। বস্তুত 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' কি 'ভানুসিংহের পদাবলী' পর্যন্ত কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে 'কড়ি ও কোমল'-কে অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনা বলা চলে। পূর্বতন অপরিণত রচনাগুলি সম্পর্কে কবির অভিমত—

"অঙ্কুর যদিও উদ্ভিদ্‌জাতীয় তবু তাকে গাছ বলা চলে না, ঐ লেখাগুলিও তেমনি কাকুতি কিন্তু কাব্য নয়।"[২৭]

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রকাব্য বনস্পতির বৃক্ষরূপ অনেকখানি আত্মপ্রকাশ করেছে। এইজন্যই কবি 'জীবনস্মৃতি'তে এই কাব্যসম্পর্কে লিখেছেন—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার।··· কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।"

'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজিয়ে প্রকাশকালে আশুতোষ চৌধুরী মনে করেছিলেন, 'মানবজীবনের বিচিত্র রসলালা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই কবিতাগুলির মূল কথা।' এইজন্যই 'প্রাণ' কবিতাটিকে এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ রূপে তিনি বসিয়ে দিয়েছিলেন। কবি নিজেও সেই কাজ সমর্থন করেছেন বরং আরও একটু সম্প্রসারিতভাবে কবিতাটিকে তিনি তাঁর পরবর্তী কাব্যের অন্তরের কথা বলে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে কবির এই রকম মন্তব্যই পাওয়া যায়।

'কড়ি ও কোমলে'র 'প্রাণ' কবিতার তাৎপর্য আরও পরিণত বয়সে (চৈত্র ১৩৩৭) দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে কবি নিজেই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

'বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায়ই বাকি নেই।...একদিন কেনো পঁচিশে বৈশাখে যোলো বৎসর বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে, অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্তত একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকুই নিঃসন্দেহ পাওয়া গেল যে আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই, সেও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি এবং রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'।

তার মানে হচ্চে এই, মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেইজন্যেই মোটাসোটা নাম-ওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠলো না, কেননা অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।..যে মানব একই কালে "সনাতন" এবং "পুনর্ণব" আমি তাঁরই কাছে কবিত্বের বায়না নিয়েচি—অতএব মানুষের মধ্যে আমি বাঁচব, তোমাদের সকলের মাঝখানে, কখনো বা তোমরা আমার গায়ে দেবে ধুলো কখনও বা মালাচন্দন। আমি মানুষের অমৃতকে পেয়েচি, তাকে সুখে দুঃখে ভোগ ক'রেছি—আমার রঙীন মাটির ভাঁড়ে তাকে রেখে গেলুম, অনেক চুঁইয়ে গিয়েও কিছু তার বাকি থাকবে,—অল্প হলেও ক্ষতি নেই কেননা ওজনদরে তার দাম নয়।"[২৮]

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে এই কবিতার কথা উল্লেখ করে কবি আরও বলেছেন—

"কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু (আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরীর

বড় ভাই) যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন ('মানসী' রচনার পর) আর তা মনে হয় না। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরি-সমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না।"[২৯]

'মানসী' কাব্য থেকেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যে এই 'আইডিয়াল' ও 'রিয়ালে'র দ্বন্দ্বের ইতিহাস সুস্পষ্ট লক্ষগোচর হয়, কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' কাব্যেই এই বিরোধের পূর্বভাস মিলবে। এই প্রথম কাব্য যেখানে কবির অনির্দেশ সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা কিছুটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হয়েছে। এইটাই তার 'প্রথম কবিতার বই যাহার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বাহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়াছে।'

'কড়ি ও কোমল'-এর আর একটি কবিতা 'যৌবন স্বপ্ন'-কে একালের সুধী সমালোচক এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি "আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে সমস্ত আকাশ'—এই যৌবন স্বপ্নই সামগ্রিকভাবে কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। ইহারই রমণীয় মোহাকুলতা একদিকে কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে অপরদিকে মুক্তি ব্যাকুলতার প্রেরণা দিয়াছে। মানসী, চিত্রা ও সোনার তরী এই সমস্ত যুগ ব্যাপিয়াই এই সর্বচেতনাবাহিত প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্ন, নিখিল ব্যাপ্তি হইতে কবির অনুভূতিতে সংক্রামিত রূপসীর নিঃশ্বাস স্পর্শ তাঁহার কবিকল্পনার মূল শক্তিরূপে নানা লীলা বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[৩০] তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়ে উক্ত সমালোচক 'প্রাণ' কবিতাটিকে কবির ভবিষ্যৎ মর্ত্যপ্রীতি ও মানবিকতা-বোধের পূর্বসূচনা বলে গ্রহণ করতে বলেছেন কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র মর্মার্থবাহী বলে নয়।

সে যাই হোক 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি বিশিষ্ট কবিতা, রবীন্দ্রনাথের নবযৌবনকালের সৌন্দর্যানুভূতির বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। 'যৌবন স্বপ্নে'র পর 'ক্ষণিকমিলন' ও 'গীতোচ্ছ্বাস' এই দুটি ইঙ্গিতগর্ভ কবিতা রয়েছে, তার পরেই নারীর দেহমাধুর্যের মনোরম বর্ণনা সংবলিত কতকগুলি সনেট রয়েছে। সৌন্দর্য উন্মুখ কবিমন ইন্দ্রিয়ের পথেই প্রথমতঃ সৌন্দর্যের রহস্য সন্ধান করতে চেয়েছে কিন্তু পরিণামে 'শ্রান্তি' লাভ করে কবি

'পবিত্রপ্রেম' 'পবিত্র জীবনে'র কথা চিন্তা করেছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন যে, সৌন্দর্যের স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের পথে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কিংবা বলা চলে, কবি যেন ঠিক বুঝতে পারেন নি ইন্দ্রিয়চর্যা অথবা ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য সন্ধান কোনটি তাঁর আসল কাম্য। রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তবাভিমুখিতা ও কল্পলোকগামিতা—এই দুই বিরুদ্ধ প্রবর্তনার বিরোধ এইখান থেকেই শুরু হয়েছে। এই উভয়ের দ্বন্দ্বই রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—'কড়ি ও কোমলে'র পর থেকেই আমার কাব্য রচনা ভালো-মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।' জীবনধর্মী কবির বাস্তবদৃষ্টি ও স্বদেশপ্রীতির সুস্পষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র উপধাস্থিত 'আহ্বানগীত' নামক কবিতায়। এখানে কবির বহির্দৃষ্টি প্রবণতা লক্ষ্য করার মত।

এই কাব্য সম্পর্কে রচনাবলীর এই গ্রন্থভূমিকায় কবি আরও বলেছেন, "কড়ি ও কোমলে' যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

'কড়ি ও কোমলে'র সূচনায় কবির এই মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যৌবন মোহাবিষ্ট কবির চিত্তে মৃত্যুর শোকচ্ছায়া পড়েছে। 'কড়ি ও কোমল' রচনার বছরখানেক আগে কবিজীবনে মৃত্যুর এক কঠিন অভিজ্ঞতা তীব্র শোকের আঘাত হেনেছে—চব্বিশ বছর বয়সের এই মৃত্যু অভিজ্ঞতার কথা কবি জীবনস্মৃতির 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই বুকভাঙা শোকের ছায়াসম্পাত লক্ষ্য করা যায় 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতায়। অবশ্য 'কড়ি ও কোমলে'র পরেও বহুস্থানেই কবি এই মৃত্যুশোককে স্মরণ করেছেন, কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দু'বছর পরে প্রকাশিত এই গ্রন্থেই সেই শোকের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। সুতরাং এই কাব্যটির বিশ্লেষণের সাহায্যেই কবির মানস অভিঘাত বুঝতে হবে। 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম দুটি কবিতায় (প্রবেশক কবিতাটিকে গ্রন্থের মুখবন্ধ বলা উচিত) কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দুঃখ প্রত্যক্ষ ছায়াপাত করেছে। 'পুরাতন'-কে বিদায় দিতে বুক ভেঙে যায় তবু তাকে বিদায় দিতে হয়, তার জন্য পবিত্র অশ্রুপাত করা চলে, কিন্তু সেই

দুঃখকে চিরদিন আঁকড়ে ধরে থাকা চলে না কারণ 'সংসার জীবনময় নাহি হেথা মরণের স্থান'। পুরাতনকে বিদায় দিতে যে বেদনাবোধ স্বাভাবিক তা যেমন এই কাব্যে আছে, তেমনি সেই বেদনার সান্ত্বনাও এই কাব্যেই আছে। 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি' যা কবির কাব্যে নানা বাণীতে প্রকাশিত, তার উদ্ভব এই কাব্যেই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মৃত্যুর উপলব্ধি কবিকে আরও বেশী করে জীবনরসিক করে তুলেছে, প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি কবির অনুরাগকে গাঢ়তর করেছে, এককথায় কবির "জীবন দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বপ্নালুতা ও ভাবাবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত ক'রে ক্রমশঃ গভীর, কঠিন, আত্মসচেতন ও আত্মকৌতুকময় করেছে।"[৩১] রবীন্দ্রমানসে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কবির দৌহিত্রী-স্বামী কৃষ্ণকৃপালনী যথার্থই বলেছেন—'It did not break him it made him.'[৩২] কাদম্বরীদেবীর মহাপ্রয়াণ কবিচিত্তে তীব্র শোকের আঘাত দিলেও তাঁকে ভেঙে না দিয়ে গড়ে তুলেছে। শোকের আঘাতে ভেঙে পড়লে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ইতিবৃত্ত হয়তো অন্যরকম হ'ত, তা যে হয় নি তাতেই প্রমাণ এই মৃত্যু কবিকে জীবনের নিবিড় উপলব্ধির দ্বারদেশে পৌঁছে দিয়েছে, তাঁর কাব্যকে অনন্ত সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

এইজন্যই কি কবি 'জীবনস্মৃতি'র সমাপ্তি টেনেছেন 'কড়ি ও কোমলে'র আলোচনার মধ্য দিয়ে? 'জীবনস্মৃতির' শেষ অনুচ্ছেদে কবি লিখেছেন—

"এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশ ডাঙ্গার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়-পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন ,তাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।…অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

'কড়ি ও কোমল' কবির কাব্যজীবনের অন্তরিতিহাসের তোরণদ্বার। এক

পরে আছে 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি'র পর্ব, প্রাক্‌-গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্য 'কল্পনা-কথা-কাহিনী-ক্ষণিকা', গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা পর্ব, 'পুনশ্চ' পর্ব ও অন্তিম পর্বের মহালের পর মহাল। সেই সব মহালে পাঠককে নিজ শক্তিতে প্রবেশ করতে হবে, কবিমানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে কবির পত্রাবলী ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 'ছিন্ন' ভাষ্যকেই আশ্রয় করে। 'জীবনস্মৃতির' মত এমন একটি সুস্পষ্ট পথরেখা আর পাওয়া যাবে না। অথচ 'কড়ি ও কোমল'-উত্তর কাব্যেই কবি যথার্থ আত্মানুসন্ধান করেছেন। সেখানে নানা ভাঙাগড়া, জয়-পরাজয়, সংঘাত-সম্মিলন, নানা বিরোধ-বক্রতার সাক্ষাৎ মিলবে। কবির 'আত্মপরিচয়' অনুসন্ধানই আমাদের পরবর্তী কাব্যালোচনার মুখ্য লক্ষ্য।

'কড়ি ও কোমলে'ই যে রবীন্দ্রকাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সমালোচকদের সচেতনতা থেকে। এই কাব্য থেকেই রবীন্দ্রকাব্যকে সমালোচকদের কঠোর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা' 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল তার জন্য সমকালীন সাহিত্য-বিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছিল কবিকে। 'কড়ি ও কোমলে'র সমালোচনা করতে গিয়ে সেকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একখানি বিদ্রূপাত্মক পুস্তিকা 'মিঠে কড়া' প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনাকে কবি অনায়াসে উপেক্ষা করেছিলেন যৌবনের তেজে শুধু নয়, 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল' বলে, কবি এই কাব্যের ভালোমন্দ সব কিছু নিয়েই পাঠকের দ্বারে এসে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছিলেন। তাই কবি একথা ভাল করেই বুঝেছেন 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বেই কবির আত্মবিশ্বাসের ডাঙাও জেগে উঠেছে। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ কবি তখন যেমন প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি বাইরের প্রভাব যে তিনি অনেকখানিই কাটিয়ে উঠেছিলেন তা তিনি নিজে যেমন বুঝেছেন তেমনি অপরকেও বুঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে একথা সমকালীন সুধী সমালোচকদের মত কবি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'কড়ি ও কোমলের' সূচনায় এই কাব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনার কথা উল্লেখ করেও এই নব-যৌবনের রচনা সম্পর্কে কবি-সমালোচক

শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর' মতো 'কড়ি ও কোমল'-এর সমালোচনায় রবীন্দ্র-অভিমত তত কঠোর হতে পারে নি।

---

১ অগ্রদূত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

২ 'জীবনস্মৃতির খসড়া' বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক পৌষ ১৩৫০

৩ 'বান্ধব' পত্রিকায় ১২৮১ সনের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত এই কবিতাটিই সম্ভবতঃ হিন্দুমেলার ৯ম অধিবেশনে পঠিত হয়।

দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা'—'দেশ' ২৯শে মে ১৯৫৭, রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

৪ 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৬৬

৫ 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়, 'জীবন-স্মৃতি' পৃঃ ৭৮ (১৩৬৩)

৬ 'সুপ্রভাত' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ ১৩১৭

৭ 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৭৮

৮ 'রচনাপ্রকাশ' অধ্যায় জীবনস্মৃতি পৃঃ ৭৪

৯ 'অবসাদ' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, 'মালতী পুঁথি ; পাণ্ডুলিপি পরিচয়'—রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৫৭।

১০ "কবির মৃত্যু অর্থাৎ কবিজীবনের অবসানই ওই কাব্যটির উপজীব্য বিষয়। বস্তুতঃ 'শৈশব সংগীতে' কবিতাটিতে যা প্রকাশ পেয়েছে লিরিক সংগীত বা গীতি-কবিতারূপে, কবিকাহিনীতে তাই প্রকাশ পেয়েছে আখ্যান-রূপে।" (তদেব পৃঃ ১৪৬)

১১ "কবিকাহিনী রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত সূচনা—ইহার বিপরীত ঘটিলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। রবীন্দ্রনাথের কিশোর কলম আপন অজ্ঞাতসারে কবি-ব্যক্তিত্বের প্রথম খসড়া অঙ্কিত করিতেছিল। কবিকাহিনী কাব্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রথম অস্পষ্ট কাহিনী। এই কারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভার ইতিহাসে ইহার অপরিহার্য্য গুরুত্ব।" অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রসরণী' পৃঃ ৬০ (১৩৫৭)

১২ 'বালক রবীন্দ্রনাথ যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেই জানিতেন না যে সেই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।' অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

১৩ "ভগ্নহৃদয়" 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর'—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী পৃঃ ৯৬

১৪ কবি প্রদত্ত 'জীবনদেবতা' ভাষণের শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত-কৃত অনুলিপি, দ্রঃ 'দেশ' ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৭

১৫ 'রবীন্দ্রনাথ,' অজিত চক্রবর্তী পৃঃ ৩৩ (১৩১৭)

১৬ গ্রন্থ-পরিচয়, 'জীবনস্মৃতি' পৃঃ ২২০

১৭ "Mysticism of Rabindranath"—'Golden book of Tagore,' S. N. Dasgupta পৃ. ৬৮

১৮ "মানবসত্য," 'মানুষের ধর্ম,' রবীন্দ্র-রচনাবলী (২০ খণ্ড) পৃঃ ৪২৪

১৯ তদেব পৃঃ ৪২৭-৪২৮

২০ গ্রন্থ-পরিচয়, 'জীবনস্মৃতি,' ২১৭-২১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২১ "সাহিত্যের মূল্য," 'সাহিত্যের স্বরূপ' রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃঃ ২৭৭

২২ "ছবি ও গান" অধ্যায়, 'জীবনস্মৃতি' পৃঃ ১৩৪, ১৩৫

২৩ চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩২ (১৩৫২)

২৪ সূচনা, 'ছবি ও গান,' রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড

২৫ 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান'—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পৃঃ ২৩ ও ২৫ দ্রঃ (১৩৫৭)

২৬ গ্রন্থ-পরিচয়, জীবনস্মৃতি পৃঃ ১১০

২৭ হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড, পত্র ৫৯ পৃঃ ১২১ (১৯৫৭)

২৮ রবীন্দ্রসদন, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে রক্ষিত কবির পত্রাংশ

২৯ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৫০ (১৩৫২)

৩০ 'রবীন্দ্রকাব্য পরিণতির প্রথম পর্ব'—রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সম্মেলনের কার্যবিবরণী চতুর্থ খণ্ডে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। মোহিতচন্দ্র সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে এই সময়কার অধিকাংশ কবিতা 'যৌবন স্বপ্ন' শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন—'কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা।'

৩১ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', আবু সয়ীদ আইয়ুব পৃঃ ৫৩ (১৯৫৭)

৩২ Rabindranath Tagore—A Biography—K. Kripalani. পৃ. ৫৫ (১৯৫৭)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসী-সোনার তরী-চিত্রা পর্ব

মানসী (১৮৯০)

পঞ্চান্ন বছর বয়সে ভক্ত অজিত চক্রবর্তীকে এক পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর যত বড়, সমস্ত ৫৫ বছর তত বড় নয়। কেন না সেই প্রথম পঁচিশ বছরে নিজেকে ও নিজের জগৎকে পদে পদে চিনে চিনে চলতে হয়েছে—তার প্রত্যেক অংশই আমার চিন্তা এবং অনুভূতির দ্বারা সজীব—তারপরে জীবনের রাস্তা অনেকটা বাঁধা রাস্তা হয়ে ওঠে, তখন চোখ বুজে চলা যায়। কিন্তু তাও বলি, আমার জীবনে এখনো রাস্তা বাঁধা হল না। যে রাস্তা পেরচ্চি সে রাস্তায় আর ফিরচি নে—এমনি করেই এ জীবনের চির বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে অন্যজীবনের বিস্ময়লোকে গিয়ে উত্তীর্ণ হব। আমি মুসাফের, কোনোখানে এখনো আমার ঘর বাঁধা হল না।"[১]

বলাকার পর্বে কবি রবীন্দ্রনাথের এই স্বরূপ পরিচয় যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'কড়ি ও কোমল' তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের রচনা সুতরাং 'কড়ি ও কোমল' কাব্য পর্যন্ত 'নিজেকে ও নিজের জগৎকে পদে পদে চিনে চিনে চলতে হয়েছে, আবার শুধু চিনতে নয়, অপরের কাছে নিজের পরিচয় মেলে ধরতেও হয়েছে। এইজন্য 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত আত্মপরিচয়স্বরূপ কবিকে এত কথা বলতে হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে পরিণতির নানাস্তর পার হয়ে রবীন্দ্রকাব্য পরিণামমুখী হয়েছে কিন্তু কবিত্বের সেই ক্রমবিকাশের ইতিহাস সুস্পষ্ট করে তুলতে কবিকে ততটা ব্যস্ত দেখা যায় না, যতখানি ব্যস্ততা কবিত্বের উন্মেষ পর্বের কাব্য সম্পর্কে লক্ষণীয়। 'মানসী' থেকে রবীন্দ্রনাথের চলার পথ কতকটা প্রস্তুত হয়েই রয়েছে, তখন চোখ বুজে না চললেও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কবি আপন স্বরূপ পরিচয়ের পথে প্রতিষ্ঠিত হতে অগ্রসর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কারণেই 'মানসীকেই' তাঁর প্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা বলে বিবেচনা করেছেন এবং সমালোচকদেরও সেই পরামর্শই দিয়েছেন। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

কবিকথিত এই আদর্শ 'নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ' নয়, 'একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ', যে আদর্শ অনুসারে কবি মনে করেছেন তাঁর লেখাগুলি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌছেছে। 'মানসী' থেকেই কবি তাঁর কাব্যের সফল সূচনা ধরেছেন। তাই 'মানসী'র কবিতাগুলিই প্রথম সনতারিখযুক্ত হয়ে ছাপা হয়েছে। যদিও কবিতাগুলি কাল অনুযায়ী সাজান নেই তবু 'মানসীর' কাল থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে কবি তাঁর রচনার সাহিত্যিক দায়িত্ব নিজের বলে স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বিচার সভায় আত্মসমর্পণ করেছেন এবং এই সময় থেকেই নিজের কাব্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে ওকালতি করা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এ বিষয়ে কবির অভিমত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না।

অতি অল্প বয়স থেকে তাঁর লেখার ধারা তাঁর জীবনের ধারার সঙ্গে কি রকম অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়েছে উন্মেষ পর্বের কাব্যালোচনাকালে কবির নিজের কথাতেই আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু বিকাশ পর্বের কাব্যালোচনায় কবি সেরকম কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে রাজী নন, 'লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর নয়,' বলে তিনি দায় এড়িয়েছেন, কিন্তু 'ছিন্নপত্রাবলী', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত নিজ কাব্য সম্পর্কিত মন্তব্যাদি কবির বিকাশ পর্বের কাব্যের উপর কি আশ্চর্য আলোকপাত করেছে, 'যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচার বুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে'। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে সৌন্দর্য-চেতনাই 'মানসী-সোনার তরী' কাব্যেরমূল ভাব, 'ছিন্নপত্রাবলী' ও লোকেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্যবোধেরই পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এই দুই কাব্যবিচারের মূল সূত্রগুলিও প্রায়শঃই কবি আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। 'চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে' রচনার পরিণতি কিভাবে নূতন বাঁক, নূতন রূপ নিয়েছে তা

'মানসী' কাব্যালোচনাতেও স্পষ্ট হবে। 'মানসীতে' কবিকল্পনার যে অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তার কারণস্বরূপ এই কাব্য রচনাকালে চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়া পরিবর্তনের কথা কবি নিজেই বারবার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২য় খণ্ডে 'মানসী'র ভূমিকায় কবি বলেছেন—

"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে (গাজিপুরে) আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এলো মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।"

'মানসী' কাব্যরচনার অর্ধশতাব্দী কাল পরে লেখা 'মানসী' সম্পর্কিত এই মন্তব্যে গাজিপুরের স্মৃতিকে একটু অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল, গাজিপুরে লেখা 'মানসী'র কবিতাগুলি ভিন্নতর পরিবেশে রচিত হওয়াও হয়তো অসম্ভব ছিল না, কারণ গীতিকবি সব সময় পরিবেশ সচেতন নন; তবু 'মানসী' কাব্যরচনাকালে গাজিপুর-বাস কবির কল্পনাকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সময় রবীন্দ্র কবি-জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল রবীন্দ্র-ব্যক্তিজীবনে তার মূল অনুসন্ধান অযথার্থ নয়। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের অঙ্গ হিসাবে স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বাস করার সঙ্গে গাজিপুরে নিজের মতো করে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে সংসার করার পার্থক্য যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যার সুফল আমরা 'মানসী' কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। এ ছাড়া গাজিপুরে ছিল অক্ষুণ্ণ অবসর যে অবসর কাব্যসৃষ্টিতে চিরদিন-ই রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করে এসেছে। এ বিষয়ে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা কবির এক পত্রের সাক্ষ্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

"বরাবরই আমি সুদূরের প্রয়াসী—নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য বৃহৎ অবকাশ আমার পক্ষে একান্তই আবশ্যক। এই রকম অবকাশ অল্প বয়সে একদিন আমার ছিল। তখন বেদনার কারণ তীব্রই ছিল কিন্তু দায়িত্ব ছিল না—সেই বেদনার পরিবেষ্টনে নির্জনতা ছিল, কিন্তু দায়িত্বের ভিড়ে মনের দিগন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সেই যুগের লেখা কত প্রচুর ছিল।"[২]

যে কল্পিত রূপের স্বপ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে গিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন ভাঙতে যদিও বিলম্ব হয় নি তবুও যে রবীন্দ্রনাথ সেখানেই রয়ে গেলেন তার

বাস্তব কারণ 'মানসী'র সূচনাতে উল্লেখ করলেও আসল কারণের উল্লেখ পাই 'মানসী' অধ্যাপনাকালে কথিত আলোচনাতে। কবি বলেছেন—

"সেখানকার গোলাপকুঞ্জের অবস্থা যাই হোক আমার মনের ইচ্ছার মধ্যে যে আনন্দ নিয়ে গিয়েছিলাম, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। সেই আনন্দ মানসীর কাব্যে ধরা দিয়েছে, নিজেকে প্রকাশ করেছে ছন্দে। বুলবুলের মতন কিংবা সেই কবিদের (সাদী এবং হাফেজ) মতন সেই আনন্দই মন্ত্রিত হয়েছে ছন্দে, ছন্দের ধ্বনিতে।"[৩]

নূতন পরিবেশ কবির মানসিক একটা আনন্দের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই মানসিক আনন্দই 'মানসী'তে কবি কল্পনার অপ্রত্যাশিত মুক্তি ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'মানসী'র মূলভাব সম্পর্কেও কবির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্তব্য যথেষ্ট নূতন আলোকপাত করে। 'মানসী'তে মানসসুন্দরীর যে প্রতিমা নির্মাণের কথা আছে সে সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—

"মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে—সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?"[৪]

কবির এই মানসী-প্রতিমার ক্রমসম্পূর্ণতার ইতিহাস আছে পরবর্তী কাব্য-সমূহে, কিন্তু মানসসুন্দরীর অসম্পূর্ণ প্রতিমা যে 'মানসী'তেই নির্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ কি? কবির রোমান্টিক কল্পনা প্রাক্-মানসীপর্বেই এই সৌন্দর্যদেবীর অস্পষ্ট আবির্ভাব অনুমান করেছিল—'মানসী'তে তার পদধ্বনি কবির কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্যের যে আদর্শ মূর্তি কবির মানসে ছিল, বহিঃপ্রকৃতির রূপ রস দিয়ে তার বাস্তব প্রতিমূর্তি গড়ে নিলেও—বাস্তব ও আদর্শে কবি মিল খুঁজে পান নি, তাই শুরু হয়েছে Real ও Ideal-এর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব রোমান্টিক কবিদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব হলেও রোমান্টিক রবীন্দ্রচেতনায় তা 'মানসী' থেকেই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধন করে কবি ক্রমে এই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন—পেরেছেন কিনা পরবর্তী কাব্যালোচনাকালে আমরা তা অনুসন্ধান করে দেখবো। আপাততঃ 'মানসী'র 'উপহার' কবিতায় কবি এই কাব্যে, তথা সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে কবির এই সাধারণ লক্ষ্যের কথা কিভাবে উল্লেখ করেছেন তা কবির ভাষাতেই উদ্ধার করি—

নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারাদিন রাত।...
এ চিরজীবন তাই, আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'মানসী' অধ্যাপনাকালে এই কবিতাটিকে 'মিষ্টিক' আখ্যা দিয়ে এর অর্থ পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন এইভাবে—

"আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বের নানা দিক থেকে প্রেরণা আসে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অহরহ আমাদের মনের মধ্যে নানা দূত পাঠাচ্ছে, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা, পাখীর কলরব, সমুদ্রের তরঙ্গ, আমাদের মনে বিচিত্র বাণী বহন করে আনছে।...এই বাণীর ভাষায় কোনো প্রকাশ নেই, ব্যাকরণ-শুদ্ধ বানানো কোনও কথাও নেই, কিন্তু তার একটা ধ্বনি আছে তা অনির্বচনীয়। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সেই ধ্বনি ওঠে। আমাদের চারিদিকে যা রয়েছে তা অসীম, তার কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই তা অতি বিরাট, কবি তাকে ছন্দের মধ্যে ছাঁচের মধ্যে ফেলে তৈরি ক'রে তুলেছেন, তিনি মনের ভিতরে যে প্রতিমা গড়েছেন তাতে তার আশা ভালোবাসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে কবির কাজ। তাকে সুন্দরের সীমায় বাঁধতে চেয়েছেন, তাই তিনি মানসী প্রতিমা গড়েছেন, সেই প্রতিমায় রূপ নিয়েছে তাঁর আশা তাঁর ভালোবাসা।"[৫]

কবির কাজ সীমার মধ্যে থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন সাধনের চেষ্টা করা—'মানসী'তে সে কাজ সুসম্পন্ন হয় নি তাই কি এই কাব্যের প্রেম-কবিতাগুলিতে একটা অতৃপ্তি, বিষাদ ও নৈরাশ্যের ঘন ছায়া পড়েছে? এই কাব্য প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচক প্রমথ চৌধুরী সেদিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কবি তরুণ সমালোচকের সেই অভিমত 'মানসী'র কবিতা সম্পর্কে সত্য বলে স্বীকার করে নেন এবং ঐ অতৃপ্তি ও বিষাদের মূল অনুসন্ধানের ছলে যে কথা বলেন তাতে এই কাব্যের মূল সুরটি অনেকখানি ধরা পড়েছে। কবির নিজের মধ্যে যে দুটি বিপরীতশক্তির দ্বন্দ্ব চলছে বলে কবি মনে করেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে এক পত্রে কবি লেখেন—

"আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ হিতৈষিকতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য।"[৬]

'মানসী'র মূলসুর সম্পর্কে কবির এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এই কাব্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নির্দেশিত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতি ও য়ুরোপের চাঞ্চল্য মানসীর বেদনা ও বৈরাগ্যের একমাত্র কারণ না হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্র কবিমানসে এই দুই দেশের পরস্পর বিরোধী প্রভাব যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে এই দুই দেশীয় সাহিত্য ও জীবনাদর্শ যে সম্মিলিত হয়েছে তা সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিসত্তা ও দার্শনিক সত্তার যুগপৎ আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো। রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবিরা স্বভাব ধর্মেই যে উচ্চ দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী সে কথা কবি-সমালোচক কোলরিজের একটি উক্তিতে স্পষ্টই স্বীকৃত হয়েছে—তিনি বলেছেন,

"No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher."[৭]

'মানসী'তে দেশহিতৈষণামূলক পরিণত শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কয়েকটি কবিতা আছে—'দুরন্ত-আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর'। এই কবিতাত্রয়ে দেশের জন্য কবির গভীরে ভালবাসা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সমসাময়িক যুগের রাজনীতির 'পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন', সামাজিক জীবনে বাঙালীর অধোগতি ও নব্য হিন্দুদের আর্যামির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণও প্রতিফলিত হয়েছে। কবি আমাদের আলোচ্য পত্রে তাঁর মনের গভীরে এই দুই প্রবণতার কথাই ইঙ্গিতে বলেছেন। কবি নিজের নিছক অনুভূতিময় জীবনের প্রতিও মনের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন 'দুরন্ত আশা' কবিতায়

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন……"

কর্মময় জীবনের কামনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরেও বারবার দেখা গিয়েছে, সেই সঙ্গে 'চিন্তার প্রতি আকর্ষণ'-ও কবি বারবার অনুভব করেছেন।

সুতরাং 'মানসী' সম্পর্কে কবির আত্মসমালোচনা সুতীক্ষ্ণ এবং বিশ্লেষণমূলক সন্দেহ নেই কিন্তু কাব্যরচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালে লেখা হলেও বটে আবার গীতি কবি রবীন্দ্রনাথের মন্ময় স্বভাবের জন্যও বটে, নিজেকে বস্তু তন্ময়-ভাবে (objectively) দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁর সমালোচনাদৃষ্টি অনেকটাই মন্ময় (subjective)।

মন্ময় দৃষ্টিতে কাব্য বিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'মানসী'র "মেঘদূত" কবিতাটি। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে কবি নিজেই এই কবিতার গদ্যভাষ্য রচনা করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র "মেঘদূত" প্রবন্ধটিতে কিংবা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র "নববর্ষা" প্রবন্ধে "মেঘদূত" কাব্যের মূল কথাটি ধরে দিতে চেয়েছেন এবং 'বিরহকাব্য' নামক এক প্রবন্ধে (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৭) আপন বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করাব চেষ্টা করেছেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে কবি 'মেঘদূত' কাব্য থেকে 'বিরহের রস নহে বিরহের তত্ত্ব পদার্থটি' খুঁজে বের করেছেন। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায় 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমালোচকের কণ্ঠস্বরই পুনরায় শোনা গেল। কবি-সমালোচক লিখেছেন—

"জগতের যত কিছু দূরত্ব সমস্তই আমাদের সেই বাসনার স্বর্গলোকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। যাহা কিছু পাই না সমস্তই একটি মস্ত 'না-পাওয়ার' দিকেই মনকে কাঁদাইয়া তোলে। সেই না-পাওয়াটিরই আভাস আমরা জগতের সমস্ত সৌন্দর্যে সংগীতে উপলব্ধি করি। এইজন্যই যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে একটি রোদন আছে, তাহা যে পরিমাণে আমাদিগকে তৃপ্ত করে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী অতৃপ্ত করিয়া রাখে, সে কেবলই আরো আরো আরো দূরের দিকেই পথ দেখাইয়া চলে।"

সৌন্দর্যের আকর্ষণ সুদূরের পিয়াসী কবিকে নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে কেমন-ভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় তার পরিচয় পরবর্তী কাব্য 'সোনার তরী' থেকেই পাওয়া যাবে, আপাততঃ 'মেঘদূত' কবিতায় বিরহী প্রেমিকের অন্তর্নিহিত অতৃপ্তি—চাওয়া ও পাওয়ার দুস্তর ব্যবধানের যে ইঙ্গিত দিয়ে ঐ কবিতাটি শেষ করেছেন সে বিষয়ে কবির উপরি উক্ত মন্তব্যটি যে কতদূর যথার্থ হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। মহাকবি কালিদাস নিজেই লিখেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ"—

মেঘ দেখলে সুখী লোকেরও আনমনা ভাব হয়—রবীন্দ্রনাথ নিজে এই উক্তির সত্যতা যেন নিজ-জীবনেই পরীক্ষা করে নিয়েছেন। কবির ব্যক্তিগত জীবনে

দাম্পত্য সুখের পরিপূর্ণ চিত্র যখন প্রত্যক্ষ করি তখনই কবির অন্তরের অতৃপ্তি একটা মস্ত 'না-পাওয়ার' দিকেই তাঁর মনকে কাঁদিয়ে তুলেছে। সেই 'না-পাওয়া' টিরই আভাস আমরা 'মানস।'র প্রেমের কবিতাগুলিতে পাই। কবির এই 'নিষ্ফল প্রয়াসে'র কথা কবি নিজেই বলেছেন মানসীর একটি কবিতায়—

> নাই নাই, কিছু নাই শুধু অন্বেষণ
> নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া,
> কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
> দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

কবি তাঁর মানুষী প্রেয়সীর মধ্যেই মানসীকে খুঁজেছেন—

> খুঁজিতেছি কোথা তুমি কোথা তুমি।
> যে অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায়।

দেহের রহস্যে বাঁধা আত্মার রহস্য শিখার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কবির মন একটা নৈরাশ্যে ভরে উঠেছে। 'মানসী'র প্রেম কবিতাগুলির মধ্যে তাই একটা ঔদাস্য ও নৈরাশ্যের সুর সহজেই শুনতে পাওয়া যায়। কবি নিজে অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর এক পত্রের উত্তরে গভীর কথাকে হাল্কা করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন—

"ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা —বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিছু জানে না।"

'মানসী'র ভালবাসার অংশটুকুই যে 'মানসী'র কাব্য কথা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—কবির এই উক্তি মেনে নেওয়া চলে না। 'মানসী'র আদর্শরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত কবি ঠিক কি চেয়েছেন তা তিনি নিজেই এই কাব্যে বুঝে উঠতে পারেন নি—এমনটি সম্ভব। 'মানসী'তে যার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করেছেন কবি, তিনি মানসসুন্দরীরূপে 'সোনার তরী'তে কবিকে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু সেই বিদেশিনী অপরিচিতাকে কবি এখনই ঠিকটি চিনে নিতে পারেন নি। 'চিত্রা'র আগে এই 'জীবনদেবতা'র সঙ্গে কবির পরিচয় সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু 'মানসী'তে কবিকণ্ঠে মানসসুন্দরীর যে বন্দনাগীত ধ্বনিত হয়েছে তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কবির থাকতে পারে কিন্তু আমাদের নেই।

'মানসী' সম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটি যে কবির কাছ থেকে সব সময় প্রত্যাশা করা যেতে পারে না তার প্রমাণ শুধু সদ্যোদ্ধৃত পত্রাংশেই নয়, 'মানসী'

অধ্যাপনাকালে কথিত কবির 'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা'তেও পাওয়া যায়। 'মানসী'র প্রথম কয়েকটি কবিতায় বেদনার কথা আছে, আছে গভীর শূন্যতাবোধের অনুরণন। এ সম্পর্কে সমালোচকদের অনুমান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুস্মৃতিই বিষাদকরুণ সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করে কবিকে এই কবিতাগুলি রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে। কবি নিজে এই বিষয়ে নিজস্ব যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাতে ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার উল্লেখ অপেক্ষা দুঃখতত্ত্ব সম্পর্কে কবির নিজস্ব অভিমতই প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপ অভিমত প্রবন্ধাকারে কবি ব্যক্ত করেছেন 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকায় যা লেখা ১৩৪৩ সালের আশ্বিনমাসে, আর 'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকাটি' ছাপা হয় ১৩৪৭ সালে প্রবাসী পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায়। অধ্যাপনার কাল কিছু আগে হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় দুঃখতত্ত্বের প্রবক্তাই 'মানসী' কাব্য ব্যাখ্যাকালে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলে অনুমান করা চলে। আর সেক্ষেত্রে 'মানসী' কাব্যের বেদনারক্তিম লেখার সময় কবির মনে ঠিক কোন ভাবটি ছিল তা কবি আমাদের বুঝাতে চান নি বলেই আমাদের ধারণা। কাব্যসৃষ্টির অর্ধশতাব্দী কাল পরে কবিতার ব্যাখ্যা করতে গেলে এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। কবি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন—'মানসীকাব্যপাঠের ভূমিকা'য়—

"যখন রচনা করি তখন কী মনে করে লিখেছিলাম তা বলা শক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিছু ফিরে দেখি, তখন অনেক লেখা ঝাপ্‌সা মনে হয়, তার সম্পূর্ণ অর্থ কী তা বলা যায় না।"

সুপরিণত প্রতিভার আলোকে পরিণতির প্রথম পর্বে রচিত কাব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি অনেক সময়েই তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন। কবি স্বীকার করেছেন—

"এইসব কবিতাতে যা বলতে চেয়েছি, তার মূলে জীবনের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়তো ছিল," কিন্তু কোন্ অভিজ্ঞতা তা কবি আমাদের বলেন নি। নাই বলুন, কবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতাকে কিভাবে কাব্যরূপ দান করেন সেই তত্ত্বকথাটি কবি ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"কবির চিত্তে দুটি পর্ব বা অধ্যায় থাকে। এক অধ্যায় সে তার জীবনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করে বলতে চায়, সেই বলার জন্যে তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে।...তার জীবনের আর একটা দিকও আছে; সে অধ্যায়ে সে বেদনার

উৎস হতে শ্রান্ত ভাবকে জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণময় রসের সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ...কবি তাঁর কাব্যে, রচনায় জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্যে যা পান সেইটিকেই দৈনন্দিন গণ্ডীর থেকে পার ক'রে নিয়ে চিরন্তনের সুরে তাকে দেন বেঁধে। এই চিরন্তনের মধ্যে নিজের জীবনের এবং অনুভূতির প্রকাশ করাই কবির ধর্ম।" ৮

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি তার উপর তিনি রসজ্ঞ সমালোচকও বটেন, সুতরাং কবির ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের যে কবিতা কটিকে উপলক্ষ করে কথাগুলি বলা সেই সব কবিতার মর্মার্থ এর দ্বারা কতদূর পরিস্ফুট হয়েছে সেকথা বলা শক্ত।

কিন্তু কবি যখন বাইরে থেকে তত্ত্ব আরোপ ছেড়ে 'মানসী' কাব্যের ভেতর থেকেই বক্তব্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তখনই 'মানসী' কাব্যপাঠ তথা রবীন্দ্রকাব্য পাঠের যথার্থ সূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। কবি বলেছেন—

"মানসীর প্রথম দিকের কবিতাগুলিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা উচিত বলা কঠিন। তাতে কবির হৃদয়ের আবেগ রয়েছে; কিন্তু কবিতার শেষ কথা তো তা নয়। হৃদয়ের আবেগ কবিতার উপকরণ বা মশলার মতন, সেই সব উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয় সৌন্দর্যের, সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে কবি তখন ভুলে যান তুচ্ছ দিকের কথা। তখন সেই আবেগকে উপলক্ষ ক'রে মনের বেদনার ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি করতে চান শিল্প কুশলতায় সুন্দরকে।...

"মানসীর গোড়ার কবিতাতে (ভুলে) বারে বারে ভুল করবার কথা আছে, সেটা কিন্তু ধুয়োর মতন, ঐ ধুয়োর মধ্যেই কারিগরি, তারই সহায়তায় ভুলে যাবার দুঃখকে একটা সৌন্দর্যের পটে প্রকাশ করা হয়েছে।"

অর্থাৎ কবির অভিমত এই যে, 'মানসী'র কবিতার মধ্যে আছে 'চিরন্তনের স্বাক্ষর, সুন্দরের স্বাক্ষর'। কবি 'তাঁর জীবনের কল্পনার অনুভূতির শ্রেষ্ঠ ধনকে পরমসম্পদকে' 'সবশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশকে' শুধু কবি-প্রেয়সীর করেই তুলে দেন নি, তুলে দিয়েছেন রসিক কাব্যামোদী পাঠক মাত্রেরই হাতে। সুতরাং 'মানসী' কাব্য বুঝতে গেলে সৌন্দর্যবোধ থাকাটা কাব্য-পাঠকের একান্ত আবশ্যক, কারণ সৌন্দর্যসৃষ্টিই এই পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য।

'মানসী' কাব্য প্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তীকালে কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেন এই কাব্যের যে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন তাতে রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশেষ গুণটির

উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সমালোচক প্রবন্ধের সূচনায় কাব্যপাঠে সৌন্দর্যোপভোগের কথা ব'লে উপসংহার টেনেছেন কাব্যসৌন্দর্যেরই বিচার করে—তাঁর মতে,

"মানসীতে সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্প্রদায় নির্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য।" [৯]

কবির অভিমত সমালোচকের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ।

'মানসী' কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর কবি স্বয়ং বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন—রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'মানসী'র সূচনায় কবি বলেছেন.

'মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।'

কবির সৌন্দর্য অনুভূতি শিল্পীর ভাষা ও ছন্দজ্ঞানের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর ক'রে সুন্দর রূপের মধ্যেই আপনাকে বিকশিত ক'রে তুলেছে। যে প্রকাশতত্ত্বকে কবিত্ব বিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে কবি পরবর্তীকালে নানা প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন শিল্পীচিত্তের সেই প্রকাশ 'মানসী'তে প্রথম সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে বলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' থেকে তাঁর কাব্যের সূচনা ধরেছেন। কবির অনুভূতি পাঠকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয় কবিতার বাণীরূপের মাধ্যমে —সেই বাণীরূপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কবিতার ছন্দ—রবীন্দ্রকাব্যে তাই বরাবরই ছন্দের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। 'মানসী'তে বাংলা ছন্দের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গী কবি আয়ত্ত করেছেন দেখা যায়। কবি নিজেই এবিষয়ে একটি প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"মানসীতে যে ছন্দের পরিবর্তন এসেছিল সেটা ধ্বনির দিক থেকে। লক্ষ্য করেছিলাম, বাংলা কবিতায় জোর পাওয়া যায় না, তার মধ্যে ধ্বনির উচ্চনীচতা নেই, বাংলা কবিতা অতি দ্রুত—গড়িয়ে চলে যায়। ইংরেজীতে য়্যাকসেণ্ট, সংস্কৃতে তরঙ্গায়িততা আছে—বাংলায় তা নেই বলেই পূর্বে পয়ারে সুর করে পড়া হত ; তাই অর্থবোধে কষ্ট হত না। লক্ষ্য করেছি, বাংলা কবিতা কানের ভিতর ধরে না, বোঝবার সম্ভাবনাও ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। এর প্রতিকার চাই, বাংলায় দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ চালানোটা হাস্যকর, সেটা হাস্যরসেই প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে সেটা অচল। এজন্য আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পুরোমাত্রার ওজন দিয়ে ছন্দ রচনা মানসীতে আরম্ভ করেছিলাম। এখন সেটা চলিত হয়ে গেছে ; ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য তাতে বেড়েছে।"[১০]

বাস্তবিকই 'কড়ি ও কোমলে' যেমন কাব্যের ভাষার উপর কবির দখল প্রমাণিত হয়েছে, 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথের ছন্দনির্মাণ ক্ষমতার পরিচয় নিঃসংশয়ে পাওয়া গেছে। মাত্রা, যতি, মিল এবং পদবিন্যাসের অভিনবত্ব দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বাংলা কবিতায় নতুন ছন্দ উদ্ভাবন করেছেন। যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে বাংলা ছন্দকে নতুন শক্তিও দিতে পেরেছেন। 'মানসী' রচনাকালে কত রকমের ছন্দ যে গুঞ্জরিত হয়েছিল কবির মনে তার বিস্তারিত আলোচনা না করলেও ছন্দ রচনা কৌশলের দিকটিও রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যালোচনায় স্থান পেয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 'মানসী'র "নিস্ফল কামনা" কবিতায় মিলহীন চতুর্দশ মাত্রার গণ্ডিভাঙা মুক্তবন্ধ যে ছন্দ কবি প্রথম ব্যবহার করেছেন তাকে ভাবী-কালের রবীন্দ্রকাব্যের গদ্যছন্দের পূর্বাভাস বলা চলে। কবি সে-সম্পর্কেও একস্থানে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন—

"চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙ্গা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম নিস্ফল প্রয়াস।"

বলা বাহুল্য কবি 'নিস্ফল কামনা'র নামই ভ্রমক্রমে 'নিস্ফল প্রয়াস' বলেছেন।

সুতরাং 'মানসী' কাব্যের কবিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত না হলেও তাঁর প্রতিভার পরিণতি পর্বের প্রথম পর্যায়ের একখানি মাত্র কাব্য যে খানিকে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা বলে মনে করেছেন, তার সম্পর্কে কবির এই আলোচনাকে যথেষ্ট বলা যেতে পারে। কবির এই স্বকাব্য আলোচনার সাহায্যে 'মানসী' কাব্যের পূর্ণ মর্ম উদ্ধার হয়তো সম্ভব নয়, কারণ 'মানসী'তে প্রেমের কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে প্রকৃতিপ্রেম তথা বর্ষাবিষয়ক কিছু কবিতা আর আছে পরাধীনতার জ্বালাকে প্রকাশ করে সুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করার মত কিছু উদ্দীপক কবিতা—কবি এই সব জাতের কবিতার বিশদ আলোচনা করেন নি, কিন্তু কবির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে 'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা'রূপে অবশ্যই গ্রহণ করা চলে। স্থানে স্থানে কবির সমালোচনা যে গভীর বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে কবির আত্মবিশ্লেষণের গভীরতা সমালোচক হিসাবে কবির সূক্ষ্ম-দর্শিতারই পরিচায়ক। এই কাব্যের অন্তর্লিখিত নৈরাশ্য ও বিষাদের সুর ও তার কারণস্বরূপ কবিচিত্তে দুইশক্তির দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কবি যে আলোচনা করেছেন

তা যেমন 'মানসী'র মূল সুরটি পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছে তেমনি কবির কাব্যলক্ষ্মী তাঁর মানসসুন্দরীর অনুসন্ধানের সূচনা যে এই কাব্যেই হয়েছে তাও আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি। তাছাড়া রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে কবি যেটুকু মন্তব্য করেছেন তা কবিমানস ও কাব্যবিচারে মূল্যবান সূত্র বলে আমাদের মনে হয়। আবার শুধু কবিমানস ও কাব্যের ভাব বিশ্লেষণই নয় তার বাণীরূপ ভাষা ও ছন্দের কথাও সংক্ষেপে সুন্দরভাবে কবি আলোচনা করেছেন।

মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবিজীবনের অনেক ভাঙাগড়া, অনেক দ্বন্দ্ব-বিরোধের সার্থক সংকেত পাওয়া যায় 'মানসী' কাব্যে আর সে-সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু রবীন্দ্র-বক্তব্য আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যায় সেই সব বক্তব্যের তাৎপর্য আমরা যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করেছি। আমরা দেখেছি 'মানসী'তে কবির কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটেছে, ভাব ছন্দ প্রকাশভঙ্গীর উপর তাঁর অধিকার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেড়েছে, 'কড়ি ও কোমলে'র কবির কণ্ঠস্বর এখানে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতেই আত্মপ্রকাশ করেছে, ভাষার সঙ্গে ভাবের পার্বতী-পরমেশ্বরের যোগ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে সত্যসত্যই এখানে যোগ দিয়েছে।

'মানসী'র কবিতায় ভালোমন্দ মাঝারির ভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু 'মানসী'ই সর্বপ্রথম কাব্য যেখানে কবি-মানসীর সুস্পষ্ট পদসঞ্চার হয়েছে। এই সৌন্দর্যমূর্তির ধ্যান একান্তভাবে কবিচিত্তের নিভৃত ইতিহাসের বিষয়, এবং সেই মূর্তি নির্মাণে কবির আত্মজীবনীর হয়তো কিছু প্রেরণাও ছিল কিন্তু যে কারণেই হোক কবি তাকে বাইরে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন। তাই কাব্য ব্যাখ্যাকালে আত্মজীবনীর প্রেরণাকে বারবার গৌণ স্থান দিয়ে কাব্য সৃষ্টির তত্ত্বব্যাখ্যার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলেই আমাদের অনুমান।

সোনার তরী (১৮৯৩)

'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের মহৎ কাব্যগোত্রীয় রচনা। এই কাব্যের সূচনায় যদিও কবি জানিয়েছেন,

"জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে।··· মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না।"

সুতরাং কবির অভিমত 'লেখকের কাছ থেকে লেখার বেশী আর কিছু আশা করা উচিত নয়।' তাঁকে তাঁর সৃষ্টি বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দিতে বাধ্য নন, কারণ উত্তর দেওয়া তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ নয়। কিন্তু কবির দুর্ভাগ্য আর আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 'সোনার তরী'র নাম-কবিতাটি নিয়েই সমালোচক মহলে এমন অভূতপূর্ব বিতর্ক শুরু হয় যে বাধ্য হয়েই কবিকে এগিয়ে আসতে হয় তাঁর কবিতা ব্যাখ্যার কাজে। এই কবিতাটির 'দুর্বোধ্যতা', 'অর্থহীনতা', 'অবাস্তবতা' নিয়ে একাধিক সমালোচক যে প্রশ্ন তুলেছিলেন কবিকে একাধিকবার তার উত্তর দিতে হয়েছে। কবি-কথিত ও কবি-লিখিত সেই সব ব্যাখ্যার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা চলে।

১৩১৫ সালের এক চৈত্র সন্ধ্যায় 'রবিরশ্মি'-রচয়িতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কবি বলেছিলেন—

"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত-কর্ম-কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কালে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহ করুণা করে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি, সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।'

মহাকাল মানুষের কর্ম কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে; কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না।[১১]

বোধহয় এই সন্ধ্যার পরদিন প্রত্যুষেই (৪ঠা চৈত্র ১৩১৫) কবি শান্তিনিকেতনে 'সোনার তরী'র কথা নিয়েই উপদেশ দেন—তা অনুলিখিত হয়ে শান্তিনিকেতন সপ্তম খণ্ডে চারুবাবু কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। 'তরী বোঝাই' নামক সেই অভিভাষণে 'সোনার তরী'র মর্মকথাই যেন একটু তাত্ত্বিকতার সুরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবিতাটির সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি এইরকম—

"মানুষ সমস্ত জীবন ধ'রে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে...যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকে জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকুর তলিয়ে যাবার সময় হ'ল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যেটুকু নিত্যফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে

না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার কি হবে? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু তা সমস্তই রাখবো, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

"প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হ'তে দিচ্ছে না। কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন ক'রে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনা-স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়।"১২

'সোনার তরী' কবিতাটির এই ব্যাখ্যা ও আলোচনার বছর দুই আগে এক পত্রে কবি এই কবিতা ব্যাখ্যানের সর্ব প্রথম যে প্রয়াস পান তাতে কবি লিখেছিলেন—

"সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদের দুই দিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখো কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত। আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, ধর্মকর্ম, ভাষা-ভাব সমস্তই পূর্ববর্তী অসংখ্য মানবের বিস্মৃত কর্ম—বিস্মৃত চেষ্টার দ্বারাই বিধৃত। আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম-ধাম, সুখ-দুঃখ লইয়া কোন বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে···আমাদের জীবনের ফসল কোনো না কোনো আকারে থাকিয়া যায় কিন্তু আমরা থাকি না।

"এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা"—একলা নয় তো কী? আমরা প্রত্যেকেই যে একলা—আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতল স্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তাহা কে অতিক্রম করিবে? এই ব্যবধানের মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের অন্তরালে, আপনার জীবনের ক্ষেতটুকু লইয়া কাজ করিয়া

যাইতেছি—কাজ করিতে করিতে, ফসল জমা হইতে হইতে এমন দিন আসিয়া পড়ে যখন বুঝিতে পারি, এ ফসল আমি কোথাও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। এ সমস্তই আমাকে দিয়া যাইতে হইবে। কাহাকে দিয়া যাইব? তাহাকে চিনি এবং চিনি না, সে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কিন্তু ধরা দেয় নাই। আমি তাহাকে বলি "ওগো, তুমি আমার সব লও এবং আমাকেও লও।' সে আমার সব লয়, কিন্তু আমাকে লয় না। আমাদের সকলের [ফসল] কুড়াইয়া লইয়া সে কোথায় চলিয়াছে তাহা কি আমরা জানি? সে যে-অনির্দিষ্টের দিকে অহরহ যাইতেছে তাহার কূল কি আমরা দেখিয়াছি? কিন্তু তবু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অপরিচিত অথচ পরিচিত মানব সংসারকেই আমাদের যাহা কিছু সমস্ত দিয়া যাইতে হইবে; নিজে তো কিছুই লইয়া যাইতে পারিব না; নিজেকেও দিয়া যাইতে পারিব না।১৩

'সোনার তরী' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কবি-কথিত ও কবি-লিখিত এই সব ব্যাখ্যার তুলনার অংশগুলির সমালোচনা করলে কবি আমাদের সমালোচনার পাত্র হতে পারেন। কবির উক্তির মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি অবশ্যই আমাদের নজরে পড়বে। 'কীর্তিযস্য স জীবতি' কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে কীর্তির মধ্যে দিয়েই তো কীর্তিমানেরা চিরজীবিত থাকেন একথা বলা যায়। অগ্নি আবিষ্কারক বা বস্ত্র বয়নের তাঁত ইত্যাদির আবিষ্কর্তারা আর হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাসের মত মহাকবিদের কৃতিত্ব কি একই মানদণ্ডে বিচার করা উচিত? প্রয়োজনের সামগ্রী যাঁরা আবিষ্কার করেছেন জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ে তাঁদের নাম তো লেখা আছে কিন্তু অপ্রয়োজনের আনন্দের যাঁরা যোগান দিয়েছেন তাদের কথা আমরা অনুরাগের সঙ্গে স্মৃতিতে বহন করে আসছি।

'শান্তিনিকেতনে'র "তরী বোঝাই" আলোচনাটি স্পষ্টতঃই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা। ঐ কবিতার ঐরূপ গভীর অর্থ ব্যাখ্যা অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু কবিতাটির বিষয়ে কি অকিঞ্চিৎকর এই তাত্ত্বিক সমালোচনা! 'সোনার তরী'র মত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতার রসগ্রহণে কবির এই দার্শনিক সমালোচনা কতটুকু সাহায্য করে? "সোনার তরী লিখিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কবিতার মাধ্যমে কোনো দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। পরিপূর্ণ যৌবনে যে কবিতা রচিত, প্রৌঢ়ত্বের অন্তে উপনীত হইয়া উহাকে কবি কীভাবে

দেখিতেছেন, তাহা আমরা পাঠকদের সম্মুখে পেশ করিতে পারি মাত্র, কিন্তু ফাল্গুন দিনে কবির মনে একটি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণদিনের সুর কেমন করিয়া ধ্বনিল, তাহার সমকালীন ইতিহাস অব্যক্তই রহিয়া যাইবে।"[১৪] রবীন্দ্র-জীবনীকারের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু 'সোনার তরী' কবিতার সেই অব্যক্ত ইতিহাস, কবিহৃদয়ের অর্ধব্যক্ত ভাবটি ধরতে না পেরে সমালোচকদের কেউ কেউ কবিতাটির আক্ষরিক সমালোচনা করতে গিয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, ফলে বাধ্য হয়ে কবিকে অকবিজনোচিত ঐ সব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে ; তা না হলে এই সব দার্শনিক ব্যাখ্যা যে উক্ত কবিতার ক্ষেত্রে কত অপ্রয়োজনীয় তা কবির মত রসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অজানা ছিল না। কবি তাই জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে 'সোনার তরী'র এই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"একটা Concrete picture (বাস্তব ছবি) হইতে ঐ কবিতার উৎপত্তি, উহাকে একটা Concrete picture হিসাবে দেখায় আপত্তি কি ?"

বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রের উপসংহারে কবি তাই কবিতাটির চিত্ররসের ব্যাখ্যার উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"কিন্তু এ-সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করো না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই ; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা ভাব, একটা ছবি, একটা সংগীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী ?"[১৫]

ভরা পদ্মায় উপরকার এক বাদলদিনের অপরাহ্ন বেলায় কাঁচাধানে ডিঙি নৌকা বোঝাই করিয়া চাষীর আগমনের ছবিই যে 'সোনার তরী'র নাম-কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত সেকথা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রেও কবি নিজেই জানিয়েছেন।

বাস্তবিকই 'সোনার তরী' কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে এক একটি ছবি অঙ্কিত হয়ে আছে। শেষ দিকে গান গেয়ে তরী বেয়ে কবি এই কবিতায় যাঁকে আসতে দেখেছেন এই কাব্যের সবশেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় আমরা দেখি কবি তাঁরই সঙ্গে এক তরীতে ঠাঁই পেয়েছেন। এই নেয়ে, এই বিদেশিনী কবির নিরুদ্দেশ যাত্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি কবির অপরিচিত, অথচ পরিচিত, তিনিই যে তাঁর কবি-মানসী, ইনি কখনও নারীবেশে কখনও পুরুষ-রূপে কবির অন্তরে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে কাব্য রচনায় প্রেরিত করেছেন।

তাঁকে উপলক্ষ করে কবি ভাবীকালের পাঠকদের উদ্দেশে তার বহুযত্ন ও বহু সাধনার পরিপক্ব কাব্য ফসলগুলি নিবেদন করেছেন নিজেও সেই সঙ্গে কবি-জীবন থেকে অবসর কামনা করেছেন। 'সোনার তরী'র সেই কর্ণধার কবির জীবনদেবতা কবির কীর্তির ফসল নিঃশেষে গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁর শেষ নিবেদনে কর্ণপাত করেন নি, তিনি তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছুটি দিলেন না, "প্রকারান্তরে জানিয়ে গেলেন যে, এখনও ঐ ক্ষেত্রখানিতে তাঁহাকে বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাইতে হইবে।"[১৬] কবি নিজ জীবনের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা সুস্পষ্ট বুঝতে না পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

কবিজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছেদ ভাবনায় কবিহৃদয় সাময়িকভাবে বিষাদকরুণ এক শূন্যতাবোধে ভরে উঠেছে—এই রোমান্টিক বিষাদ কবির চিত্তে এক হৃদয়দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে সেই দ্বন্দ্ব ভুলতেই কবি হয়তো এই সময় স্মৃতির অর্গল খুলে কল্পনার রাজ্যে মানসভ্রমণে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন—সৃষ্টি হয়েছিল 'সোনার তরী'র রূপকথাধর্মী কবিতাগুলি।

শিশু-বালক রবীন্দ্রনাথ এই রূপকথার গল্পের জগতেরই অতি নিকটে বাস করতেন—'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা'য় সেই রূপকথার জগতের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন কবি, 'ছিন্নপত্রে'র একাধিক পত্রে সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। 'ছিন্নপত্রে'র একখানি পত্রে আছে—

'আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি ভিতরের বাগান, বাড়ি ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারি শক্ত।" (পত্র ৮০ পৃ. ১৯৭)

তার কারণ, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মায়ারাজ্য থেকে মানুষ ক্রমশঃ নির্বাসিত হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার রূঢ় জগতে। কবি নিজেও বাল্যকৈশোরের সেই রূপকথার জগৎ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে এসেছেন। 'মানসী'র যুগে নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে নানা ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে কবিকে সেই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল। তখনও সেই কল্পনাপ্রবণ বাল্যের রহস্যময় নিকেতনের আকর্ষণ কবি ভুলতে পারেন নি। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের

সনাতন প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তিবশেই রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতির রাজ্যে কবি আবার ফিরে এসেছেন। নদীর উপরে ঘুরতে ঘুরতে কবির কেবলই মনে হয়েছে,

"বাংলায় যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরোস্মৃতি দিয়ে সরস ক'রে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখনকার উপযুক্ত হোত।"

কবির এই কামনারই পরিপূর্তি রূপকথাজাতীয় কবিতাগুলিতে ও ছোটগল্প রচনায়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের রসকল্পনারও আশ্চর্য পরিচয় আছে এই কবিতাগুলিতে—'বিম্ববতী', 'রাজাব ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতিতে। এই সব কবিতার মধ্যে প্রথমটি রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা যায় শ্রীমতী নলিনী দেবীকে লেখা কবির এক পত্রে, কবি লিখেছেন—

"অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেকদিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি 'বিম্ববতী' গল্প লিখেছিলেম।"[১৭]

আসলে গল্পটি গ্রিমের সংগৃহীত জার্মান রূপকথাগুচ্ছের একটি, নাম—'তুষারের সাদা এক টুকবো' (Schneewittechen) সংক্ষেপে 'তুষারবতী'। ঐ কাহিনীটিই যে নিজের মনের মতো ছাঁটকাট করে নিয়ে কবি 'বিম্ববতী' রূপকথাটি লিখেছিলেন তা শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথ এবং গ্রিমের একটি গল্প' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। (দ্রঃ 'অমৃত' নববর্ষ সংখ্যা ১৩৫৭)

'সোনার তরী'র আরও কয়েকটি কবিতার ভাব ব্যাখ্যা আছে 'ছিন্নপত্রে'রই পাতায়। কবি লিখেছেন—

"আমার শৈশবসন্ধ্যা কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য। এই

অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তাঁর যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।"

'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় কবির শৈশব স্মৃতির কথাও আছে। কবির আলোচনায় অতি সংক্ষেপে কবিতাটির মর্মবাণীটিই উপস্থাপিত হয়েছে। তার কারণও আছে। কবিতাটি রচনার মাত্র তিন বৎসর পরে কবি এই ব্যাখ্যা করেছেন এবং করেছেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর কাছে যিনি কবির ভাবজগতের অনেক সংবাদই রাখতেন। সুতরাং কবিতা রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালের লেখা বলে এই আলোচনাটিও কবিতার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। 'সোনার তরী' কাব্যের মূলগত সুরটি এই কবিতায় যেমন ব্যক্ত হয়েছে—কবির কথায় তার চমৎকার ব্যাখ্যাটিও মিলেছে। রূপকথা জাতীয় রচনায় যে রোমান্সের জগতের কথা আছে, এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে কবি যেন সহসা সেই অবাস্তব মায়ারাজ্য থেকে বাস্তবজগতে মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসার জগতে নেমে এলেন। প্রকৃতির বুকের কাছটি থেকে কবি দেখলেন মানুষকে "অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।" এই সজীব হৃৎস্পন্দন কবির হৃদয়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে যে ধ্বনির সৃষ্টি করেছে তাই ধরা পড়েছে এই সমগ্রকার কবিতায়।

'সোনার তরী'র আর দুটি কবিতা 'অনাদৃত' ও 'দেউল'এর প্রথমটি সম্পর্কে বিস্তারিত এবং শেষোক্তটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে 'ছিন্নপত্রে'র অপর একটি পত্রে। কবিতা দুটি হয়তো তখন কবির চোখের সামনে ছিল না, 'থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতেন' কবি। প্রথম কবিতাটির পূর্বনাম হয়তো ছিল 'জাল ফেলা' অথবা কবির মনে ঝাপসা রকমের যে ভাব জেগেছিল তাতে তার নামটাও বদলে গেছে। কবি প্রথমে কবিতাটির মর্মার্থ উদ্ধার করে পরিশেষে লিখেছেন—

"বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহণ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে

তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব এখনকার মতো এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশ বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে। যাই হোক 'পস্টারিটি যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হোতেও পারে এ সুখ-কল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হোতেও পারে।"

নিজ ভবিষ্যৎ কবি-কীর্তির সম্বন্ধে এইরূপ দৈবজ্ঞ সুলভ জ্ঞান সোনার তরী কবিতায় যেমন তেমনি এই কবিতাতেও ব্যক্ত হয়েছে। কবির এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমাদের বিস্মিত করে। এই পত্র রচনাকালে কবির স্বদেশবাসী তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহণ করতে পারেন নি বলেই কবির অভিমানমিশ্র একটা ক্ষোভ ছিল এবং কবি মনে মনে আশা করেছেন দেশে তাঁর কবিতার আদর হল না বটে বিদেশে হলেও হতে পারে এবং কবির এই আশা নোবেল পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে কিভাবে পরবর্তীকালে ফলবতী হয়েছিল সেকথা আমাদের জানা আছে। বিদেশ থেকে সেই স্বীকৃতি লাভের পর কবির কবিতা স্বদেশে সর্বজন সমাদৃত হয়ে উঠতে থাকে। নিজের লেখা সম্বন্ধে ভবিতব্যের উপর এই নির্ভরতার কথা ভবভূতির কণ্ঠেও আমরা শুনেছি— উৎপৎসন্তে মম কোহপি সমান ধর্মা।

নিরবধি কালঃ বিপুলা চ পৃথ্বি॥

—'নিরবধি কাল আর বসুধা বিপুল।

জন্মিলে জন্মিতে পারে মম সমতুল॥'

কিন্তু নিজের সম্পর্কে নিজ ভবিষ্যৎবাণী নিজেরই জীবনে অভ্রান্ত সত্যে পরিণত হওয়ার যেমন সার্থক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রত্যক্ষ করা গেছে এমনটি বোধ করি আর কারও জীবনেই ঘটে নি। তাই কবিতাটির কবিকৃত ব্যাখ্যা যেমন সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত এবং অর্থবহ হয়েছে তেমনি শুধু ভাব ব্যাখ্যাই নয় সেই সঙ্গে ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস বহন করে কবিতাটিও তার অর্থ ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

'দেউল' সম্বন্ধে কবি ঐ একই পত্রে লিখেছেন,—

"সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয়

সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয় বজ্র পড়ে, সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্র মন্ত্র ধূপ-ধূনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।"

সংক্ষিপ্ত হলেও 'দেউল' কবিতায় এর চেয়ে যথার্থ অর্থ আর কি হতে পারে? ধূলামন্দিরে দেবতার আরাধনার কথা কবি একাধিক বার বলেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের "ধূলা মন্দির" কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'সোনার তরী'র জীবননিষ্ঠ দৃষ্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় রূপকাবরণের মধ্যে দিয়ে আরও কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—'পরশ পাথর', 'দুই পাখী,' 'আকাশের চাঁদ' প্রভৃতি কবিতায়। সমালোচকদের দ্বারা বহুল ব্যাখ্যাত এই সব কবিতার সম্বন্ধে কবির বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। 'পরশ পাথর' সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন,—

"সংসারে আমরা অনেক কিছু পাই কিন্তু পেয়েছি বলে অনুভব করি নে,—সেই পাওয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাই বলে পাওয়াকে দেখিনে—এই পেয়ে না পাওয়াই তো আমার পরশ পাথর কবিতার বিষয়।"[১৮]

'দুই পাখী' কবিতা রচনার প্রেরণার কথা কবি 'জীবনস্মৃতিতে' বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ করেছেন। ঘর ও বাইরের ব্যবধান ছেলেবেলায় বালক রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল তার বর্ণনা করে কবি লিখছেন—

"বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানলার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।"

এতো গেল কবিতা রচনার বাইরের প্রেরণার কথা—অন্তরের প্রেরণার কথাও কবি অন্য প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে

লেখা সেই পত্রাংশ ('ছবি ও গান' প্রসঙ্গে লেখা) পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে পুনশ্চ বর্তমান প্রসঙ্গে তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা চলে। কবি লিখেছেন—

"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহমিলন পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালো বাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark—(অর্থাৎ একটা হল বনের পাখী অন্যটা খাঁচার) ··মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে অপূর্ণ এবং পূর্ণ —যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।···কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভালো হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভালো কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না।"

'দুই পাখী'তে কবি নিজের মধ্যে Shelley ও Wordsworth-এর Skylark-এর যুগল অস্তিত্বই অনুভব করেছেন। 'মানসী-সোনার তরী' রচনাকালেই কবির মধ্যে এই উভয় অংশ পাশাপাশি বর্তমান ছিল তবে তখনও পর্যন্ত কবি তাদের ভিতর সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি বরং কবির কখনও মনে হয়েছে 'আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে'—কখনও বা উপলব্ধি করেছেন—তাঁকে 'আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে।···সকল বিষয়েই আমি উভচর—মানসজগৎ ও বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।' কবি ভালো করেই বুঝেছেন এদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে, 'নইলে ঠিক কবিতাই হয় না ;'—'সোনার তরী'তে এই সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আছে, আর 'চিত্রা'য় আছে সাফল্য লাভের আনন্দ-সংবাদ। 'সোনার তরী'র দু চারটি কবিতাতেও এই সমন্বিত দৃষ্টির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যথা—'যেতে নাহি দিব'।

'ছিন্নপত্রে'র একাধিক পত্রে 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মূল ভাবের পরোক্ষ আভাস লক্ষ্য করা যায়। চিঠিগুলি প্রায় সবই কবিতাটি রচনার বছর দুই আগে লেখা। কিন্তু কবিতার পূর্বাভাস চিঠিগুলির স্থানে স্থানে লক্ষণীয়। কবিতাটির প্রথমেই একটি বাস্তবদৃশ্যের যে নিখুঁত বর্ণনা আছে তা কবির তীক্ষ্ণ বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেয়। কিন্তু সেই বাস্তব বর্ণনার তলে তলে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যে একটি কোমল বিষাদের ছায়া ধরা পড়েছে

তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। 'ছিন্নপত্রে'র একখানি পত্রে কবি ঘরের গৃহিণীর ভাবটিই যেন পৃথিবীর উপর আরোপ করেছেন। তিনি লিখছেন,

"পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।"

গৃহিণীর কর্মব্যস্ততা নয় তার অশ্রুজল—ঠিক অশ্রুজল নয়—'একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছলছলো ভাব'ই কবিকে অভিভূত করেছে। কিন্তু কবিকে উদাসীন করে তার অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে প্রেমকাতরতা জাগিয়েছে গৃহিণী নয়, চার বছরের অবুঝ কন্যা। তার শিশু মুখের ছোট্ট একটা কথা 'যেতে আমি দিব না তোমায়'—কবির কানে ধ্বনিত করে তুলেছে বিশ্বজননীর হৃদয়ের বেদনা। কবি দেখেছেন পৃথিবীর "মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে আছে—আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে, আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।" এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালবাসা সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই পৃথিবীর প্রতি কবির এত ভালবাসা। 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা' কবিতায় সেই ভালবাসার কথাই আছে। বস্তুত 'সোনার তরী'র "যেতে নাহি দিব" কবিতায় একদিকে রয়েছে সুখ দুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানুষের প্রতি ভালবাসা, অন্যদিকে 'মরণ পীড়িত সেই চিরঞ্জীবী প্রেমের অপরাজেয়তায়' কবির অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রত্যয়। এই কবিতায় পার্থিব ও দিব্য অনুভূতির আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই বলেছেন—

"মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপুলে এবং কোলাহল এবং ঘরকরনার কাজ নিয়ে থাকে, যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।"

রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'তে জননী বসুন্ধরার অন্তরের ভালবাসাকে যেমন ধরে দিয়েছেন তেমনই বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। বসুন্ধরার এই রূপকল্পনা 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিকে রবীন্দ্র-কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার সীমালগ্ন করে দিয়েছে। এই কবিতায় কবির দিব্য দৃষ্টি—তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। আর কবির বিজ্ঞান-দৃষ্টির পরিচয় আছে 'বসুন্ধরা' কবিতায়।

'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকখানি পত্রে কবির বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্মতার আকৃতি বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবি লিখেছেন—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য-কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"

এই পত্রেই কবি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—'এই পৃথিবীর উপর আমার যে—একটি আন্তরিক আত্মীয়বাৎসলতার ভাব আছে···সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে', তারই ফলে মাস চারেক পরে লেখা আর একখানা পত্রে কবি লিখেছেন—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্য রস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের

মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহু কালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

'ছিন্নপত্রাবলী'র এই দুই পত্রে প্রকাশিত কবির অভিমতের উপর ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution)-এর প্রভাব অবশ্যই আছে। আমরা জানি, কবি যখন পদ্মার উপর বোটে বাস করতেন তখন তাঁর কাছে কাব্যকবিতা ছাড়াও জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ থাকত। সুতরাং ডারউইনের অভিমতের সঙ্গে কবির পরিচয় থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যকে কবির সহজাত বিশ্বাত্মবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কবি যে অভিনব অনুভূতির প্রকাশ করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। কবির এই অনুভূতির কথা গদ্যে অন্যত্র এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

"এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভ মুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চির পুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ গানে বহিয়া গিয়া'ছে,··· তখনি একথা বলিয়াছি :

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

একথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই :

তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন

যুগযুগান্তর ধরি' আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।"[১৯]

বসুন্ধরার সঙ্গে কবির জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয় 'বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান' পৃথিবীর সাথে অনন্তকালেব নিগূঢ়তম একাত্মতার উপলব্ধির অপূর্ব রসভাষ্য 'বসুন্ধরা' কবিতাটি। 'ছিন্নপত্রাবলী' ও 'আত্মপরিচয়ে' কবি এই আশ্চর্য কবিতাটির সার্থক ভাষ্য রচনা করেছেন।

মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাহার একান্ত আত্মহারা ভাব, প্রকৃতির মূলে যে বিবাট রহস্য বা মিস্টেরী তাহার নিবিড়তম অনুভূতি। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জড় নহে, ইহা প্রাণময়ী। ইহাকে কবি কখনও জননী কখনও বা প্রেয়সী সম্বোধন করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলীর মতো মোটের উপর ইহাব মধ্যে তিনি অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের এক বিকাশ দেখিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের আর এক প্রকাশ। তাই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনার দোসর প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করে।"[২০]

বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ক 'বসুন্ধরা'য় মাতা-পুত্রের সম্পর্ক বলেই কল্পিত—বসুন্ধরাকে কবি এখানে জননী বলেছেন, কিন্তু 'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধ মানস প্রেয়সীর জন্য আকৃতিকেই জাগ্রত করেছে। মানস-সুন্দরীর প্রতিমা নির্মাণের জন্য কবি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্য থেকে—'ছিন্নপত্রাবলী'র পূর্বোক্ত পত্র ও তার আগের কয়েকখানি পত্রে কবির সৌন্দর্যানুভূতির উৎস সন্ধান করা যায়। আর সেই কারণেই একথা বলা যায় মানসসুন্দরী-কল্পনার মানস-ইতিহাস অংশতঃ প্রকাশিত হয়েছে 'ছিন্ন-পত্রাবলী'তে। আর এক অংশের ইতিহাস আছে কবিজীবনীর মধ্যে। কবির সেই কবিজীবনীরও সূচনা অংশ বিবৃত হয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলী'রই এক পত্রে। কবি বলেছেন,—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল (৫-৬ বৎসর) তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হয়েছিল।"

'মানসসুন্দরী'র সূচনাংশে কবির প্রেয়সী সম্বোধনই প্রমাণ করে এই দীর্ঘ পরিচয়—

> আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে
> ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থগীত— এস তুমি প্রিয়ে,
> আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
> কবিতা, কল্পনা-লতা।...

এই প্রণয়মধুর সম্বোধনের পর কবি এই কবিতায় যে পূর্ব-স্মৃতিকথা বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে কবির শৈশব জীবনের মিল 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' পাঠকের অবিদিত নয়। কিন্তু আমাদের যে ইতিহাস বিদিত নয় সেই "কৈশোরের বিরহ বাষ্পাকুল, ঘনীভূত মিলনাকুতির অধ্যায় সম্বন্ধে কবি নীরব আছেন, কেবল প্রারম্ভ স্তবকে 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র সুরের আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তির বাধা, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বঞ্চনাময় পরিণতির অশ্রুজলসিক্ত কাহিনী আভাসে ইঙ্গিতে অর্ধব্যক্ত হইয়াছে।"[২১] কবি এই কবিতাতে স্পষ্টতঃই বলেছেন—

> ভুলে যাই সব—
> কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব
> গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দসুধা
> অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
> না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে।

আমরা আগেই বলেছি রোমান্টিক কবিদের জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব 'আইডিয়াল'-এর সঙ্গে 'রিয়্যাল' বা আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব। মানসীকে মানবীর মধ্যে ব্যর্থ সন্ধানের ফলে কবিচিত্তে 'মানসী' পর্বে যে মধুর হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস জেগেছিল কবি সে কথা ভুলে যেতে চান। কারণ দীর্ঘ সন্ধানের পর অকস্মাৎ কবি বর্তমানের নিবিড় মিলনের অলৌকিক আনন্দ-সার্থকতা লাভ করেছেন। কোন এক শুভ মুহূর্তে নিজের সংগীতে চমকিত হয়ে কবি আবিষ্কার করেছেন যে শৈশবের লীলাসঙ্গিনী কৈশোরের অধরা সেই নারী কবির অন্তরলোকে মহিষীর মত পরিপূর্ণ গৌরবে ও অধিকার বোধে অধিষ্ঠিত হয়েছেন—

> চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে
> কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
> আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
> বসি আছ মহিষীর মতো।

মানসসুন্দরীর মধ্যে চিরকালের অপ্রাপনীয়াকে কবিজীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে পাওয়ার আনন্দ-রসোল্লাস কবি নিজে যেমন সুন্দর, যেমন যথার্থরূপে বর্ণনা করেছেন অপর কোন ভাষ্যকারের পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

আবার শুধু অতীত ও বর্তমানের কবিমানসের কথাই নয়, এই কবিতাতেই ভবিষ্যৎ কবিজীবনের ইতিহাসও আভাসিত হয়েছে। কবির সৌন্দর্য-কল্পনাকে 'মানসসুন্দরী' কবিতা আরও একধাপ অগ্রসর করে নিয়ে গেছে জীবনদেবতা পরিকল্পনার দিকে। 'চিত্রা' কাব্য প্রসঙ্গে আমরা সে কথার আলোচনা করব। আপাততঃ এই কাব্যের উপান্তস্থিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার সঙ্গে 'মানসসুন্দরী'র যোগের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রকাব্যে এই কবিতাটির গুরুত্বের আলোচনা করা চলে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই গুরুত্বের কথা আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন নি কিন্তু কবিতার মধ্যেই কবির মানস-ইতিহাস এত সুস্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ কৃত রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যায় এই কবিতাটির যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাতে সন্দেহ নেই।

'মানসসুন্দরী' কবিতার একস্থানে আছে –

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে ?

যাঁকে কর্ণধাররূপে লাভ করে সৌন্দর্যসমুদ্রের গভীরের দিকে কবি তাঁর কাব্য তরণীটিকে চালিত করেছেন, সেই মানসসুন্দরী কতো কতো বিগত জন্মে কবির মানসলক্ষ্মীরূপে তাঁর বাহুপাশে ধরা দিয়েছেন, তাঁকেই আবার পরজন্মে প্রাপ্তির আশা কবিকে আনন্দবিহ্বল করে তুলেছে। আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে কবি আরও দুর্গম পথে সৌন্দর্যের সন্ধানে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। 'সোনার তরী'র নাম কবিতায় কবির জীবনদেবতা—তাঁর কাব্যতরীর নেয়ে, তাঁর কাব্য ফসলকে তরীতে তুলে নিয়েছেন, কবির ঠাঁই হয় নি সেখানে ; কিন্তু 'সোনার তরী'র শেষ কবিতায় একই তরণীতে নেয়ে ও কবি যুগপৎ অবস্থান করছেন দেখা যায়। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিকে লক্ষ্য বস্তুর কাছে নিয়ে না গেলেও পরবর্তী কাব্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

'সোনার তরী'তে কবি জীবনদেবতাকে ঠিকটি চিনে নিতে পারেন নি কিন্তু পরবর্তী কাব্যসমূহে তাঁর সুস্পষ্ট উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে যিনি মানসসুন্দরী তিনিই জীবনদেবতা, বিশ্বদেবতাও তিনি। পরবর্তী কাব্যসমূহে তাঁকে আবার লীলাসঙ্গিনীরূপে উপলব্ধি করে কবি জীবনদেবতার স্বরূপ পরিচয় সমাপ্ত করেছেন। আমরা 'চিত্রা' কাব্যের জীবনদেবতা প্রসঙ্গের আলোচনাকালে কবির এই জীবনদেবতার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করব।

'সোনার তরী'র একটি দীর্ঘ কবিতা 'পুরস্কার'-এ কবির মানসসুন্দরী তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে একটু ভিন্নভাবে বন্দিত হতে দেখি। কবিতাটি 'মানসসুন্দরী'র প্রায় আট মাস পরে লেখা। 'মানসসুন্দরী'তে কবির কাব্যলক্ষ্মী ও দীর্ঘ-যুগ অন্বিষ্টা কবিমানসী একাত্ম হয়ে কবিচিত্তে বিপুল আবেগ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। 'পুরস্কারে' কবিকল্পনার এই পরম উদ্বোধন লক্ষ্য করা যায় না। এখানে মাতৃরূপিণী বাণীবন্দনার মধ্যে কবির অন্তরজীবনের বাসনা, বেদনা ও সাধনার কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু 'মানসসুন্দরী' ও 'পুরস্কার' কবিতার রচনাকালের মধ্যে যেহেতু দীর্ঘ ব্যবধান এবং সেই ব্যবধানকাল কবিতাসৃষ্টির দিক থেকে যেহেতু সার্থকতামণ্ডিত একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'সোনার তরী' কাব্যের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা এই অন্তর্বর্তীকালে। এই পর্বে প্রকৃতির প্রশান্ত পটভূমিকায় মানস-সুন্দরীর সান্নিধ্যে গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগে শান্তিময় কবিজীবন অতিবাহিত করার কথা নেই, আছে বৃহৎ মানবের আহ্বানের কথা, আছে বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নিজ জীবনে তরঙ্গ মিলিয়ে নেওয়ার আগ্রহের কথা। কবি নিজেই 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে নিখিলের জীবনতরঙ্গ 'সোনার তরী'তেই কিভাবে কবির মনে সাড়া জাগিয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। কবি লিখেছেন—

"কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত, তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।"[২২]

এই কথার বিচার করতে গিয়ে কবি ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন—

"যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটা সহজেই শান্তিময়, কেন না এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই।…

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেন না সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেন না আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটা বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই।···সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়,···এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল···তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরীর' "বিশ্বনৃত্যে"

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ-সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠেছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করেছে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে:

ওই কে বাজায়, দিবস-নিশায়
বসি অন্তর-আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,—
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে

দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।"

পক্ষকাল পরে লেখা 'ঝুলন' কবিতাতে এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ করে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করার, 'বড়ো আমি'কে চাওয়ার আবেগ তীব্রতর বেগে দেখা দিয়েছে। কবির জীবনী থেকে জানা যায় যে এই কবিতা রচনার কয়েকদিন পূর্বে পুরীতে কবি দুর্যোগময় সমুদ্রদৃশ্য নিজের চোখে দেখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার সার্থক কাব্যরূপ 'ঝুলন' (এবং 'সমুদ্রের প্রতি') কবিতায়। এই কবিতার তত্ত্বরূপের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ ব্যাখ্যা আছে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে "সাহিত্যতত্ত্ব" প্রবন্ধে (পঠিত ফেব্রুআরি ১৯৩৪)। কবি মন্তব্য করেছেন—

"বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় (দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 'ঝুলন' কবিতা থেকে) লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"

'মানুষের ধর্মে' কবি এই আনন্দকেই বলেছেন—'শিবকে জানার বেদনা'। এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। কবি নিজের সম্বন্ধে 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের যে দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতেও এই কবিতাটিরই কথা বলা হয়েছে।

'ঝুলন' কবিতার দুদিন পরে রচিত 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাতেও পুরীতে দেখা সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মূর্তিই ধরা পড়েছে। 'ঝুলন' কবিতায় কবির অন্তর্বিক্ষোভ ধরা দিয়েছে, 'সমুদ্রের প্রতি'তে আছে আদিজননী সিন্ধুর অন্তর্বিক্ষোভের কথা। এই দুটি কবিতা যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক পত্রে কবি নিজেই যেন এই দুই কবিতার যোগসূত্রটি নির্দেশ করেছেন—

'এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব

না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তর সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেই রকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে—কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিংবা মুক্ত আকাশের নীচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না।”

‘ঝুলন’ কবিতায় কবি আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্যই শুধু অনুভব করেন নি, অবিরাম তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ-সমুদ্রের মতোই আপনার অন্তর সিন্ধুতলেও এক মহাদেশ সৃজনের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, এক নতুন কাব্যজগতের তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। কবির হৃদয় অশান্ত, সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ও অশান্ত। আপনার অন্তরে বহির্জীবনের দুরন্ত আবেগকে গভীরভাবে অনুভব করে কবি আদিজননী সিন্ধুর কাছে যে প্রশ্ন রেখেছেন তার মধ্যেই কবির কাব্যের এই নতুন অধ্যায়ের আভাস আছে।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা। জানো কি, তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।
নাহি জানে কী যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।

আপনার মনোমাঝে আপনি দিশাহারা হয়ে কবি, কখনো কখনো মানস-সুন্দরীর সান্নিধ্যে কল্পনা রসসম্ভোগের মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যের রূঢ় নাগপাশ এড়িয়েছেন, কিন্তু এই বাস্তব-বিস্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে নি—কবির কাব্যে মানবাভিমুখিতার সুস্পষ্ট পদধ্বনি ‘সোনার তরী’ হতেই শোনা গিয়েছে।

'সোনার তরী' কাব্যের এই নতুন সূচনা কোন বিশেষ মানস পরিপ্রেক্ষিতে তার আভাস পাই কবিরই লেখা 'সোনার তরী'র সূচনায়। কবি 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কবিতা রচনার পটভূমিকার পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—

"মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি। নতুনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারি এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া।...কিন্তু সোনার তরী লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়।...

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নে, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্র তাপে, শ্রাবণের মুসল ধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য-সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।"

'মানসী'র সঙ্গে 'সোনার তরী'র পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্য কবির আলোচনাতে সুস্পষ্ট হয়েছে। স্থান পরিবর্তন যে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করে সে কথা 'মানসী'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শুধু স্থানের ব্যবধানই নয় এই দুই কাব্য রচনার মধ্যে কালেরও ব্যবধান আছে—প্রায় দেড় বৎসর। ইতিমধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনেরও গুরুতর কিছু পরিবর্তনের কথা 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বর্ণিত হয়েছে। বিলাত থেকে ফেরার পর মহর্ষির আদেশে কবিকে জমিদারি পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়। 'মানসী'র রোমান্টিক পরিবেশ থেকে কবিকে নেমে আসতে হয়েছে বাস্তবের সুখদুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসার জগতে। প্রকৃতির পটভূমিকায় খুব কাছ থেকে কবি দেখলেন মানুষকে। শুধু দেখা নয়—দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত কোমলতা দুর্বলতা ভরা মানুষের জীবনকথা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ছোটগল্প, 'সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি'র কবিতাবলী। 'মানসী'তে গাজিপুর পর্বে মানসিক এক রোমান্টিক পরিবেশে চলেছিল সৌন্দর্যের পূর্ণ মূর্তির সন্ধান, 'সোনার তরী'তে মানুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছেন কবি, তাই কর্মের পথ ও সাহিত্যের পথ যুগপৎ উন্মুক্ত হয়েছে কবির সমক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মানসী'র পর্বে তাঁর মনের যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন—'সোনার তরী' পর্বে "এই দ্বন্দ্ব মূলত একই মানসপ্রবণতার দুই প্রকার মেজাজের ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রকৃতি ও মানবের, আদর্শ ও বাস্তবের মূলগত অভিন্নতায়' বিশ্বাসী কবিচিত্ত সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কখনও কল্পনাকে পরিহার করিয়া মানুষের দিকে ঝুঁকিয়াছে আবার পরমুহূর্তেই অন্তর গভীরশায়ী রূপস্বপ্নের ধ্যানে আত্মনিমগ্ন হইয়াছে।"[২৩]

এই সংঘাত-সম্মিলন শেষ পর্যন্ত কবিকে টেনে নিয়ে গেছে—বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে—শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই যথার্থতঃ কবির ভাব-জগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ লাভ ঘটেছে। কিন্তু জীবনের প্রথম চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাল কাটিয়েছেন কবি। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ কবির গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল। তাই কবির স্বীকৃতি, 'পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্য রচনা করেছি। আমার কাব্যসৃষ্টির যা-কিছু ভালো মন্দ তা সে-সময়েই লেখা হয়েছে।"[২৪] কবির এই স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে একথা অনায়াসেই বলা চলে 'সোনার

তরী'তে কবিকল্পনা অনেকটা বাস্তবাশ্রয়ী হয়েছে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রজার কল্যাণের জন্ত চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছেন। সেই সংকল্পসূত্রেই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য 'সোনার তরী' পর্বেই কবি ভাবের ললিত ক্রোড় পুরোপুরি ত্যাগ করে এসে কর্মক্ষেত্রে সক্ষম স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেন নি। 'মানসী'র তুলনায় এই পর্বে কবির মানবজীবন-কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবনের সুখদুঃখ বেদনাকে তাত্ত্বিক স্বীকৃতিও তিনি জানিয়েছেন, কিন্তু মানবজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ কবির রহস্যময়ী বিশ্বসৌন্দর্য সারাত্মিকা মানসী প্রতিমার প্রতি রূপমুগ্ধতার পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হয়েছে। মানসীর রূপকল্পনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবিমনের অতৃপ্ত কামনার সঙ্গে আদর্শ সন্ধানের অনুভূতিও যুক্ত হয়েছে।

'সোনার তরী'র দু-চারটি কবিতায় কবির জীবনমুখিনতার অভ্রান্ত পরিচয় অবশ্য আছে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে যে কবির মনকে জাগিয়ে রেখেছিল তার নিদর্শন স্বরূপ 'সোনার তরী'র "অক্ষমা", "দরিদ্রা" সনেট দুটির উল্লেখ করা চলে। মানবজীবনের করুণ কোমল দিকটি কবির আবেগ কল্পনাকে কি ভাবে উদ্দীপিত করেছে তার বিস্তারিত পরিচয় আছে 'ছিন্ন-পত্রাবলীর' এক পত্রে। কবি লিখেছেন,

"আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ দুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে।" দরিদ্রা অক্ষমা বলেই কবি এই পৃথিবীকে এমন ভালবাসেন। 'স্বর্গের উপর আড়ি করে কবির এই ভালবাসা মাটির পৃথিবীর প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

"মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সঙ্কীর্ণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত।"

কবির মনে তাঁর কল্পলোকবিহারের প্রতি মাঝে মধ্যে যে বিতৃষ্ণা জেগেছে

তাতেই তিনি উচ্চ কণ্ঠে তাঁর মানব-জীবন প্রীতির কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কল্প সৌন্দর্যের জগতের উপর 'আড়ি করা' এই ভালবাসা দীর্ঘকাল কবিকে বাস্তবজীবননিষ্ঠ করে রাখতে পারে নি। ক্ষণকালীন এই বাস্তবানুগত্যের পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ বেগে রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের সন্ধানে উধাও হয়েছে।

সবশেষে, 'সোনার তরী'র একটি ব্যঙ্গ কবিতা সম্পর্কে কবির কথা শুনে নেওয়া যাক। কবিতাটির নাম 'স্বপ্নমঙ্গল' তথা 'হিং টিং ছট্'। "এই ব্যঙ্গ কবিতাটির লক্ষ্যস্থল কে তাহা লইয়া সমসাময়িক পত্রে এককালে বহু গবেষণা হইয়াছিল। তৎকালীন লেখকদের ধারণা হয়েছিল যে কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।" কিন্তু কবি স্বয়ং এই ধারণায় প্রতিবাদ করে লেখেন—

"উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হতে পারে, তা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"[২৫] আবার রবীন্দ্রজীবনীকারের ধারণা—

"একটা বেফাঁস উক্তি বা মন্তব্য করিয়া কবি পরে প্রবল পক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহা যে হয় নাই তাহা বলা যায় না।"[২৬]

উপলক্ষ যিনিই হোন ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মানসীর যুগের চেয়ে আরও বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন একথা অনস্বীকার্য। নব্য হিন্দু ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপক ব্যাখ্যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তির যে বিচার-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামীকে লক্ষ্য করে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে যে শাণিত যুক্তির ধারালো অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথকে অহিন্দু বলেই সন্দেহ হতে পারে। তবু স্বীকার্য রবীন্দ্র-কবিমানসের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর সহযোগিতা রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষণ রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার সঙ্গে চিরদিন যুক্ত ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি ও ক্রিটিকের এমন সার্থক সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

চিত্রা (১৮৯৫)

জীবনদেবতা তত্ত্ব

'চিত্রা' কাব্যের আলোচনার অবতরণিকা করা চলে জীবনদেবতা তত্ত্ব দিয়ে। রবীন্দ্র-কাব্যসমালোচকদের দ্বারা বহু আলোচিত এই বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ এটি কার্যতঃ একটি রবীন্দ্র-কূট হয়ে আছে। কবি স্বয়ং এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, সূক্ষ্মবিচারে তাঁর নিজের উক্তি পরম্পরা মধ্যেই কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকদের মধ্যে যে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি তাই দার্শনিকের চিন্তাধারার মতো তাঁর জীবনদেবতাবাদ যুক্তিভিত্তিক ও নিশ্ছিদ্র হতে পারে না। কবির কাছ থেকে দার্শনিক তত্ত্বকথা আমরা প্রত্যাশাও করি না কিন্তু জীবনদেবতা বলতে কবি নিজে কী বুঝেছেন, তা জানার প্রধান সূত্র জীবনদেবতা সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তিসমূহ সংগ্রহ করা। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রটি যেহেতু একটু সীমাবদ্ধ—জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্র অভিমতের বিবর্তন, যদি আদৌ তেমন কিছু হয়ে থাকে,—তাই আমাদের দেখতে হবে জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্র বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য—সমালোচকদের সঙ্গে তাঁর অভিমতের ঐক্য ও পার্থক্য কোথায় এবং সবশেষে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা কি—তাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। রবীন্দ্র বক্তব্য যদি আমাদের কোনও দার্শনিক তত্ত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে সে বিষয়েও আলোচনা করা হবে।

'চিত্রা' কাব্যেই জীবনদেবতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট উক্তি লক্ষ্য করা যায়—এই কাব্যান্তর্গত 'অন্তর্যামী' কবিতা রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি পত্রে ১৮৯৪ খ্রীঃ এই কবিতার অন্তরালবর্তী উপলব্ধির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। কবির বয়স তখন তেত্রিশ বৎসর। এরপর ১৩০২ সালের ৩রা চৈত্র ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে কবিকে জীবনদেবতা ভাবের ব্যাখ্যা করতে দেখা যায়। ১৩০৯ সালে মোহিতচন্দ্র সেনকে কাব্যগ্রন্থে জীবনদেবতাশ্রেণীর কবিতাবিন্যাসের উপলক্ষে ভূমিকা স্বরূপ জীবনদেবতার বিষয়ে কবি একখানি পত্র দিয়েছিলেন। তারও পর তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে মুদ্রিত এক প্রবন্ধে আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে কবি তাঁর অন্তর্লোকে জীবনদেবতার লীলার কথা

বলেছেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে কবি জীবনদেবতার কথা দিয়েই তার উপসংহার করেছেন। ১৯২১ সালে ৩রা অক্টোবর জীবন-দেবতা তত্ত্ব সম্পর্কে কবি কথিত একটি আলোচনা 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে।[২৭] এছাড়া ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতাদানকালে ও ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতারূপে প্রদত্ত ভাষণে জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির ধারণার উল্লেখ পাই। শেষবারের মতো জীবন-দেবতার ব্যাখ্যা পাই ১৯৪০ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের চতুর্থখণ্ডে 'চিত্রা'র সূচনায়। কবির বয়স তখন আশি। সুতরাং প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে নানা উপলক্ষে কবিকে জীবনদেবতা সম্পর্কে নানা কথা বলতে শোনা যায়। বলা বাহুল্য কবিতা রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালে লেখা চিঠির বক্তব্য ও ভাষার সঙ্গে The Religion of Man কিংবা 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যাতার তত্ত্ব ব্যাখ্যার বক্তব্য ও ভাষা এক হতে পারে না। রসিক কবির স্বকৃত কাব্যের রসভাষ্য তৎকালীন আত্মোপলব্ধির রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠতে বাধ্য। রবীন্দ্রপ্রতিভার মতো পরিণামমুখী কবিপ্রতিভার ক্রমবির্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদেবতা চেতনার বিবর্তনও অসম্ভব নয়। তাই যদি দেখা যায় জীবনদেবতার রূপ কবির কাছে পূর্বাপর একই নয় তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু কবির বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথাও একটা থাকা সম্ভব। সেই ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারলে জীবনদেবতার স্বরূপ সন্ধান সহজ হবে। আমরা অতঃপর সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করবো।

জীবনদেবতাশ্রেণীর কবিতার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হল 'অন্তর্যামী' কবিতাটি। এই কবিতা লেখার মাত্র কদিন পরে লেখা পূর্বোল্লিখিত পত্রে কবি যেভাবে কবিমানসে জীবনদেবতা চেতনাজাগরণের আভাস দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে চিন্তা করে লেখা ও বলা তাঁর অপরাপর উক্তিসমূহের অপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে হয়। এই পত্রখানির উপসংহারের কথাগুলো আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে—'জীবনস্মৃতি'র গ্রন্থপরিচয়ে দেখতে পাই কবি তাঁর আত্মকথার সূচনা করতে চেয়েছিলেন এই পত্রাংশ দিয়ে :

"আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে

এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠেছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।"

'অন্তর্যামী' কবিতায় কবি তাঁর যে 'জীবনের অন্তর্জীবনে'র কথা বলেছেন তার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলি যখন নিজেকে খুব বড়ো বলে কবি অনুভব করেছেন। এই বড়ো মনে করার অর্থ অহমিকা প্রকাশ করা নয় বরং তার বিপরীত। নিজের ক্ষণিক জীবনটাকে তুচ্ছ করে এই সমস্ত শুভ মুহূর্তে মানুষ চিরজীবনের রহস্যটিকেই পরিস্ফুট করতে চায়। বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করে কবি তাকেই বাইরে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবশ্য কবি জ্ঞাতসারে তা করেন নি, কতকটা অজ্ঞাতসারেই এই আইডিয়াটিকে কাব্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই আইডিয়া সম্বন্ধে কবি নিজেই অচেতন ছিলেন—কবি নিজেই জানতেন না তিনি কি বলতে চান—কেবল একটা প্রবল অনুভূতির তাড়নায়, ভাবের আবেগে কতকগুলি কথা তিনি বলে গেছেন। কাব্যের প্রকাশ আসলে কবির অসংজ্ঞান (pre-conscions) মনেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চেতন-মন (conscious mind) কবিতা রচনার কর্তা নয়। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায় কবি এই উপলব্ধির কথা কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কবিতায় কবির অন্তর্জীবনের যে প্রকাশ ঘটে অনুভবের দিক হতে কবি নিজের মধ্যে সেই অন্তর্জীবনের রহস্যকে হয়তো সহজেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু কবিপ্রকৃতির সহজ বোধ ও অনুভূতিকে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করবার জন্য কবি-সমালোচক যখন চেষ্টা করেন তখন তা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে না। সচেতন-মন অর্থাৎ চেতন-স্তর আমাদের মনোজীবনের একটি অংশ মাত্র, অচেতন স্তরের মানসিক ক্রিয়ার সবটুকুকে সজ্ঞান প্রয়াসের দ্বারা মানসপটে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়। কবির নিজের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি একথা বলাই বাহুল্য।

এইজন্যই দেখি জীবনদেবতার রহস্য যা মূলতঃ কবির কাছে ব্যক্তিগত একটি ভাবানুভূতিমাত্র তাকেই পাঠকের যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলতে গিয়ে কবিকে কত কথাই না বলতে হয়েছে।

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য লিখিত প্রবন্ধে জীবনদেবতা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ-লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।"[২৮]

কবির অন্তর্জীবনে এই অন্তর্দেবতার লীলাকে কবি নিজেই চার বছর পরে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। টমসন সাহেবের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কবি নাকি বলেছিলেন—

"The idea (of Jivandevata) has a double strand. There is the Vaishnava dualism—always Keeping the Separateness of the self,—and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual ; and God is also the ground-reality of all, as in the Vedantist Unification"[২৯]

অর্থাৎ জীবনদেবতা চেতনার মধ্যে কবি দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। কবির মতে, জীবনদেবতা ভাবে বৈষ্ণবের দ্বৈত ও উপনিষদের অদ্বৈতের প্রভাবের সংগতি সাধিত হয়েছে। জীবনদেবতার সঙ্গে কবির সম্পর্কটা রসের সম্পর্ক, লীলার সম্পর্ক, তাই তত্ত্বগতভাবে তাঁদের সম্পর্ক অদ্বয় হলেও তা 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ'। দ্বৈত ছাড়া লীলা যে অসম্ভব। সুতরাং জীবনদেবতাতত্ত্বে বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বৈষ্ণব গোস্বামিগণ এই দ্বৈতবাদের মূলে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় তত্ত্বকে যেভাবে স্বীকার করেছেন, কবির অদ্বয়তত্ত্ব ঠিক সে জাতীয় নয়। তিনি এই তত্ত্বকে খাঁটি ঔপনিষদিক উত্তরাধিকার হিসাবেই গ্রহণ করেছেন এবং সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁর লীলাবাদও ঔপনিষদিক পন্থায় গড়ে উঠে স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়েছে। তাঁর কাছেও লীলার মূল কথাটি আনন্দ, আর এই আনন্দের প্রয়োজনেই সৃষ্টি। ঈশ্বর লীলার প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর কবিদের লীলার প্রকাশ তাঁদের সৃষ্ট কাব্যজগতে। এই লীলা কবির ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত

যুগ্মসত্তার মধ্যে, 'ছিন্নপত্রে' কবি যে যুগ্মসত্তার একটিকে বলেছেন 'বাইরের আমি' অপরটিকে 'আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা' নামে অভিহিত করেছেন। পরিণত বয়সে আর এক পত্রে কবি এই 'দুই আমি'র উল্লেখ করে বলেছেন—

"আমার অন্তরলোকে কোনো একটা অগম স্থানে কেউ বাস করে—সে কোথা থেকে কথা কয়—সে কথার মূল্য আছে—কিন্তু আমিই যে সে তা ভাবতেও পারি নে—আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে আমি প্রত্যক্ষ গোচর সে নিতান্তই বাজে লোক।"[৩০]

অন্তর্লোকবাসী 'বড়ো আমি'কেই কবি জীবনদেবতা নাম দিয়ে তাঁর কবি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁর সৃষ্টিকার্যের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন আর 'বাইরের আমি'কে নিতান্ত বাজে লোক বলে ঘোষণা করলেও 'চিত্রা' কাব্যের 'সূচনা' রচনাকালে কবি স্বাধিকারের দাবি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে রেখেছেন—কবি লিখেছেন,

"ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন, সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে, আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে—যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটা প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি।"

তন্ত্র সাধকও যন্ত্রের উপমান ব্যবহার করেছেন—"তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র" কিন্তু তাঁদের মনোভাব থেকে কবির মনোভাব স্বতন্ত্র। যন্ত্রের উপমান ব্যবহার করেই কবি পরক্ষণে তাঁর ভূমিকার গৌরব দাবি করেছেন। ভগবদ্রসলীলার যুগে গীতাঞ্জলি পর্বে কবি ঈশ্বর ও মানুষের দ্বৈতলীলা বর্ণনায় মানুষের স্বাধিকারের গৌরব দাবি করে স্পষ্টতঃই বলেছেন—"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।" আর এইখানেই তত্ত্বগতভাবে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবের সঙ্গে অদ্বৈতবাদী কবির পার্থক্য। কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির

বাইরের আমি ঐ যন্ত্রের স্বকীয় বিশিষ্টতার গৌরব দাবি লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্বে পাশ্চাত্য প্রভাবের, রোমান্টিক কবিদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এই ব্যাপারে কবির স্বকীয়তাও যথেষ্ট। কবি বলেছেন বটে তাঁর নিজের যুগ্মসত্তার মধ্যে অন্তর্দেবতার প্রকাশের আনন্দ, তাঁর লীলা তিনি কিছুই বুঝেন না, কিন্তু ভারতীয় লীলাবাদী দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য রোমান্টিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে মিশিয়ে কবি যে স্বকীয় জীবনদেবতা তত্ত্বের সৃষ্টি করছেন তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁরই।

'চিত্রা'র সূচনায় কবি তাই তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে কেবলমাত্র জীবনদেবতার রসলীলার অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে পারেন নি, তাঁর যাবতীয় কাব্যসংগীত সৃষ্টিতে যন্ত্রীরূপ জীবনদেবতা যে পদে পদে যন্ত্ররূপী কবির সঙ্গে রফা করে চলেছেন সে কথাও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমদেবতার পূজায় তিনি প্রদীপ হতে পারেন, কিন্তু পরমদেবতার পূজারী জীবনদেবতা কবিকে প্রদীপশিখারূপে ব্যবহার করে তবেই দেবারতি করেছেন। এই দেবপূজায় অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে 'রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার মহামন্দির তলে' আলোক দান করেছেন কবি। অর্থাৎ পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষিত কবি তাঁর পৃথক ব্যক্তিচেতনা ত্যাগ করতে পারেন নি। কাব্য সৃষ্টিতে কবির ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত যুগ্ম-সত্তার সমপ্রাধান্য—'এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ।' এই দুই সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটলেই জীবন ব্যর্থ ; সৃষ্টি অসার্থক। কবি 'জীবনদেবতা' কবিতায় অন্তর্দেবতাকে সেইজন্যই প্রশ্ন করেছেন নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম।

এখানে কবি তাঁর অন্তর্নিহিত সৃজন শক্তিকেই জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের অভিনয় হতে চলেছে তার নায়করূপে কল্পনা করে নিজেকে নায়িকার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। কবির জীবননাট্যের নায়ক কবির মধ্যে যা গড়ে তুলেছেন সে সম্পর্কে কবি ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত কবির একটি পত্রাংশ অতিশয় মূল্যবান। উক্ত পত্রে কবি লিখেছেন—

"মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়,—একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। ...আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে-জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য।"

এখানে বিশেষ লক্ষণীয়—আপনার সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের (Creative Personality) সম্পর্কে কবি পূর্ণ সচেতন। কবির জীবন রঙ্গভূমে একটি সৃজনীশক্তি চেতনারূপে লীলা করছে কবি তা বিশ্বাস করেন—সেই সৃজনী-শক্তিও ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠছে—শ্রদ্ধেয় অজিত চক্রবর্তী এইজন্যই তাঁর 'কাব্য পরিক্রমা' গ্রন্থে কবির জীবনদেবতাকে বলেছেন 'ever-evolving personality – ক্রমশ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব।'

কবি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে আত্মকথা বলতে গিয়ে জীবনদেবতার যে চিন্তা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন তাতে দেখা যায় জীবনদেবতা শুধু কাব্যরচনা সম্বন্ধেই নয়, কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কবি লিখেছেন—

"শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা—কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।...

তিনি যেন কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন...নিজের জীবনের মধ্যে এই যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।"

এখানে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করে দুই বিভাগের

উপরেই জীবনদেবতার কর্তৃত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তি-জীবন—অর্থাৎ সমগ্র জীবনের ক্রমোন্মেষের দিক থেকে বিচার করলে কবিতা-গুলির খণ্ড তাৎপর্য অপেক্ষা একটি অখণ্ড তাৎপর্যই তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে বলে তাঁর বিশ্বাস। 'জীবনস্মৃতি'তে তাই জীবন ও কাব্যকে জড়িয়ে একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করেছেন কবি স্বয়ং। অজিত চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করেন। 'কাব্য পরিক্রমায়' জীবনদেবতা তত্ত্ব ব্যাখ্যাতেও তিনি কবির ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনকে অভিন্ন ধরে নিয়েই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য জীবনদেবতার তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় তিনি ডারুইন, ওয়ালেস মেণ্ডেল প্রভৃতি Biological Science এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চিন্তারও বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।

এইভাবে কাব্য ব্যাখ্যার প্রেরণা অজিত চক্রবর্তী সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ রাখার ফলেই পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে মীরা দেবীকে লেখা কবির এক পত্রের উল্লেখ করা চলে। কবি লিখেছেন—

"আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলি ব্যাখ্যা [করে] তাদের শোনাই—দেখি তাদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন।"[৩৩]

অজিত চক্রবর্তী এই অনেকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জীবনদেবতাকে তিনি বড়ো কবির 'সমগ্র জীবনের ভিতর হইতে সমুদ্ভূত একটি বৃহৎ আইডিয়া' বলে মনে করেছেন এবং আমরা দেখতে পাই কবি স্বয়ং এই মনোভাবই পোষণ করতেন। নিজের জীবন বিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে তাকেই তিনি আত্মজীবনীতে কোনো এক রকম করে বলবার চেষ্টা করেছেন। কবি ঐ যে বলেছেন—জীবনদেবতার আবির্ভাব 'অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে, প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে মহাকাল-নদীর ঘাটে-ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে'—কথাটি রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে অতিশয় সত্য। 'চিত্রা' কিংবা 'চিত্রা'-পূর্ববর্তী 'সোনার তরী' এবং পরবর্তী 'চৈতালি' কাব্যেই শুধু নয় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যেই প্রেরণারূপে ইনি আবির্ভূত হয়েছেন। জীবনদেবতাতত্ত্ব রবীন্দ্র কবিজীবনের কোনও একটি বিশেষ পর্বের ক্ষেত্রে সত্য নয়। এটি সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনের তত্ত্ব—এককথায় এটাই কবির জীবনতত্ত্ব। জীবনদেবতাই কবির জীবন

তরণীর কর্ণধার। তাঁর সোনার তরীর নেয়ে; 'মানসসুন্দরী', নিরুদ্দেশ যাত্রার রহস্যময়ী নারী, ইনিই কবির 'লীলাসঙ্গিনী', কবির অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কখনো নারীরূপে ('মানসী', 'পূরবী' প্রভৃতিতে এই রূপ) কখনো পুরুষরূপে (যথা, সোনার তরীর নেয়ে, চিত্রার জীবনদেবতা, সানাই-এর কর্ণধার) কবির অন্তর-আসনে বসে তাঁর সমগ্র কবি চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে তাঁর অভিলাষ পূরণে কবি অক্লান্ত সাধনা করেছেন, মাঝে মাঝে ক্লান্তি এসেছে কবির জীবনে, পরক্ষণেই আবার জীবনদেবতার উৎসাহে নবীন প্রেরণায় নব উদ্যমে কবি অগ্রসর হয়েছেন। এখানে একটা বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—রবীন্দ্র কবি প্রতিভার নব নবোন্মেষশালিনী শক্তির বিষয়ে। প্রতিভার ধর্মই হল নিত্য নূতন হওয়া। কিন্তু তা সম্ভব যতদিন কাব্যপ্রেরণা কবি ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করে।—অনেক প্রতিভাই যৌবনে প্রস্ফুটিত হয়ে পরে শুষ্ক হয়ে যায় কিংবা কোনও কোনও প্রতিভার বিকাশের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ ২৫ বৎসর মিল্টন কবিতা লিখতে পারেন নি, গ্রের মত কবি মাত্র একটি ভাল কবিতা লিখেছিলেন; ওয়ার্ডস্বার্থ-এর প্রতিভা অতি অল্পদিন আপনার ঐশ্বর্যরূপ দেখিয়ে তাঁর শেষজীবনে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভা কৈশোর থেকে পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত নিতি নিতি নূতন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনদেবতা তথা দৈবীপ্রতিভার অনুপ্রেরণা তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বকে ক্রমোদ্ভিদ্যমান করে রেখেছে। 'চিত্রা' কাব্যে তাঁর কবিত্বের ঐশ্বর্যই শুধু প্রদর্শিত হয় নি প্রায় প্রতিদিন একটি করে নতুন ছত্র নয়, একটি দুটি করে নতুন কবিতা লিখে তিনি আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছেন, কবি প্রতিভার এই বিদ্যুৎ বিকাশ অবশ্য এর পরেও আমরা কবিজীবনে লক্ষ্য করেছি।

কিন্তু জীবনদেবতা শুধুমাত্র কবির কবিব্যক্তিত্বের নিয়ামক নন। কবি বলেছেন,

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালো মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা'র নাম দিয়াছি।"

সুতরাং কাব্যসৃষ্টির সার্থকতার মধ্যেই জীবনদেবতার লীলাকে দেখলে চলবে না, ব্যর্থতার মধ্যেও তাঁরই লীলা চলছে একথাটাও উপলব্ধি করতে হবে।

আবার শুধু কাব্য রচনা সম্বন্ধেই নয়, কবির ব্যক্তিজীবনের মধ্যেও এই শক্তির ক্রিয়া চলছে একথা স্বীকার করতে হবে। কবির জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়েই ইনি জীবনটাকে গড়ে তুলেছেন, আবার শুধু ইহজীবনটিই নয়, ইনি কবির অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎকে রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথছেন। এঁরই মধ্য দিয়ে কবি বিশ্ব চরাচরের মধ্যে আপনার ঐক্য অনুভব করছেন। এককথায়, এই জীবনদেবতাই কবির 'হয়ে উঠা', প্রকাশ পাওয়া—তার becoming-এর মূলে রয়েছেন। কবি ব্যক্তিত্ব বা Aesthetic personalityর মূলেই শুধু নয়—তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূলেই রয়েছে এই শক্তির লীলা। এই লীলাবিলাস কবির জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে কোন এক নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধি করে নিতে চেয়েছে—কবি নিজে যদিচ তা সঠিক নির্ণয় করতে পারেন নি তবু তার জীবনদেবতা-বিষয়ক কবিতায় কবি তাঁর নিজের জীবন বিকাশের মধ্যে এই জীবনদেবতার আবির্ভাবকে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছেন। কবির এই অনুভূতি একান্ত সত্য, সমালোচকের বিশ্লেষণী-শক্তি দিয়ে কবি হয়তো একে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি। বোধহয় এই গভীর অনুভূতির কথা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না, অথচ কবির জীবনে এই আইডিয়ার আবির্ভাব নিতান্ত সাধারণ কথা, জানা কথা বলে উপেক্ষা করার বিষয়ও নয়। অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতা রচনা-কালে কবি যে সত্যকে অন্তরে লাভ করেছেন তা কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নয়, কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সেই অনুভূতিকে মানবীকরণের মধ্য দিয়ে কাব্যরসের সামগ্রী করে তুলেছেন। ফলে জীবনদেবতা-বিষয়ক কবিতাগুলি রসসৃষ্টির পর্যায়ে উঠতে পেরেছে। জীবনের এক বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কাব্য-প্রেরণার বশে বিশেষ একটি অনুভূতি হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে কবির চিত্তকে ঝলমল করে তুলেছে, কবিচিত্তের সেই আনন্দময় অনুভূতিকে emotion-এর plane থেকে intellect-এর plane-এ এনে কবি জীবন-দেবতাকে কতকটা তত্ত্বের আকারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, তার কারণ স্বরূপ সমালোচকের অনুমান—

'তাঁহার কবিতা সেকালের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অতিশয় নূতন, তাহাতে আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র লিরিক-কবির ভাবনা-প্রেরণা আছে; সেইজন্য তাহা যদি দুর্বোধ্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কৈফিয়তস্বরূপ ঐরূপ একটা জীবনদেবতা ও তাহার তত্ত্ব উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন'[৩২] কবি বোধ হয় অনুভব

করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই—'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়ে 'আত্ম-পরিচয়'-এর প্রথম প্রবন্ধটি আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাবাদ নিয়ে নানা অনুকূল প্রতিকূল আলোচনার সূত্রপাত হয়। ফলে কবিকে বাধ্য হয়েই জীবনদেবতা তত্ত্বের ব্যাখ্যাতারূপেও অবতীর্ণ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিরোধ এক সময় বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, এই প্রবন্ধ হতেই তার সূত্রপাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দম্ভ অহমিকার সন্ধান পেয়েছিলেন।

কবির বক্তব্যের এই রকম একটা ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে এই রকম একটা অনুমান কবি হয়তো অনেক আগেই করেছিলেন তাই জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার অনেক আগে, প্রায় বছর দশেক আগে, 'অন্তর্যামী' কবিতা রচনার সমকালে এক পত্রে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন—

"অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়, কিন্তু যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেইদিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎ ব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্ক যুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে, দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়।"[৩৩]

তাই দ্বিজেন্দ্রলালের সুস্পষ্ট অভিযোগের উত্তরে কবি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন,

"বিশ্বশক্তিকে নিজেকে জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্টা। কেন না, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এত বড়ো একটা সাধারণ কথাকে বিশেষভাবে বলিতে বসা কেন ?

ইহার উত্তর এই যে অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়।”[৩৪]

কিন্তু জীবনদেবতার হঠাৎ আবির্ভাবে কবির চিত্ত যখন চমৎকৃত তখনকার কথা কবি এখানে বলছেন না, তিনি যখন বিতর্কের উত্তরে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বসেছেন তখনই এই কথা বলেছেন। সুতরাং জীবনদেবতাবিষয়ক কাবতাসৃষ্টিকালীন অনুভূতি হতে কবি অনেক দূরে সরে এসেছেন। কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদককে লিখিত এক পত্রে কবি জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

“আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন ‘আমি’ আছে—যে বিশেষরূপে আমার জীবনের দেবতা—যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা—যে অতিজগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে, নানা সুখদুঃখ অনুকূলতা প্রতিকূলতার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ,—ঈশ্বরের বার্তা, আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার পাপকে দাহন করিয়া—আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যাহার অহরহ প্রয়াস, আমাকে গড়িয়া তুলিয়া যে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে—যাহার শক্তিতে আমি মঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর এবং আমার মঙ্গলভাবেই যাহার বলবৃদ্ধি—যে আমার বাহ্য চেতনার অন্তরালে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া গৃহিণীর ন্যায় আপন গুপ্ত ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গ্রহণ বর্জন করিতেছে তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব। তখন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে কোনো অবস্থাতেই ব্যবহিত হইয়া থাকিবেন না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলন সাধনের চেষ্টা করিতেছে—···আমার মধ্যে আমার এই

চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই আমার কবিতায় নানাসুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তখন তাহা কিছুই জানিতাম না, এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালবাসা আমি লাভ করিতেছি —জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি—তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে—তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অন্তর্জগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্যপ্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।'৩৫

কবি গদ্যমধ্যে বিস্তারিত করে যে কথা বলতে চেয়েছেন উপনিষদে সূত্রাকারে তাই বিবৃত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন—

'স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং'—তিনিই সেতুরূপে এই লোকসমূহের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। উপনিষদ আরও বলেছেন, 'তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং'।

—"যিনি একমাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাহাকে যে সকল জ্ঞানীরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। যিনি সমস্ত অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল একমাত্র নিত্য এবং তাবৎ সচেতনের একমাত্র চেতনকর্তা একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তাহাকে সকল জ্ঞানীরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাহাদেরই নিত্য শান্তি হয়।"৩৬

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে কবিকৃত জীবনদেবতা ব্যাখ্যার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, মহর্ষিকৃত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান গ্রন্থখানি কবির অতিশয় প্রিয় ছিল। মহর্ষি ঐ গ্রন্থে লিখেছেন—

"এখানে বলা হইতেছে, যাঁহারা তাহাকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দেখেন।···আত্মাতে দেখাই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা।···তিনি আমাদের শরীর

মন্দিরের পরম দেবতা।…তিনি আমাদের নিজস্ব ধন। তাঁহার সঙ্গে প্রতি-আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি শরীরের পুরস্বামী; তিনি প্রতিজনের গৃহদেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই সকলকে আমার বলিয়া বলি, ঈশ্বরও সেইরূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমার হৃদয়েশ্বর।…অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি। যখন চক্ষু উন্মীলন করিতেছি, তখন চতুর্দিকেই তাঁহাকে দেখিতেছি, যখন চক্ষু নিমীলন করি তখন অন্তরেই তাঁহার স্বপ্রকাশ মূর্তি বিরাজমান দেখি।"[৩৬]

মহর্ষি তত্ত্বগত করে যে সত্য বিবৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ কাব্যগত করে সেই আত্মগত তত্ত্বকেই 'চিত্রা' কবিতায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।

কবি নিজেও পরবর্তীকালে জীবনদেবতা কি ভগবান এই প্রশ্নের উত্তরে এক ভাষণে—জীবনদেবতার তত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করেন—

"জীবনদেবতা কবিতার মধ্যে যেখানে এই শাশ্বত সত্য ধরা পড়েছে সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কবিতা নিজের জীবনে খাটাতে পারে। আমার জীবনের realization দু প্রকারের—একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি, আরেকটি উপনিষদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।"[৩৭]

উপনিষদের এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথাই মহর্ষির ব্যাখ্যানে ধরা পড়েছে এবং সেই ব্যাখ্যানুসারে ঈশ্বরই কবি মনীষী জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে হৃদয়েশ্বররূপে প্রতিভাত হন। কবি নিজেও 'জীবনদেবতা' সম্পর্কে ১৯২১ সালের ৩রা অক্টোবরের ঐ ভাষণে জীবনদেবতাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। কবির মতে—

"জীবনদেবতা ও ঈশ্বরের মধ্যে শুধু aspect-এর পার্থক্য, attitude-এর তফাৎ। কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটি এক। এক জায়গায় ভগবান নিরপেক্ষভাবে একান্ত আমার, সেখানে কেবল তিনি ও আমি সেখানে সংসার, জগৎ কেউ নেই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুর স্থান নেই। তাঁর আর আমার সম্বন্ধটি সেখানে গভীর ও রহস্যময়। আমার সেই ব্যক্তিগত জগতে আমি একা। কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব এক জায়গায় বিশ্বে বিলীন হয়েছে। জীবনদেবতা

আমাতেও আছে এবং আমাকে অতিক্রম করেও আছে, সেখানে অখণ্ড অসীমের অনির্বচনীয় আনন্দ, সেটা আমার বিশ্বদেবতার দিক।

জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নয়। ভগবান আমার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত আছেন, আবার বিশ্বকে বাদ দিয়ে এক জায়গায় শুধু আমারই সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হয়েছেন। এই দুই মিলনের মধ্যে প্রাচীর তোলা যায় না।

...ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের দুটো দিক আছে—যেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন বহির্মুখীন, সেখানে তিনি বিশ্বদেবতা। যেখানে অন্তর্মুখীন সেখানে তিনি জীবনদেবতা।

আমি বলব, ভগবানের তিনটি aspect আছে। প্রথম, যেখানে তিনি আমার ও আমার সংসারের অতীত, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অধীশ্বর। দ্বিতীয়, যেখানে তিনি আমার ও আমার সংসারের কেন্দ্রে সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। তৃতীয়, যেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একান্ত আমার, তাঁর সঙ্গে আমার একলার বোঝাপড়া। অর্থাৎ তাঁর transcendental বা abstract, subjective এবং objective এই তিনটি স্বরূপ দেখতে পাই।"[৩৭]

কবি এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় জীবনদেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। জীবনদেবতা যে পরমসত্তা ঈশ্বরেরই আর এক বিশেষ রূপ কবির কথায় তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের যে ত্রিবিধ মূর্তির বা aspect-এর কথা কবি বলেছেন তার সত্যতাও অবশ্য স্বীকার্য। ঈশ্বর একরূপ transcendental তিনি 'অবাঙ্মনসোঽগোচর'—বাক্য মনের অগোচর। দ্বিতীয় রূপ বিশ্বদেবতার, তৃতীয় রূপ জীবনদেবতার। সুতরাং বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা স্বরূপতঃ অভিন্ন। কবি কখনও কখনও তাঁকে বিশ্বদেবতা না বলে, বলেছেন বিশ্বশক্তি—যে শক্তির ত্রিবিধ মূর্তির কথা তন্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে।[৩৮] এই বিশ্বদেবতা বা বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নয় তা সকলের মধ্যেই কাজ করছে, কবি নিজের জীবনে ঐ বিশ্বশক্তির লীলা বিশেষ অবস্থায় বিশেষভাবে উপলব্ধি করে তাঁকে জীবনদেবতা নামে অভিহিত করেছেন মাত্র। কবি বুঝেছেন এই বিশ্বদেবতাই জীবনদেবতারূপে তাঁর চিরসঙ্গী হয়ে—তাঁর অত্যন্ত অপরিণত বয়স থেকে সুপরিণত বার্ধক্যদশা পর্যন্ত তাঁর মধ্যে লীলা করে পরমাত্মার সঙ্গে কবি আত্মার নিত্যমিলনের সম্বন্ধটি বুঝাবার চেষ্টা করছেন—শুধু এক জন্মে নয়, জন্ম-জন্মান্তরের, রূপ-রূপান্তরের

মধ্য দিয়ে বিশ্বদেবতাই জীবনদেবতারূপে তাঁর চৈতন্যময় সত্তাকে চালনা করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থনে অজিতকুমার চক্রবর্তী পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব উপস্থাপিত করে তাঁর জীবনদেবতা-বিষয়ক আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্ব-চৈতন্যবাদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবি-উপলব্ধিতে জীবনদেবতার ভাব উদ্ভূত হওয়া কত স্বাভাবিক ব্যাপার। কবি নিজেও জীবনদেবতা-বিষয়ক কবিতা রচনাকালে ভাবাকৃতির চরম উন্নয়ন মুহূর্তে যে ভাষায় জীবনদেবতাকে সম্বোধন করেছিলেন তাতে কবি কথিত জীবন দেবতারই ঐ ত্রিবিধ সত্তা বা তিনটি aspect-এর বীজ সম্ভাবনার অনুমান করা যায়—পরিণত বুদ্ধির আলোকে কবি তাঁর যে তত্ত্বব্যাখ্যা করেছেন তার অঙ্কুর আছে ঐ কবিতাটিতেই—

চিরদিবসের মর্মের ব্যথা
শত জনমের চির সফলতা
আমার প্রেয়সী আমার দেবতা
আমার বিশ্বরূপী।

জীবনদেবতাই কবির কাব্যপ্রেয়সী, তাঁর জীবনের দেবতা এবং তার বিশ্বদেবতা।

আরও পরবর্তীকালে কমলা বক্তৃতাদানের সময় 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনদেবতা ভাবের ব্যাখ্যা করতে বসে জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতার সম্পর্কটি এইভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন—

"…আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজন মান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময় মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে।…যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলেছে 'মনের মানুষ'।

এই মনের মানুষ এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।"৩৯

লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল এই যে, উপরের উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতাকে পরম পুরুষ বলেছেন, বাউলের মনের মানুষের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন, বলেছেন এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথাই তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন Religion of Man গ্রন্থে।

স্বরূপতঃ যিনি নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী সত্তা, যিনি বিশ্বদেবতা তিনিই যে অন্তর্যামী দেবতারূপে কবির ব্যক্তিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'জীবনদেবতা'রূপে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছেন সেই কথাই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে ব্যক্ত হয়েছে। সীমার মাঝেই অসীমের সেই মধুর প্রকাশকে কবি উপলব্ধি করেছেন। কবির জীবনে ও কাব্যে সীমা ও অসীমের তত্ত্ব তাই এত প্রাধান্য লাভ করেছে।

কিন্তু 'চিত্রা' গ্রন্থের সূচনায় জীবনদেবতা সম্পর্কিত কবির সর্বশেষ মন্তব্যটি আমাদের প্রতিপাদ্য সত্যের আপাত বিরুদ্ধ বলে এ বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কবি বলেছেন –

"চিত্রায় জীবন রঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।"

কবির মতে, জীবনদেবতা পরমদেবতা নন তিনি পরমদেবতার পূজারী, কবির অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি ও বাইরে কাব্য রূপায়ণে এই শক্তিকে, এই কাব্যাদর্শকে সম্পূর্ণ রূপদান—কবি ব্যক্তিত্বের যুগ্মসত্তায় এই দুই আদর্শের মিলনেই তাঁর পরমদেবতার পূজা। অর্থাৎ কাব্যজীবনেই তাঁর ক্রিয়া সীমাবদ্ধ। বিশ্বের প্রতি সৌন্দর্যকণায় বিকীর্ণ হয়ে কবিচিত্তকে একদিকে যেমন বিশ্বাভিমুখী করতে সহায়তা করেছেন, অন্যদিকে কবির অন্তরলীন হয়ে কাব্যপ্রেরণার প্রত্যক্ষ হেতুরূপে ইনি কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছেন।

জীবনদেবতা ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নন 'চিত্রা' পর্বের এই কবি মনোভাব সম্পর্কে কবির পরিণত বয়সের উক্তি আপাত বিচারে আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল বলে মনে হলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এই আপাত অসঙ্গতি দূর হতে পারে। প্রকৃতির কবি হিসাবে বিশ্বদেবতাকেও কবি এই পর্বে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তারূপেই উপলব্ধি করেছেন।

'চিত্রা' পর্বে কবির মনে ঈশ্বর চিন্তার উদয় হয় নি, এই চিন্তা তাঁর মনে 'খেয়া-গীতাঞ্জলি' পর্বেই এসেছে দেখা যায়। সুতরাং 'চিত্রা'র অনুভূতিকে ঈশ্বর-ভক্তির আলোকে ব্যাখ্যা না করে কাব্যপ্রেরণা ও সৌন্দর্য চেতনার দিক থেকে ব্যাখ্যা করে কবি ঠিকই করেছেন। কালাতিক্রমণের দোষ এড়িয়ে জীবন-দেবতাকে নিসর্গানুভূতি সৌন্দর্যতৃষ্ণার মানস পটভূমিকায় রেখে কাব্যপ্রেরণা-দাত্রী শক্তিরূপে কল্পনা করে কবি কাব্যসৃষ্টিকালীন কবি মনোভাবকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই জীবনদেবতা ও ধর্মচেতনা সমর্থিত ঈশ্বরের বা বিশ্বদেবতার সঙ্গে অভিন্নরূপে পরিকল্পিত হন নি। কিন্তু কবি-আত্মা পরমাত্মা বা পরম সত্তা না হলেও কবি 'নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন' গূঢ়ভাবে বহন করছেন তার মধ্যেই কি পূর্ণের অভিসারে অপূর্ণের চলার কথাটি আভাসে বলা হয় নি? অপূর্ণ কবি-আত্মা এই যাত্রার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা লাভ করেই তো একদিন পরমাত্মায় বিলীন হবে তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য যাবে দূর হয়ে—যে পর্যন্ত সেই পার্থক্যটি রয়েছে সেই পর্যন্তই তো লীলা চলেছে জীবাত্মা ও পরমাত্মায়—জীবনদেবতা ও পরমদেবতার মধ্যে। কিন্তু জীবনদেবতা যে স্বরূপতঃ বিশ্বদেবতা থেকে ভিন্ন নন তার প্রমাণ কবির জীবনদেবতা তত্ত্ব ব্যাখ্যাতেই পাওয়া গেছে। কবি যেভাবে তাঁর অন্তর্যামী রহস্যময়ী শক্তির ক্রিয়া পরিধি বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন—তাঁর সৌন্দর্য-বোধ ও প্রেমানুভূতি থেকে কবির কবিজীবনে, কবিজীবন হতে তাঁর ব্যক্তি-সত্তায়, ব্যক্তিসত্তা থেকে তাঁর অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে কবি এই জীবনদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন এবং বর্তমান জীবনলীলা থেকে ভবিষ্যৎ জন্ম-পরম্পরাতেও এই জীবনদেবতার লীলাকে কবি যেভাবে অনুভব করেছেন তাতে জীবনদেবতার ঐশীরূপকে অস্বীকার করা যায় না। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের বিশ্বদেবতা কল্পনা আপাতদৃষ্টিতে 'চিত্রা' পর্বের জীবনদেবতা লীলা রসচক্র থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও আসলে ঐ পর্বের বিশ্বদেবতা যে 'চিত্রা' পর্বের জীবনদেবতারই ক্রমবিবর্তিত রূপ তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্মশাস্ত্রে যাঁকে ঈশ্বর বলে চিত্রা পর্বে কবি তাঁকে জীবনদেবতা বলেন নি অর্থাৎ ভগবান অর্থে বিশেষ কোন রূপ-বিশিষ্ট দেবতার কথা তিনি হয়তো বলেন নি কিন্তু কবিজীবনে জীবনদেবতার এমন ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি—'চিত্রা'র পর্বেও জীবনদেবতাকে কবি একটি বিশিষ্ট শক্তিরূপেই উপলব্ধি করেছেন সেই

শক্তি 'অবাঙ্‌মনসোঽগোচর'—তাঁর লীলা কবি আপন জীবনে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়েছেন এবং সেই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে তাঁকেই বিশেষরূপে তাঁর নিজের বলে অনুভব করে বলেছেন তিনি—

"অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ-সংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যাঁহা ভিন্ন আমার আর কিছুতেই সুখ নাই"—সেই ভূমার কথাই প্রকারান্তরে কবি স্বীকার করেছেন—ভূমৈব সুখম্। এই ভূমাই তো ঈশ্বর, ধর্মশাস্ত্রের অবয়ব বিশিষ্ট ভগবান ইনি না হতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্মোক্ত বা উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম হতে তাঁর বাধা নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা উপনিষদোক্ত পরম সত্তার নামান্তর বললে ভুল হবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন কবির নিজের কথাতেই আছে। জীবনদেবতা-বিষয়ক পূর্বোক্ত ভাষণে কবি বলেছেন—

"...বৈষ্ণব কবিতার মূল সুর ব্যক্তিগত আর উপনিষদ মূলতঃ বিশ্বজনীন। দুইটিই সাধনার বিভিন্ন মার্গ। জীবনদেবতার ideal-টা grow করেছে এবং ক্রমশ একটি আকার ধারণ করেছে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার অধিদেবতা একটি নির্দিষ্ট symbolism-এর মধ্যে পাকা হয়ে বিরাজ করছে—একটা বিশেষ ধর্মমতের মধ্যে ধরা পড়েছে। আমি জীবনদেবতাকে বারবার মূর্তি বদলে বদলে জানবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে অসংখ্য সৃষ্টির ধাপ চলেছে। আমি আজ যে জীবনদেবতাকে জেনেছি, তাকেই ভালবেসেছি। এখন আমার কাছে যারা প্রিয়জন তারাই আমার ভালোবাসার পাত্র। আমার প্রিয় বস্তুদের মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করেছি বলেই তাদের আঁকড়ে ধরছি। এই প্রীতি সম্মেলনের মধ্যে যেমন তাঁকে পেয়েছি, তেমান মৃত্যুর আঘাত বিচ্ছেদের মধ্যেও যিনি আমার জীবনকে প্রিয় ও মধুর করেছেন তাকেই ভিন্ন অনুভূতির মধ্য দিয়ে অন্যভাবে পেয়েছি।

এমনিভাবে আমি এক জায়গায় জীবনদেবতাকে অতিক্রম করে বিশ্বদেবতার চরণতলে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখানে তাঁকে আমি তাঁর আপনার মহিমাতে দেখেছি। সেখানে আমি আমার সখা বন্ধুদের পিছনে ফেলে এসেছি। সেই মিলনের আনন্দ ব্যক্তিত্বহীন।

...আমার কবিতার ঝোঁক কোন্ দিকে গেছে তা জিজ্ঞাসা করলে বলব যে তা উপনিষদের দিকেই। উপনিষদের শ্লোকগুলি যে আমার কাছে কত বড় সত্য তা বলে শেষ করা যায় না। সে কথা যেখানে আমি বলবার চেষ্টা করেছি

সেখানে 'আমি' 'তুমি'র কথা একেবারেই ওঠে না। সেখানে একমাত্র 'তুমি' সেখানে অসীমের অনির্বচনীয় অখণ্ড আনন্দ।...যেখানে আত্মা পরমাত্মায় মিলন হয় সেখানে ব্যক্তিত্বের কথা আসে না।"

কবি আপনার ব্যক্তিত্বকে এইভাবে বিলুপ্ত করে দিয়ে স্বীয় আত্মায় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার যে অনির্বচনীয় অখণ্ড আনন্দের কথা এখানে বলেছেন তাতে ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত যুগ্মসত্তার পার্থক্য বোধের স্থান কোথায়? কবি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর কবিতায় উপনিষদের দিকটাই প্রবল সুতরাং বৈষ্ণব কবিতার অধি দেবতার মতো তাঁর ঈশ্বর নির্দিষ্ট symbolism-এর মধ্যে পাকা হয়ে বিরাজ করেন নি, কিন্তু জীবনদেবতাই যে বারবার মূর্তি বদলের মধ্য দিয়ে বিশ্বদেবতায় পরিণতি লাভ করেছেন—নিজের আত্মাতেই কবি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে পুলকিত হয়েছেন সে কথা কবির উপরের ব্যাখ্যাতেই সুস্পষ্ট হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকেও তো সেই কথাই বলা হয়েছে। কবি নিজেও বার বার ঐ কথার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করে। বলেছেন—

"উপনিষদে এই 'আমি'র প্রাধান্য নেই, সেখানে সীমাকে অতিক্রম করে 'তুমি'তে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে যে আনন্দ তার কথাই বলা হয়েছে। আমার কবিতা সেই ব্যক্তিত্বহীন অখণ্ড আনন্দকে লাভ করবার প্রয়াসে ধাবিত হয়েছে।"

আর একথা আমরা আগেই বলেছি—জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির উপলব্ধি দু জাতের—এক, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক, দুই, ঔপনিষদিক তত্ত্বোপলব্ধির দিক। কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধি যে পরিমাণে তা ব্যক্তিগত, সেই পরিমাণেই তা রহস্যময় এবং রহস্যময় বলেই তা বুদ্ধির অগোচর। তখন এঁকে কবি দেখেছেন অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তিরূপে। কিন্তু যখন কবি এর স্বরূপ ঔপনিষদিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন তখন ইনি বিশ্বজনীন (Universal) হয়ে উঠে বিশ্বদেবতার রূপ নিয়েছেন। কবি তীব্র আত্মসচেতন, তাঁর মধ্যে সমালোচনী প্রতিভা উপস্থিত বলেই তিনি ঐ জীবনদেবতা তথা বিশ্বদেবতার স্বরূপ তত্ত্বাকারে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকেও তত্ত্বগত করে কবি মেটাফিজিক্যাল তত্ত্বকথারূপে তার সাধারণ একটা আধ্যাত্মিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তখন কবির মতে, 'জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবনদেবতা।' জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল সত্তার উপর

বিশেষ জোর দিয়ে কবি অনায়াসেই তাঁকে বিশ্বদেবতায় উদ্বর্তিত করে নিয়েছেন। জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির নিজস্ব উপলব্ধির কথা কবি যখন ব্যাখ্যা করে বুঝতে চেয়েছেন তখন সমালোচকের মত আমরা বুঝেছি—ইনিই "সেই দেবতা বা সত্তা বা শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার মানুষের দেহপিণ্ডের অভ্যন্তরে তাঁহারই লীলা চলিতেছে। অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বদেবতা বা শাশ্বত সত্তার রূপই জীবনদেবতা।"[৪০]

জীবনদেবতার স্বরূপ সম্পর্কে এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি সহজেই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যা না করে কবি যেখানে কবিতা সৃষ্টি-কালীন অভিপ্রায়ের মর্মভেদ করতে চেষ্টা করেছেন সেখানে জীবনদেবতা যেমন পাঠকের কাছে তেমনি কবির কাছেও রহস্যময় সত্তারূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। কবি নিজেই জীবনদেবতার সেই রহস্যময়তার কথা 'সিন্ধুপারে' নামক রূপক কবিতায় উল্লেখ করেছেন। উক্ত কবিতার ব্যাখ্যা কিন্তু অনেক-খানি প্রাঞ্জল। কবি এক পত্রে বলেছেন—

"মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্তিতেই দেখা দিয়াছিলেন—আমি মিথ্যা ভয় করিয়াছিলাম, মনে করিয়া-ছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবন লীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন, তিনি বুঝি চিরকালের মতো ছুটি লইলেন, আর একজন কোন্ অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে—কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।"[৪১]

এই কবিতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অপর এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখ দুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেলো। যে নিয়ে যায় মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাবো চিরপরিচিতের মুখশ্রী। আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।"[৪২]

আসলে জীবন ও মৃত্যু যে একই জীবন সত্যের এ-পিঠ, ও-পিঠ—সেই তত্ত্বই কবির ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট।

আর কবির জীবন-মরণ, অন্তর-বাহির জন্মজন্মান্তর পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ

করছেন যে জীবনদেবতা কবি সমস্ত ভালোবাসায়, সব সুখে সব দুঃখে সমস্ত সৌন্দর্যে, সকল সার্থকতা ও ব্যর্থতায় যাঁকে খণ্ড খণ্ডভাবে স্পর্শ করেছেন, যিনি বাইরে বিচিত্র, অন্তরে এক, যিনি কবির চির পরিচিতা হয়েও অপরিচিতাই রয়ে গেছেন, তাঁর লীলা রহস্যময়তা বুঝবে কে ?

জীবনদেবতার স্বরূপ আবিষ্কারে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচকগণ যে নানা মতের অবতারণা করেছেন তার কারণও তাই। যে আনন্দময় নৈপুণ্যের সঙ্গে কবির জীবনদেবতা কবির জীবনে তাঁর অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকশিত করে তুলেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দেখাবার শক্তি কবির নিজের যেমন নেই, তেমনি তাঁর চরিতকার বা সমালোচকদেরও নেই। সেইজন্য সমালোচকদের কেউ জীবনদেবতাকে বিশ্বদেবতা বলে মনে করেছেন,[৪৩] কেউ এঁকে কবির সৌন্দর্য-চেতনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন[৪৪], কেউ কবির প্রেমচেতনার মধ্যেই জীবন-দেবতা চেতনার মূল অনুসন্ধান করেছেন[৪৫], কেউ বা বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে এঁকে এক করে অনুভব করেছেন[৪৬], কেউ আবার প্রেরণা ও প্রকাশতত্ত্বের দিক থেকে জীবনদেবতা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন[৪৭], কেউ বা সৃজনীশক্তিবাদের সঙ্গে জীবন-দেবতাবাদের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন[৪৮], কেউ আবার দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে জীবনদেবতাবাদের যৌক্তিক সমাধান করতে চেয়েছেন[৪৯], কারও ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের আলোকে কবির সীমা অসীম তত্ত্ব তথা জীবনদেবতা তত্ত্বের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।[৫০]

জীবনদেবতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে সব উক্তি করেছেন তার কোন কোনওটির সঙ্গে সমালোচকদের কোনও কোনও বক্তব্যের মিল অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু সমালোচকদের কারও বিশিষ্ট মতবাদের আলোকেই জীবনদেবতার যথার্থ অর্থ পরিস্ফুট হয়ে উঠে নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য বরং এ বিষয়ে আমাদের যথার্থ সত্যের অনেকখানি নিকটে পৌঁছুতে সাহায্য করে। কবির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীবনদেবতার ব্যাখ্যার মধ্যে আপাততঃ কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা দিলেও কবির স্বকৃত ব্যাখ্যাই যে শেষ পর্যন্ত জীবনদেবতার স্বরূপ উপলব্ধিতে আমাদের কাছে বেশী নির্ভরযোগ্য সে কথা এই আলোচনা শেষে নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এর প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তীক্ষ্ণ সমালোচনা শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাই নিজের কবিতার অর্থ বা তত্ত্ব ব্যাখ্যায় মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও আপন কবিপ্রতিভার অন্তররহস্য উদ্ঘাটনে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন।

এই কারণেই জীবনদেবতা সম্পর্কে সর্বশেষ কথা বলার অধিকার আমাদের না থাকলেও কবিকে অনুসরণ করে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌছুতে চেষ্টা করা হল।

আমরা দেখলাম জীবনদেবতা-প্রত্যয়ের স্থান রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য জুড়েই বিস্তৃত। 'মানসী'-তে যে মানসপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন কবি—'আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের সেই প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা'ই তাঁর কবি-জীবনে ক্রমে সম্পূর্ণ হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যজীবনের পর্বে পর্বে তাঁকে নানা নামে অভিহিত করলেও সেই এক জীবনদেবতাই যে বহু বিচিত্র রূপে জগতের মাঝখানে লীলা করেছেন সে কথা কবির চেয়ে ভালো করে কে বুঝিয়েছেন? এই জীবনদেবতাই যে নানা বিরোধ ও বক্রতার ভেতর দিয়ে কবিজীবনের সব ভাঙা-গড়া, জয়-পরাজয় অতিক্রম করে আনন্দময় নৈপুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তাতে কি কবি, কি আমাদের সন্দেহমাত্র নেই। আবার শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়াই নয়, নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে কবি যেন উপলব্ধি করেছেন—জীবনদেবতা আর কেউ নন—তিনি কবির নিজেরই কবি-ব্যক্তিত্ব—তাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনার প্রেরণাস্বরূপ 'তিনি সেই পরমপুরুষ যাঁকে সত্য অনুভবের দ্বারা জানতে হবে, নিজের বাইরে, নিজের গভীরে।' বাউলের ভাষায় ইনি আমাদের 'মনের মানুষ'। কবি বুঝতে পেরেছেন 'এই মনের মানুষকে, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, 'হৃদা মনীষা'—হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে, কর্ম দিয়ে।'

"অন্তর্যামী" কবিতা রচনার কয়েকমাস আগের লেখা "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি 'সোনার তরী'র নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা ও বিশ্বাত্মীয়তাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-কবিমানসের দিক পরিবর্তনের সূচনারূপে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমালোচকদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। কবি নিজে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একাধিক পত্রে এই কবিতার উল্লেখ করেছেন। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে, সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষদের অভিভাষণে, এমনকি তাঁর এক স্নেহের পাত্রী স্নেহলতা সেনের স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় ঐই কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এই কবিতাটি যে কবির কাছেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

কবিতাটিকে কবি তাঁর কবি-মানসিকতার পথ পরিবর্তনের নিদর্শনস্তম্ভরূপে বর্ণনা করে একখানি পত্রে লিখেছেন—

"একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশ্বরী—ধরণীর আদিযুগে যেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারি কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্নলোকের উৎসব। তারপরে দ্বিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে কাছাকাছি মিলতে হোলো। তখনি এল কর্তব্যের আহ্বান।…মানুষকে মানতে হোলো, রঙীন প্রদোষের আবছায়ায় নয়, সে তার সুখ দুঃখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল বাস্তব লোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাক্কা দিয়ে বললে অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটি লিখেছিলুম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্পনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবী করলে আমার বুদ্ধিকে চিন্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বকে। তখন থেকে জীবনে আর এক পর্ব শুরু হোলো।"[৫১]

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আত্মপরিচয় আছে। তাঁর কবি ও ব্যক্তিজীবন—এই দুয়ের আদর্শই এই কবিতাটিতে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিমন বহু বিচিত্রের পিপাসায় 'জগতের মাঝে যিনি বিচিত্ররূপিণী' অন্তর মাঝে তাঁকে একাকী অনুভব করে আপনাকে কত বিচিত্রভাবেই না বাইরে প্রকাশ করেছে। চতুর্দিকের বাস্তব জগতে অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সৌন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা—নিজেকে প্রকাশ করাটাকেই সে কাব্যমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে। অবশ্য ব্যক্তিমন মানুষের বাস্তব-জীবনের দুঃখ-দুর্দশায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে তাই কবিতার প্রথমদিকে আপন কাব্যচর্চাকে—রসসাধনা বা ধ্যানকল্পনার আত্যন্তিক সুখ সম্ভোগকে কর্তব্য-পলাতক বালকের ক্রীড়াসক্তির সঙ্গে তুলনা করে কবি নিজেকে উচ্চকণ্ঠে ধিক্কৃত করেছেন—বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো,
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

বাস্তবে প্রবুদ্ধ কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন,

'ওরে তুই ওঠ, আজি।
আগুন লেগেছে কোথা?'

অতঃপর মানবদরদী কবি দরিদ্র মানবসাধারণের দুঃখদুর্দশার যে ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক কবি হয়তো কল্পনার রঙ্গভূমি ত্যাগ করে আঘাত-সংঘাত-ক্ষুব্ধ মানবজীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন, মানুষকে অন্ন বস্ত্র-বিদ্যা আরোগ্য শক্তি সাহস দিতে হবে এই সাধনায় আত্মনিবেদন করবেন। কিন্তু দেখা গেল মানুষের বাস্তবজীবনের দুঃখদুর্দশায় বিচলিত হলেও সেই দুঃখ-মুক্তির পথ কবির ভিন্ন। সেইজন্য তিনি মানুষের সাক্ষাৎ দুঃখের প্রতিকার চিন্তা না করে উচ্চ ভাবসাধনার নির্দেশ দিলেন—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,

অর্থাৎ "যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।"[৫২]

কবি একটি পত্রে[৫৩] স্বীকার করেছেন—

"আমি পাড়ায় পাড়ায় আগুন নিবিয়ে বেড়াই নে, চেষ্টা করতে গেলে পারিও নে।"

তিনি যা পারেন তা হ'ল এই—'লোকের ঘরে আগুন দেওয়া অন্যায়'—এই কথাটি ঘোষণা করা এবং জগতের সামনে স্বর্গ থেকে আনা বিশ্বাসের ছবি-খানি তুলে ধরা। আর কবির নিজের জন্য আছে সেই বিশ্বপ্রিয়া নিরুপমা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্র—কবি যাঁকে জীবন সর্বস্বধন সমর্পণ করেছেন, সেই প্রাণের ঠাকুর—পরম মানব, বাউলদের মনের মানুষের ধ্যান এই কবিতার শেষাংশে রেখেছেন 'পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের সকল তপস্যায়, সকল প্রেমিকের সকল ত্যাগে।'[৫৪] বিশ্বপ্রিয়ার এই প্রেমমূর্তিখানিই খ্রীস্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, গ্যালিলিও, লুথারের আদর্শ ছিল, এই বিশ্ববিজয়িনীর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি জীবন কণ্টক পথে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করেছেন। দীর্ঘ পথ পর্যটনের পর কবি একদিন সেই মহিমালক্ষ্মীর পদতলে উত্তীর্ণ হবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে। সেই শক্তিময়ীর চরণতলে আত্মসমর্পণ করাই কবির জীবনের প্রধান আনন্দ।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির দুটি অংশ। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই অংশের মধ্যে কোনো সংগতি দেখা যায় না, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এই দুই অংশের মধ্যে একটি নিগূঢ় ভাবগত যোগসূত্র আছে।

সত্য বটে কবিতাটির প্রথমাংশে কবিচিত্তে যে প্রবল নব ভাবনার উদয় হয়েছিল শেষাংশে তা আর নেই। অথচ এই শেষ দিকটাই কবির অতি প্রিয় ছিল—তিনি যখনই এই কবিতার উল্লেখ করেছেন তখন শেষাংশই উদ্ধার করেছেন এবং বলেছেন এই বিশ্বমানবের ধ্যান- 'এসব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়। তার গভীরতম মর্মস্থানে যে কবি আছে তারই।'[৫৫] অর্থাৎ আমরা যাঁকে বলেছি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এ রচনা তাঁরই। ব্যক্তিগতভাবে জনগণের অভাব-অভিযোগ, দ্বন্দ্ব সংগ্রামের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, আপন আত্মমুগ্ধ কল্পনাকে জনতা-জীবনের দিকে ফেরাবার জন্য কবিতালক্ষ্মীর কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে কবি সজ্ঞানে যে সাধনার কথা বলতে বসেছিলেন, তাঁর অন্তর্লোকবাসী অন্তর্যামী সেই তাঁর নিজের কথার মধ্যে কী সব নিজের কথা বলে নিলেন। ফলে জনতার পথপ্রদর্শক গুরু হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না—তা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বলেই, কাব্যের সৌন্দর্য সাধনাতেই তাঁর অন্তরপুরুষের আসল পরিচয়টি ফুটে উঠল। জীবনদেবতার কাছে কবি যে আর একটি আবেদন করেছেন—

"তোমার কাছে নানা লোক নানা বড় বড় পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনটা চাই না, আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব—আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব—এক কথায় আমি কবিতা লিখিব, আমি বিশ্বহিতের জন্য সম্পাদকী করিতে পারিব না; কবিতা লিখিয়াও তোমার কাজ করা হইবে—হিতকার্য না করিতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব।"[৫৬]

আমাদের মনে হয় এই আবেদনের মধ্যেই কবির অন্তরের আসল কথাটি বলা হয়েছে।

কবি অবশ্য 'চিত্রা' কাব্যের সূচনায় জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথাকে একই জীবনসত্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন—'জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।'

কিন্তু কঠোর জীবনসত্যের বাস্তব পরিচয় কবিকে সাময়িকভাবে উদ্দীপিত করলেও আপন কবিস্বভাবের জন্যই সে উদ্দীপনা যে কত শীঘ্র নিঃশেষ হয়ে যায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং জীবন-দেবতা সম্পর্কে কবি ঐ যে বলেছেন—

"কর্মক্ষেত্রে, যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।"

রবীন্দ্র-কবিধর্মে এটাই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়।

আমাদের এ কথার অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনবিমুখ, কর্মবিমুখ কবি ছিলেন, কবি নিজেও 'চিত্রা'র সূচনায় এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে রেখেছেন—

"লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে তাঁরা হয়তো দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।"

বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী প্রতিভা সাহিত্যের নানাদিকে বিস্তীর্ণ হয়েছে, মনুষ্যজীবন এই সাহিত্যে যথোচিত গৌরবের সঙ্গেই উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্য বস্তুতন্ত্রতাহীন, অথবা রবীন্দ্রনাথ জীবনবিমুখ, তাঁর কাব্যে criticism of life-এর অভাব আছে এমন অভিযোগ অমূলক বলেই মনে হয়। তবে সমালোচকের এই উক্তি হয়তো অসত্য নয়—"রবীন্দ্রসাহিত্যে মনুষ্যজীবনের যে নবতম মহিমা-বোধ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে,—মানুষের অতি ক্ষুদ্র সাধারণ সুখ-দুঃখের উপরে, অতি-পরিচিত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তাঁহার সর্বাশ্রয়ী রসকুতূহলী কল্পনা যে দিব্য আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে—সর্ববস্তুতে আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট সত্তার যে রসরূপ আবিষ্কার করিয়াছে" তাতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানব বা সমষ্টিবদ্ধ সমাজমানবের উপরে শাশ্বত বিশ্বমানবেরই প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছে।"[৫৭] বিশ্বমানবতাবাদের বাণী কবির কণ্ঠে আমরা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাতেই শুনেছি। সেখানে কবি সংসারের দৈন্য দুঃখ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়ে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—

'কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।'

'চিত্রা' কাব্যের কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে কবির কিছু বিস্তারিত আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার ভাবব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে পত্রে 'ছিন্নপত্রাবলী'র সেই ১৩ সংখ্যক পত্রটি অংশতঃ আমরা ইতিপূর্বেই 'সোনার তরী' আলোচনা কালে উদ্ধৃত করেছি। মর্ত্যপ্রীতি কবিকে বারবার কল্পনাস্বর্গ থেকে কিভাবে টেনে এনেছে মাটি মায়ের বুকে যেখানে 'সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত প্রেমধারা' নিত্য প্রবাহিত তার পরিচয় আমরা ঐ পত্রেই পেয়েছি। শোকহীন হৃদিহীন সুখ স্বর্গভূমি ভোগ সর্বস্ব ; কবি সেই প্রেমহীন ভোগের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে ধরাতলে নেমে এসেছেন কারণ এখানে আছে 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'। এই প্রেমের স্বর্গে আছে প্রেমিকার কাতর প্রতীক্ষা, আছে জননীর সদাউৎকণ্ঠিত মধুর ভালোবাসা। মর্ত্যবাসিনী এই আদর্শ রমণী—জায়া ও জননীর ভালোবাসার টানেই স্বর্গ হতে কবি নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত করেছেন—নেমে এসেছেন মাটি মায়ের বুকে। কবি জানেন প্রেমিকার 'প্রেমের অভিষেকে' তিনি মর্ত্যের মাটিতেই পাবেন স্বর্গীয় সুখের সন্ধান।

বস্তুতঃই 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় সুর উঠেছে মর্ত্যলোক থেকে ঊর্ধ্ব-লোকে। অবশ্য কেরানীর ধূলিমাখা ছবিতে সেই সুরের উচ্চগ্রাম সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। 'চিত্রা'র যুগে কবি-ব্যবহৃত ছন্দই বোধ হয় তার প্রধান প্রতিবন্ধক। 'পুনশ্চ' পর্বে গদ্যছন্দে আর এক কেরানীর জীবনের বাস্তবতার ছবি কবি যত সহজে যত স্বাভাবিক উপায়ে এঁকেছেন—চিত্রার পর্বে সেই সহজ সাবলীল ছন্দ যার সাহায্যে জীবনের ভাঙাচোরা দিকগুলিও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়—তা কবির আয়ত্তে আসে নি। কাজে কাজেই 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার কেরানী হরিপদ কেরানী হয়ে উঠতে পারে নি। কেরানী জীবনের ধূলিমলিন বাস্তব বর্ণনা এই কবিতার 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে ছিল—কিন্তু কবিতার উচ্চ সুরের সঙ্গে সেই বাস্তব বর্ণনা ঠিক মিল হয় না বলে কবি পরে তা বর্জন করে মূল পাঠই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে দ্যুলোক হতে ভূলোকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর চলে স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অবশ্য বুদ্ধির দীপ জেলে তাঁকে ধরা যায় না। মতামতের তর্কে মত্ত হয়ে কিংবা সমালোচনার তত্ত্ব অধিগত করে এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব—অনন্তের অন্তরশায়িনী, বিশ্বরূপিণী লক্ষ্মীকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয় শুধু চোখ দিয়ে নয়। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে দেখে নিতে হয় তবেই সৌন্দর্য উপলব্ধি সম্ভব।

'পূর্ণিমা' কবিতায় কবির এই 'সৌন্দর্যসম্ভোগে'র অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকখানি পত্রে ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা একখানি চিঠিতে (প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত) কবি স্বয়ং এই কবিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শেষোক্ত পত্রে কবি লিখেছেন—

"পূর্ণিমা কবিতাটি সত্যঘটনামূলক। একদিন বোটে বসিয়া বাতি জ্বালিয়া সন্ধ্যাবেলা ডাউডেন সাহেবের সমালোচনা পড়িতে পড়িতে রাত অনেক হইল এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল—অবশেষে বিরক্ত হইয়া বইটা ধপ্ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম অমনি চারিদিকের মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা আমার বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক—পৃথিবীর প্রান্তে একটা বোটের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মানবের এই অদ্ভুত আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এত বড় একটা সুমিষ্ট পরিহাস অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠে আসিয়া সস্নেহ আঘাত করিল ইহাতে আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীলোক পর্যন্ত কতখানি জ্যোৎস্না অথচ টেবিলের উপর একটি বাতির শিখা সমস্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্যন্ত কি পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বস্তর নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ণিমা সন্ধ্যার এই মহৎ ঘটনাটি প্রথমে একটুখানি সাজাইয়া লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মূল কথাটা মাটি হইয়াছিল—তাহার পর বই ছাপাইবার সময় যথাযথ যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিখিয়া দিলাম। এখন কেহ বুঝুন বা না বুঝুন আমার দায় কাটিয়া গেল।"

কবিতা বুঝানোর দায় কবির নয় তবু কবির এই দীর্ঘ বিবৃতি 'পূর্ণিমা' কবিতাটি বুঝবার যথেষ্ট সহায়তা করবে সেকথা বলাই বাহুল্য। এই পত্র লেখার মাস চারেক আগে 'পূর্ণিমা' কবিতা রচনার পক্ষকালের মধ্যে, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে কবি যে পত্র লিখেছিলেন (১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫) তাতে কবিতাটির আরও যথাযথ বিশ্লেষণ আরও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। আসলে এই কবিতাটিতে যে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে

তা কেবল চোখকে বা কল্পনাকেই নয় একেবারে আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে ছুঁয়ে গেছে, তাই তার ঠিক মানেটি কবি যেমন বুঝেছেন অপরে তেমন বুঝবে না—এই আশঙ্কায় সহজ ভাষায় কবি সেই অভিজ্ঞতাটি পুনর্বিবৃত করেছেন। কবিতা রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালের রচনা বলে কবির এই ব্যাখ্যা এত গভীর এবং যথার্থ হয়ে উঠেছে।

কবি বুঝেছেন সৌন্দর্যের তত্ত্বকথার মধ্যে সৌন্দর্যকে পাওয়া যায় না, সৌন্দর্যকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করতে হয়, এই জন্যই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে মূর্তিদানের উদ্দেশ্যে কবি 'পূর্ণিমা' কবিতা রচনার সপ্তাহকাল মধ্যে আর একটি কবিতায় সৌন্দর্যের বন্দনা করলেন। সমালোচকদের মতে এই 'উর্বশী' কবিতাটি 'শুধু চিত্রার নহে রবীন্দ্রকাব্যের এবং হয়ত বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।'[৫৮] আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কবিতাটিকে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা'র মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই কবিতায় 'বৈদিক উর্বশী, গ্রীক আফ্রোদীতে, সূফী বিশ্বপ্রিয়া'র প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[৫৯] কবি-সমালোচক মোহিতলাল উর্বশীতে গ্রীক দেবী Aphrodite-র সর্বাতিশায়ী প্রভাব অনুমান করে সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিক দিয়ে এই কবিতার বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে কবির স্ববিরোধী কল্পনার প্রমাণ দেখিয়েছেন।[৬০]

সৌভাগ্যক্রমে 'উর্বশী' কবিতাটি সম্পর্কে কবি স্বয়ং দুবার দুখানি পত্রে ব্যাখ্যা-মূলক আলোচনা করেছেন। প্রথম পত্রখানি 'চিত্রা' কাব্য প্রকাশের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লেখা। এই পত্রে কবি 'উর্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা করে যে মন্তব্য করেছেন তা সংক্ষিপ্ত হলেও কবিতাটির মর্মগ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রভাতকুমার ১৩০৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'দাসী' পত্রিকায় "চিত্রা"র যে সমালোচনা প্রকাশ করেন তাতে 'উর্বশী' কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্র মন্তব্যই পুনরুদ্ধৃত হয়েছে, সে মন্তব্যটি এই রকম—

"পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্প্লিমেণ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেকদিন হইতে অনেক কবি কম্প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গ্যেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewig-Weibliche তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি।... আদর্শ রমণীকে দুইভাগ করিয়া দেখিলে একভাগে The Beautiful আর একভাগে The Good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তটির স্তবগান আছে, স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় দ্বিতীয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। উর্বশী চির অধরা,

আর একটি woman পৃথিবীতে থাকেন তিনি আমাদের সেবা করেন, কাজ করেন, কল্যাণ বিধান করেন, তিনি আমাদের ভালোবাসেন, তাঁহাকে আমরা কাঁদাই, দুঃখ দিই, তিনি তাঁহার অশ্রুধারা ধৌত প্রফুল্লতার কিরণে আমাদের এই মাটির ঘরটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখেন।"

'উর্বশী' কবিতা রচনার প্রায় চার মাস পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে উর্বশীর স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,

"উর্বশী যে কী কোনো ইংরেজী তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাইনে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই এব্‌স্ট্রাক্ট্—সে তো বস্তু নয়—সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য…। এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্রাকট সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে-হেতু নারীরূপকে অবলম্বন ক'রে এই সৌন্দর্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি সে নিছক নারী, মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়,—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত মোহিনী, সেই।

মনে রাখতে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য একান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।

…সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবু তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা এব্‌স্ট্রাকট নয়।"[৬১]

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় উর্বশীকে বস্তুনিরপেক্ষ abstract ও absolute সৌন্দর্য রূপেই দেখেছিলেন। তাঁর এই ধারণা যথার্থ কিনা এ সম্পর্কে স্বয়ং কবিকে প্রশ্ন করে তিনি উপরে উদ্ধৃত উত্তর পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই জানিয়েছেন উর্বশী কে ও কী ইংরেজী তাত্ত্বিক শব্দ দ্বারা

তিনি তা নির্দেশ করবেন না, তবে এর স্বরূপ পরিচয় দিতে গিয়ে কবি এব্‌সট্রাকট্‌ সৌন্দর্য কথাটিকে অস্বীকার করলেও আলোচনার পূর্বভাগে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন নি 'এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই এব্‌স্ট্রাকট', 'এর মধ্যে কেবল এব্‌সট্রাকট সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়'—প্রভৃতি উক্তিই তার প্রমাণ। অবশ্য কবি একথাও বলেছেন—'শেলি যাকে ইনটেলেক্‌চুয়াল্‌ বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে, তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই।' অর্থাৎ উর্বশী কল্পনায় ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করলে ভুল হবে। উর্বশী কল্পনার মূলে বৈদিক উর্বশীর অনুপ্রেরণারও অনুসন্ধান করতে হবে। সুইনবার্নের Aphroditeর প্রভাব এই কবিতায় অবশ্যই আছে কিন্তু পৌরাণিক উর্বশীর ভাবময় সৌন্দর্য Beauty in the Abstractও কবির কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আবার এই সব পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাবের কথা মনে রেখেও আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে উর্বশী রবীন্দ্রনাথের মনের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের প্রতীক—তাঁর কবিমানসেরই সৃষ্টি। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রেই আছে,—

"মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্ত-ভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে এব্‌সট্রাক্‌ট্‌ভাবে কেবল-মাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি, একথা মানতে তার ভাল লাগে না।···যা আমাদের ভাবে রয়েছে এব্‌সট্রাক্‌ট্‌ স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ।··এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারীরূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী-মেনকা-তিলোত্তমায়। সেই 'বিগ্রহিণী' নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।"

'যা আমাদের ভাবে রয়েছে' অর্থাৎ কবি যে সৌন্দর্য ধ্যান করেন 'কোনখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি একথা মানতে তার ভালো লাগে না।' তাই কবির মানসসুন্দরীর ধ্যানকল্পনাই বিষয়ীকৃত হল 'উর্বশী' কবিতায়।

'উর্বশী'র অপ্রাপণীয়তা সম্বন্ধে একরকম স্থির নিশ্চয় হয়েও কবি যে তাকে আদৌ এব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ বলে স্বীকার করেন নি তার কারণ বোধ হয় এই সাধারণ ইন্দ্রিয় জগতের উর্ধ্বে একটা আধিমানসিক সৌন্দর্যলোকে—বিশুদ্ধ Aesthetic জগতে কবিরা বিশ্বাসী। বাস্তবে আমরা যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করি তাঁদের মতে ত খণ্ডিত, তা জীবনের অর্ধাংশ মাত্র, কল্পলোকে আছে বাকি অর্ধেক জীবন—

'মোর কিছু ধন আছে সংসারে বাকি অর্ধেক স্বপনে
মধুর স্বপনে।'

এই স্বপ্নজগৎ মায়াময় হলেও একেবারে মিথ্যা নয়, 'বস্তু হতে সেই মায়াতো সত্যতর', উর্বশীর অধিষ্ঠান এই সৌন্দর্যলোকে। সে কবির বিশুদ্ধ Aesthetic রসসাধনার মানসবিগ্রহ—'মানসসুন্দরী' বা 'জীবনদেবতা'র মতোই সে কবির মানসেই আছে—বাহিরভুবনে মূর্তিতে সে কখনোই ধরা দেয় নি দেবে না, তবু সেই চির অধরাকে ধরবার জন্য কবিকে দুরাশার পিছে পিছে সারাজীবন ছুটতে হয়েছে। উর্বশী ধরা দেবে না অথচ প্রলোভন দেখাতেও ছাড়বে না—সে সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ আদর্শ হয়েই থাকবে না, মানবহৃদয়ের চিরদিনের পিপাসাকেও জাগ্রত করে তুলে বিশ্বের কামনা রাজ্যের রানী হয়ে থাকবে। কবির কথায়—

"যে আদিম' রহস্যসমুদ্র হইতে দেবতারা—সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যান ভঙ্গ, কবিদের কবিত্ব উদ্রেক এবং দেবতাদের চিত্ত বিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দদান করে, এবং আমাদের বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে।"

বাসনার স্বর্গলোকবাসিনী এই সৌন্দর্যময়ী নারীকে নিয়েই রোমান্টিক কবিদের কারবার। ইনিই 'গ্যেটের কাছে Eternal Woman, শেলীর কাছে Intellectual Beauty, বিহারীলালের কাছে 'কান্তি'রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। এই চির-অধরাকে ধরার জন্য কবিদের মনে আছে রোমান্টিক আকৃতি—একে না-পাওয়ার মধ্যে যে মধুর বেদনা আছে তা রোমান্টিক কবিদের প্রধান উপজীব্য। কবিদের কবিত্ব উদ্রেক্‌কারিণী এই উর্বশী শেষ পর্যন্ত কবির কাছে জীবনদেবতা বা মানসসুন্দরীরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। অন্ততঃ কবির জীবনদেবতা পরিকল্পনার একটি অনুপ্রেরণা যে এসেছে প্রয়োজনাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশীর কাছ থেকে তাতে সন্দেহ নেই। এইজন্যই বোধ হয় আচার্য সুনীতিকুমার উর্বশীকে জীবনদেবতা পর্যায়ের কবিতাগুলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা'র আলোচনা তিনি শুরু করেছেন উর্বশী কবিতাটি দিয়ে।

'চিত্রা' কাব্যের আলোচনা আমরা শুরু করেছিলাম 'জীবনদেবতা তত্ত্বে'র আলোচনা দিয়ে। সমাপ্তিতেও জীবনদেবতার কথাতেই এসে পড়েছি। 'চিত্রা'

কাব্যপ্রসঙ্গে জীবনদেবতা তত্ত্বই যে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আপনার অন্তর্নিহিত গভীরতর সত্যের উপলব্ধিকে ভাবাবেগের স্তর থেকে নামিয়ে এনে বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার একটা চেষ্টা এই তত্ত্বব্যাখ্যায় লক্ষ্য করা যায়। আত্মভাবসচেতন কবি 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'তে "মানসসুন্দরী" বা জীবনদেবতার যে মন্ত্রারতি করেছেন এই দুই কাব্যের আলোচনায় বিশেষ করে 'চিত্রা'র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি তাই পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। এক একবার মনে হয়, সমালোচকদের মতো রবীন্দ্রনাথও যেন জীবনদেবতাতত্ত্বের অতিব্যাখ্যা করেছেন, বিশেষ করে যখন পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি'র দিকে তাকান যায় তখন দেখা যায় 'চিত্রা' কাব্য সম্পর্কে যে কোন কারণেই হোক কবি যেন একটু বেশী কথা বলেছেন। এর একাধিক কারণ অনুমান করা চলে। হয়তো সমকালীন রবীন্দ্রকাব্য পাঠক ও সমালোচকের দল এই কাব্য সম্পর্কে অধিক কৌতূহলী হয়ে কবিকে এই কাব্যের কবিতা বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরগুলি তাঁরা সযত্নে রক্ষা করে পরবর্তীকালে মুদ্রিত করেছেন তাই সেই আলোচনা সহজেই আমাদের হস্তগত হয়েছে। অন্য কারণ হয়তো এই—কবি 'চিত্রা' কাব্যখানিকে তাঁর কবিপ্রতিভার পূর্ণ পরিণতির পরিচয় বলে মনে করেছেন (পরিণতির সাক্ষ্য অবশ্যই এখানে আছে)। কবি-শক্তির পূর্ণ বিকাশ আছে যে কাব্যে, সেই কাব্যেই আছে কবিপ্রেরণার মূল উৎসের সন্ধান। সেই উৎসটিকে আবিষ্কার করতে পারলে কবিপ্রকৃতির মুখ্য পরিচয় লাভ সহজ হবে। সমালোচক হিসাবে সেই উৎসটির সন্ধান দানই কবি আপনার কর্তব্য বলে হয়তো বিবেচনা করেছিলেন। আর তা যদি করে থাকেন তাহলে সমালোচক হিসাবে স্বকাব্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটা গুরুতর কাজই করে রেখেছেন বলতে হবে।

'মানসী' কাব্যে কবি যে আদর্শ ও বাস্তব—'আইডিয়াল' ও 'রিয়্যাল'-এর দ্বন্দ্বপীড়িত হয়েছেন—'সোনার তরী'তে যে দ্বন্দ্ব কবিকে কখনো বাস্তবে টেনে এনেছে, কখনো নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিসারে বের করেছে—'চিত্রা'য় দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে বলা চলে—সৌন্দর্যের মায়ামন্ত্রেই এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 'চিত্রা'র সূচনায় কবি বুঝিয়েছেন—

"বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়।" 'চিত্রা' কাব্যের আলোচনায় কবি এই কথাটাই যেন ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করেছেন।

চৈতালি (১৮৯৬)

'চৈতালি' প্রথম প্রকাশিত হয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসংগ্রহ—'কাব্যগ্রন্থাবলী'র সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থরূপে ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে। কবি গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় 'চৈতালি'র নামকরণ সম্পর্কে লিখেছেন—

"চৈতালি-শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্রমাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।"

আপাতদৃষ্টিতে এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কবির কৈফিয়ত যথার্থ বলে মনে হবে কিন্তু সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য ধারার কথা মনে রাখলে এই নামকরণের তাৎপর্য সন্ধান সহজ হবে। রবীন্দ্রকাব্যের পরিণতিপর্বের একটি যুগ 'চৈতালি'তে শেষ হয়েছে—কাব্যগ্রন্থাবলীতে এই 'চৈতালি' শেষ ফসল রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ পর্বের শেষ উৎপন্ন শস্য বলেই এর নাম 'চৈতালি'। সুতরাং নামকরণ এখানে শুধু নির্দেশাত্মক নয়, গুণাত্মকও বটে ; কবিজীবনের পর্বান্তের ইঙ্গিতবাহী বলেই নামটি অনেক বেশী ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে।

গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি'কে তাঁর কাব্যপ্রবাহে একটু অপ্রত্যাশিত রচনা বলেছেন—আঙ্গিক ও ভাবপ্রসঙ্গ উভয় দিক থেকেই আকস্মিক। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে এসে কবি অসাধারণ এক উপমার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে আসা নানা কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হয়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পায়ে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে, খানিকটুকু সীমানা একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল—তার সঙ্গে চারিদিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলেছিল যে রূপ নিয়ে, অল্প-কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।"

কবির এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝতে হলে কবিমানসের পরিচয় ছাড়াও রবীন্দ্র-ব্যক্তিজীবনের সমকালীন তথ্যাবলীর সন্ধান নিতে হবে। 'রবীন্দ্র-

জীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চৈতালির কবিতাবলীকে দু ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন ১৮৯৬ সালে জুলাই অর্থাৎ ১৩০৩ সালের আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চৈতালির যে সব কবিতা লেখা হয় সেই সব কবিতা রচনাকালে রবীন্দ্রনাথকে নানা বৈষয়িক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুর এষ্টেট পার্টিশনের ব্যবস্থা হয় এবং এই পার্টিশন উপলক্ষে নানা সাংসারিক অশান্তিকর আলোচনা শুরু হয়। এতকাল ঠাকুরবাড়ির জমিদারি এজমালিতে দেখাশুনা হত, রবীন্দ্রনাথের উপর ছিল তদারকির ভার। সুতরাং বিষয় বিভাগের ভারও রবীন্দ্রনাথেরই উপরে এসে পড়ে।

জমিদারী পরিচালনার কাজে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রজাবৎসল জমিদার কবির সূক্ষ্ম কল্পনা নিয়ে কর্মীর দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছিলেন। কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় এই সময়কার এক পত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—

"যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি ততই কাজ জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করছি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা, কাজের মধ্য দিয়েই জিনিস চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে।"[৬২]

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় যে কি তিক্ত হতে পারে তার পরিচয় কবি পেলেন এই পত্র রচনার মাত্র বছর খানেকের ভেতরেই। জমিদারি বণ্টনের অপ্রীতিকর কাজে হাত দিয়ে যে স্বজন বিরোধ, ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে বাদবিসংবাদের গ্লানির মধ্যে কবিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে পড়তে হল তা কবির অন্তরে যে মর্মদাহ সৃষ্টি করেছে তার আঁচটুকু 'চৈতালি'র কোন কোনও কবিতায় সহজেই অনুভব করা যায়—যথা 'তৃণ', 'যাত্রী', 'স্বার্থ' ইত্যাদি। নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ করেও কবি অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পেলেন না—যে সাজাদপুরের সঙ্গে কবির মনের গভীর যোগ 'ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রে পত্রে ফুটে উঠেছে সেই সাজাদপুরও তাঁর হস্তচ্যুত হল। পদ্মাতীরের এই অতিপ্রিয় ও পরিচিত স্থানের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ বেদনা—'চৈতালি'র শেষ কয়েকটি সনেটে 'শুশ্রূষা', 'আশিস গ্রহণ', 'বিদায়' প্রভৃতিতে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তাঁর যে দুটি জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন— 'একটা মনুষ্যলোকে আর একটা ভাবলোকে'—যে ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের

অনেকগুলি পৃষ্ঠা পদ্মার উপরকার আকাশে তিনি লিখে রেখেছেন—তাঁর কবিতার সেই জীবনের সামান্য অংশই লেখা আছে—সে ভাবজীবনের যে একটানা স্রোত 'সোনার তরী'-'চিত্রা'য় প্রবাহিত হয়েছিল। কর্মজীবনের অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের বাধা সৃষ্টি করেছিল বলেই কবির অনুমান। এইজন্যই হয়তো কবি 'চৈতালি'কে রবীন্দ্র-কাব্যধারায় 'আকস্মিক', 'অপ্রত্যাশিত' বলে মনে করেছেন। রবীন্দ্র সমালোচকদের কেউ কেউ কবির এই অভিমত সমর্থন করেছেন কেউ তার বিরোধিতাও করেছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—

"সোনার তরী-চিত্রার ভাবযুক্তিগত ধারাবাহিকতা চৈতালিতে অনুপস্থিত। · সোনার তরীর প্রত্যক্ষ জীবনানন্দ, চিত্রার জীবন জিজ্ঞাসাগত মনন-সমৃদ্ধি, এবং দুইএরই ভাবগভীর চিত্র সৌন্দর্য, চৈতালির মৃদু, ক্ষীণ, স্বল্পপরিসর এবং কতকটা চিন্তালেশহীন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টি এই দুইএর মধ্যে জীবনেতিহাসের বিবর্তন খুঁজিতে গেলে ভুল করা হইবে। ·· ··সোনার তরী-চিত্রার সঙ্গে যেমন চৈতালি ক্রম-বিবর্তনের অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা নয়, তেমনই নয় পরবর্তী কল্পনা-ক্ষণিকা-কাহিনীর সঙ্গে। সোনার তরী-চিত্রার বর্ণ ও বর্ণনা-প্রাচুর্য, ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা 'চৈতালি'তে অনুপস্থিত।"[৬২]

অর্থাৎ সমালোচকের মতে 'চৈতালি' রবীন্দ্র-কাব্যমালায় একটা 'খাপছাড়া, সৃষ্ট এবং এর সৃষ্টিমূলে আছে কবির কতকটা 'চিন্তালেশহীন অর্ধ-উদাসীন দৃষ্টি'।

সত্য বটে, 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র বর্ণ ও বর্ণনা-প্রাচুর্য, ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা 'চৈতালি'তে অনুপস্থিত ; কিন্তু তাই বলে এই কাব্যটিকে রবীন্দ্র-কাব্যমালায় খাপছাড়া মনে করবার কারণ নেই। কবি প্রেরণার পক্ষে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা যেমন সত্য, তেমনি সত্য প্রশমিত আবেগের শান্ত সংযম ; বর্ণাঢ্যতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য বর্ণ বিরলতা। তাই আমাদের মনে হয় 'চৈতালি'তে রবীন্দ্রকাব্যের সুর বদল হতে পারে কিন্তু পালাবদল হয় নি—'সোনার তরী'র সঙ্গে যে এর ভিতরে ভিতরে যোগ আছে 'চৈতালি'র সনেটগুলিই তার প্রমাণ। আর 'চিত্রা'র সঙ্গে যে এর যোগ কত ঘনিষ্ঠ তা গ্রন্থসূচনায় কবির নিজের কথাতেই পরিস্ফুট—

"এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।"

'চৈতালি'র "উৎসর্গ" কবিতাটি স্পষ্টতই 'চিত্রা'র জীবনদেবতা শ্রেণীর কবিতার ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত[৬৩], শুধু ভাষাগত মিলই নয় ভাবগত মিলও এই দুই কাব্যের জীবনদেবতা গ্রুপ-এর কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'চৈতালি'র "উৎসর্গ" কবিতার কবিভাবনার মধ্যে পরিণতির সুর খুবই স্পষ্ট। 'জীবনদেবতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তার অন্তরতমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

'দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।'

'উৎসর্গ' কবিতায় দেখি কবি তাঁর কাব্যের দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে তার জীবনদেবতাকে সার্থক সাধনরূপে বরণ করে তাঁরই ভোগের উদ্দেশ্যে পরিণত ফলগুলি উৎসর্গ করছেন—

'তুমি এস নিকুঞ্জনিবাসে,
এস মোর সার্থকসাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব-সমর্পণ —
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদননিবেদন।'

'চিত্রা'য় কাব্যফলগুলিকে জীবনদেবতার ভোগ্য করে তুলতে কবিকে 'নিঠুর পীড়নে'র অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, 'চৈতালি'তে কবি বুঝেছেন সেই পরম-দয়িতের ভোগ্য করতে পারলেই তাঁর ঐ ফলগুলি সার্থক হবে। কবি আরও বুঝেছেন তাঁর কাব্যদ্রাক্ষাকুঞ্জবনে আজ রসপূর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ ফল ফলে উঠেছে, কবি স্বেচ্ছায় সানন্দে সর্ব সমর্পণের ব্রত নিয়ে ফলগুলি জীবনদেবতার চরণে সমর্পণ করতে চান। এই জীবনদেবতা কে তা নিয়ে কবির মনে আর কোনও সংশয় নেই। সুতরাং 'চৈতালি'তে 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র জীবনদেবতা ভাবের পরিণতি ঘটেছে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

পরবর্তী কাব্য 'কল্পনা-ক্ষণিকা' প্রভৃতির সঙ্গে 'চৈতালি' অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা নয় সমালোচকের এই উক্তিও মেনে নেওয়া চলে না। প্রাচীন ভারতের তথা কবি কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মিক যোগ 'চৈতালি'র কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে তা অব্যর্থভাবে আমাদের 'কল্পনা' কাব্যের

কথা মনে করিয়ে দেয়। চৈতালির ভাষায় সহজ সারল্য 'ক্ষণিকা'র ভাষারই পূর্বাভাস এমন কথা বলা অসঙ্গত হবে না।

সুতরাং কি রবীন্দ্রনাথ, কি সমালোচক কারও মতকে সমর্থন করেই 'চৈতালি'র আকস্মিকতাকে মেনে নেওয়া যায় না। বরঞ্চ মনে হয়, রবীন্দ্রকাব্য ধারায় বিবর্তনে এই কাব্যখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অবশ্য পূর্বতন কাব্যধারার পরিণতিরূপে এই কাব্য রীতি ও সুর পরিবর্তিত হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিমানসে স্পষ্টতই একটা পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছিল—বহির্জীবনের ঘটনাবলী হয়তো সেই পরিবর্তনকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যনদীর স্রোতকে মন্দীভূত স্রোতোহীন করেছে এমন কথা বলা যায় কি? যে অল্পসময়ের মধ্যে—(একমাসের কিছু সামান্য বেশী সময়ে) 'চৈতালি'র আটাত্তরটি কবিতা লেখা হয়েছে তাতে বলা যায় কবি কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে ভার্জিলের আদর্শকেও ছাড়িয়ে গেছেন—No day without a line—'nulla dies Sine linea' নয়, এই সময় দিনে একটি নয় গড়ে দুটি, কোনও কোনও দিন তিন-চারটি পর্যন্ত কবিতা কবি লিখেছেন দেখা যায়।

'সোনার তরী'-'চিত্রা'র অলঙ্কার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার পাশে 'চৈতালি'র নিরলঙ্কৃত ভাষা এই কাব্যখানির রীতি পার্থক্যের দিকে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কে রচনাবলীতে 'চৈতালি'র ভূমিকায় কবি যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। কাব্য রচনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কবি লিখেছেন—

"পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্যতীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যখেত ধু-ধু করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখেছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখেছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখেছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষ বোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে 'এটাই যথেষ্ট' তখন তার উপরে

রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই।"

চৈত্র মাসে লেখা 'চৈতালি'র অধিকাংশ কবিতা (মোট ৪৬টি) এই পতিসরের নদীবক্ষে বোটে বসে কবি রচনা করেছিলেন। 'সোনার তরী'র রচনাবলী সংস্করণের সূচনায় কবি যে কথা বলেছেন—'অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।' তা 'সোনার তরী'র সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রার কিংবা কবিমানসের অন্তঃপুরচারণের জন্য ঐ কাব্য সম্পর্কে যত সত্য হয়েছে তার চেয়ে সেই নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ব্যাকুলতার অবসানে, কাব্যপ্রেরণার উৎস আবিষ্কারে কবির সংশয় আকুলতা অপসৃত হওয়ার পর কবি মন যখন কিছুটা প্রশান্তি লাভ করেছে সেই 'চৈতালি'র যুগেই অধিকতর সম্ভাবনায় ভরে উঠেছে। সাধারণ মানুষের ততোধিক সাধারণ সুখদুঃখের জীবনযাত্রা কবি যখন চোখে দেখেছেন—হোক না সে বাতায়ন পথের দেখা—যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনসত্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আড়ম্বরহীন ঘটনাসমূহ ও অকিঞ্চিৎকর সুখদুঃখকে কবি অন্তরে লাভ করেছেন তখনই কবি সেই সব বাস্তব জীবনসত্যকে নিরলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন। 'চৈতালি'র ভাষা যে এত সহজ হয়েছে তার আরও কারণ সমালোচকের অনুমান—"সোনার তরী ও চিত্রার অলংকার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার গুণে আর অধিক টান দেওয়া বোধ করি সম্ভব ছিল না, অন্ততঃ সাময়িকভাবে।"[৬৪]

বাস্তবিকই 'মানসী' থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত যে কাব্যধারা প্রবাহিত তাতে এমন বহু কবিতা আছে যেখানে ভাবসৌন্দর্যের সঙ্গে রূপের ঐশ্বর্য অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। কাব্য সাধনার সেই সুবর্ণযুগে সমাপ্তি ঘটেছে 'চৈতালি'তে ঠিক সমাপ্তি নয়, একে বলা চলে বিরতি—কবি নিজেও 'গীতহীন' কবিতায় সে কথাই বলেছেন—'চলে গেছে মোর বীণাপাণি।' এখনকার গানে আগের সেই সুর আর শোনা যাচ্ছে না। 'চৈতালি'র সূচনাতে কবি আরও বলেছেন—

"চৈতালির অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই। কেন না তখন যে আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।"

অর্থাৎ 'চৈতালি'র কবিতাগুলিতে গীতিকবিতার রস আছে, কিন্তু Lyre

বা কাব্যবীণায় তথা কবির মস্তববীণায় লিরিকের সুর আর বাজে না। 'চিত্রা'র পর 'চৈতালি' যেন একটি পর্বশেষের অবকাশ ঘোষণা করছে। এই অবকাশ ছন্দোবিজ্ঞানের ভাষায় 'যতি'—রবীন্দ্রকাব্যের নতুন পর্ব শুরু হবার আগে 'চৈতালি' সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষণিক বিরতি মাত্র। এই বিরতিটুকু না থাকলে অবকাশ বিহারী কবিদের কাব্যসাধনা একঘেয়েমির দোষতুষ্ট হত। 'চৈতালি' ও তার পরের কাব্য 'কণিকা'তে রবীন্দ্র-কবিমানস ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় 'কথা-কাহিনী-কল্পনা'-'ক্ষণিকা'র নতুন জগতে কবি কল্পনার পাখা উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ওড়বার আগে গতিবেগ অর্জনের জন্যই হয়তো কবি 'চৈতালি' ও 'কণিকা'য় মিতভাষণে রত হয়েছেন।

'চৈতালি'র "কর্ম" কবিতাটি রচনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে ছিন্ন পত্রাবলীর একটি চিঠিতে, যে চিঠিতে কবি কর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কবি লিখেছেন -

"মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কালরাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁছ করতে গেল।"

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে "সাহিত্যতত্ত্ব" আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই ঘটনারই পুনরুল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন—

"ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা তার আবরণ উঠে গেল, মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না; অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।"

কর্মতত্ত্ব কিংবা সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যায় কবি যে 'চৈতালি'র এই 'কর্ম' কবিতাটি বার বার স্মরণ করেছেন তার কারণ স্বল্পায়তন বা সহজ সরলতা

সত্ত্বেও এই কবিতার ভাবগাঢ়তা লক্ষ্য করার মতো। আরও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই কবি এই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করেছেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে।

ছিন্নপত্রাবলীর একখানি পত্রের সঙ্গে 'পুঁটু' কবিতাটির আংশিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে কবিতাটির মধ্যে কবির স্বভাবসিদ্ধ পশুপ্রীতি তথা পশুজগতের সঙ্গে স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধের কথা আছে আর পত্রে 'পোষমানা সরল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন ক'রে প্রভুগর্ব অনুভব করার' মনুষ্য স্বভাবের নিন্দাই লক্ষণীয়।

কণিকা (১৮৯৯)

'চৈতালি'র অব্যবহিত পরবর্তী রচনা 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনও মন্তব্য আমাদের নজরে পড়ে না। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, 'কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন কালে কণিকার যে প্রবেশক কবিতা লিখিয়া দেন তাহা (উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে) কবির নিজ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায়।' কবিতাটি এই—

> 'হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।
> ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
> করিতে পারিনে সেবা।'
> শিশির কহিল কাঁদিয়া
> 'তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
> হে রবি, এমন নাহি যে আমার বল,
> তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
> কেবলি অশ্রুজল।'
> 'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
> বাসিতে পারি যে ভালো।'
> শিশিরের বুকে আসিয়া
> কহিল তপন হাসিয়া,
> 'ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি;
> তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
> হাসির মতন করি।'

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এই কাব্য-গ্রন্থটি কবির জীবদ্দশাতেই রচনাবলীর এই সংস্করণে প্রকাশিত হয়, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের (সাত খণ্ডে প্রকাশিত তেরোখানি কাব্যের দশখানির) সূচনারূপে কবি কিছু কিছু মন্তব্য লিখে দেন। কিন্তু 'কণিকা' সম্পর্কে সেইরকম কবির কোনও 'ভণিতা' পাওয়া যায় না। তার কারণ, হয়তো এই, কবি এই কাব্যের কবিতা কণিকাগুলিতে যে মিতভাষণের আশ্রয় নিয়েছেন তার সম্পর্কে নীরব থাকাটাই উচিত বলে বিবেচনা করেছেন। এই কবিতা কণিকাগুলি 'এপিগ্রাম' বা 'লিমারিক' জাতীয়।

"এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব এই যে অতি সহজ সত্যকে বলা, বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা ; যাহা সাধারণ তাহাকে অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার গভীর তত্ত্ব অতি অল্প কথায় কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা।"[৫৭]

দুই থেকে দশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে রচিত তত্ত্বউপদেশমূলক এই কবিতাগুলি ছোট হলেও কবির যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয় তা তুচ্ছ করার মতো নয়, যদিও 'লেখন' বা 'স্ফুলিঙ্গ' গ্রন্থে প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়তন কবিতাগুলির সমপর্যায়-ভুক্ত এদের বলা চলে না।

তবে আমরা আগেই বলেছি, 'চৈতালি'র পর 'কণিকা'তে কবির এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ পরবর্তী কাব্যজগতে প্রবেশের আগে কবির মানসিক প্রস্তুতি পর্বেরই ইঙ্গিতবহ। অবশ্য এইসব কবিতা রচনাকালে কবিকে জমিদারীর কাজ, পুণ্যাহযজ্ঞ, কুষ্টিয়ার ব্যবসায়, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে দীর্ঘ কবিতা রচনার অনুকূল অবসর ও কবিমানসিকতার অভাবকেও ক্ষুদ্র কবিতা রচনার অন্যতম কারণ বলে মনে করা চলে। এই সময় অন্তর্বিষয়ী গীতিকাব্য রচনার প্রেরণা কিছুটা যে স্তিমিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাই পরবর্তী 'কথা' গ্রন্থে প্রকাশিত কবির বহির্দৃষ্টি প্রবণতা লক্ষ্য করে।

কথা ও কাহিনী (১৯০০)

বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডটিই কবির জীবিত কালে প্রকাশিত সর্বশেষ খণ্ড। 'কবির ভণিতা' গ্রন্থের পাঠ পরিচয়ে বলা হয়েছে—

"পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী কথার ভূমিকাটি 'কথা ও কাহিনী'র ভূমিকা। পরে

'কথা'র ভূমিকারূপে সংশোধিত। ভূমিকাটি চৈতালির ভূমিকার অনুবৃত্তে রচিত। সেই কারণে পাণ্ডুলিপিতে আরম্ভ 'তার পরে একদিন এল‥'।"

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'চৈতালি'র ভূমিকায় ঐ কাব্যে কবির কাব্যপ্রবাহের যে স্রোতোহীনতার কথা বলা হয়েছে তার আরও একটি কারণ অনুমান করা চলে ঐ ভূমিকায় কবির মন্তব্যটি অনুধাবন করলে। কবি বলেছেন—

"তারপরে একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে।‥ এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্য ভূগোলে আর একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্য-রূপ নিল। প্রথম তার লক্ষণ দেখতে পাই পতিতায়। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল কচ ও দেবযানী, ধৃতরাষ্ট্র-যুধিষ্ঠির সংবাদ, কর্ণকুন্তী, নরকবাস সতী। সকলের শেষে চিত্রাঙ্গদা।"

কাব্য সৃষ্টির এই বন্যার বেগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় 'কণিকা' পরবর্তী 'কথা ও কাহিনী' এবং 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থগুলিতে। সেই বেগের তুলনায় 'চৈতালি'তে কাব্যের স্রোতোবেগ যে বেশ কিছুটা মন্দীভূত বলে মনে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

রবীন্দ্র-কাব্য ভূগোলে 'কথা ও কাহিনী' যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জেগে আছে কবি তাকে তাঁর কাব্য-মহাদেশ থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আত্মভাব প্রধান গীতি কবিতার মাঝখানে যে নাটকীয় বহির্দৃষ্টি প্রবণতা নিয়ে এই কাব্যখানি আবির্ভূত হয়েছে, তা রবীন্দ্র-কবিমানসের একটা পরিবর্তনেরই সূচনা করে আর সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজিতে যাকে বলে ন্যারেটিভ সেই কাহিনী জাতীয় রচনায়। 'কণিকা'র 'রবীন্দ্র-সদুক্তিকর্ণামৃতে'র পরে এই শ্রেণীর রচনায় মনোনিবেশ করার পিছনে কবির যে মনস্তত্ত্ব কাজ করছে 'কথা ও কাহিনী'র ভূমিকায় কবি সে বিষয়েও ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো একটা প্রান্তে উদ্‌বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্ দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"

'কথা ও কাহিন'র কবিতা রচনার পিছনে কবির মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাই নয়, এই কবিতাগুলি যে ঠিক ন্যারেটিভ নয় একথাটা কবি ভালো করে বুঝাতে গিয়ে এই বিস্তারিত মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"এই মন্তব্যটি কবি যখন লেখেন তখন তিনি 'ছবি-আঁকিয়ে' শিল্পী, সকল জগৎকে চিত্রশালা রূপেই দেখিতেছেন।"[৬৬]

জীবনীকার হয়তো অনুমান করেছেন ছবির কথাটা এসেছে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার বিশেষ ঝোঁকের জন্য। কিন্তু আমরা জানি প্রথম ও মধ্য বয়সে ছবি আঁকার হাত কবির খুব ভালো না খুললেও, সে বিষয়ের প্রতিও কবির ঝোঁক বরাবরই ছিল এবং 'চৈতালি' থেকেই কি আরও একটু সঠিকভাবে বলা যায় 'ছবি ও গান' থেকেই ছবি দেখার দিকে কবির একান্ত আগ্রহ ছিল। 'চৈতালি'তে যে কবিতাগুলি পাই তাতে অনুভূতির উচ্ছ্বাস কিংবা ঘটনার ঘনঘটা তেমন নেই যেমন আছে সুন্দর সুন্দর কতকগুলি ছবি, যা শেষ বয়সে দেখলে কথায় না লিখে কবি হয়তো তুলি দিয়েই আঁকতেন। সুতরাং 'কথা ও কাহিনী' রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়টি অব্যর্থভাবেই ফুটে উঠেছে উপরের মন্তব্যের মধ্যে।

অবশ্য ঐ মন্তব্যে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় আছে। কবি 'কথা ও কাহিনী'র স্বাতন্ত্র্যকে কাব্যমহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তুলনা না করে বহুমহলা রবীন্দ্রকাব্য সংসারের স্বতন্ত্র একটি মহলরূপেই বিবেচনা করেছেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ স্বরূপ সমকালীন বহির্দৃষ্টি প্রবণতা, রবীন্দ্রকাব্যে আত্মভাবনার পরিবর্তে বস্তু চিন্তার আধিক্য এবং সর্বোপরি গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের গীতিতন্ময়তার পরিবর্তে নাটকীয় কল্পনার প্রতি অধিকতর আনুগত্যের কথাই কবি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেয়েছেন। সাতমহলা

রবীন্দ্রভিটায় 'কথা ও কাহিনী'র এই মহলটির স্বাতন্ত্র্য কবির কথায় সুপরিস্ফুট হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

পরিণত বয়সে 'কথা ও কাহিনী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আর একটি মূল্যবান মন্তব্য করেন 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে—

"অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্প ধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হ'ত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এসকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টি কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে।"[৬৭]

'কথা ও কাহিনী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা "অভিসার" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য যেমন অভ্রান্ত তেমনি গভীর। মূল গ্রন্থটির মূল্য কবির এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় যেমন স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে এমন সমালোচকদের শত আলোচনাতেও সম্ভব নয়।

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থে 'কথা'র কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয় 'কাহিনী' ও 'কথা'। কবি এই দুই অংশের জন্য যে দুটি প্রবেশক কবিতা লিখে দেন তাতে 'কথা ও কাহিনী'র মর্মকথাটি খুব সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। 'কথা'য় রবীন্দ্রনাথ অতীত

ইতিহাসকেই কথা কইয়েছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে, রাজস্থানের কিংবদন্তীতে, শিখ সমাজের শৌর্যগাথায়, মহারাষ্ট্রের বিক্রম কাহিনীতে ও ভক্তমাল গ্রন্থের পুণ্য কথায় এতদিন যা সঞ্চিত ছিল সেই সব বিস্মৃতপ্রায় কীর্তিকাহিনীও যে কল্পনার স্পর্শে কি রকম কাব্য-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারে কবি তারই সম্যক পরিচয় দিয়েছেন 'কথা'র রচনাগুলিতে।

'কাহিনী'তে 'কথা'র মত অতীত ইতিহাসের শৌর্যবীর্যদৃপ্ত নাট্যসংঘাতের ইঙ্গিতবহ অসাধারণ ঘটনা বর্ণিত হয় নি, সাধারণ জীবনের কথাই সেখানে কবির উপজীব্য। আমাদের চেতনমনের আড়ালে অবচেতন মনে যে সকল স্মৃতি সঞ্চিত থাকে কাহিনীতে কবি তাদেরই পুনরুদ্ধার করেছেন। 'কাহিনী'র প্রবেশকে সেই কথাটাই বলা হয়েছে—

কত কী যে আসে কত কী যে যায়
বাহিয়া চেতনা বাহিনী,
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত —
ছিন্নসূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ বসে কাহিনী।
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা
ওগো স্মৃতি অবগাহিনী।

কথা (১৯০০)

'কথা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে 'কথা'র ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহের উৎস নির্দেশ করে কবি জানিয়েছেন—

"মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য নীতি-বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।"[৬৮]

কবির এই মন্তব্যের কারণ আছে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'কথা'র সমালোচনায়[৬৯] বলেছিলেন—

"ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে কবি কল্পনা যে সবথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে একবার কর্তব্যানুরোধে তীব্র ভাষা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন কবিতা পুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই

ঐ মন্তব্য: লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" এই মন্তব্যের উত্তরে মৈত্রেয় মহাশয় 'কথা'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে জানিয়েছেন—

"কবি বর্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন করেন নাই; সুতরাং অবান্তর বিষয়ে যাহা কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না।"

ইতিহাস অথবা সাহিত্যনীতি বিধান মতে কবি দণ্ডার্হ না হলেও নীতি সাহিত্যের বিধানে 'কথা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাও যে এককালে সমালোচকের কাছে নিন্দিত হয়েছিল তার প্রমাণ কবির নিজের কথাতেই আছে। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "তথ্য ও সত্য" প্রবন্ধে কবি 'কথা'র প্রথম কবিতা "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" সম্পর্কে লিখেছেন—

'একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, এতো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়; এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আবরু নষ্ট হল। নীতি নিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তারপরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তা সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মতো কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরোত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না; এবং তথ্যের জগতে পাগলা গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি মাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত। কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিণী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তারপরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এত বড়ো অপলাপ ঘটে ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্য জগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায় রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রস-

জগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো।"

যাঁরা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সমালোচনায় ব্যস্ত তাঁরা যে সম্যক আলোচনার অর্থ কি ভুল বুঝেন এবং তাঁদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে কবি তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কবিতাটির আলোচনা করেছেন। কবির উক্তি থেকেই তাঁর কাব্যবিচারের আদর্শ আমরা স্থির করে নিতে পারি।

তথ্য, সত্য ও কবিপ্রতিভার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিক বোধে তাও উদ্ধৃত হল। কবি লিখেছেন—

"তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে; সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভা বলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"[৭০]

'মহৎ ব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্যমাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য'—কবি প্রতিভাবলে সেই সত্যকে পাঠকের মনে উদিত করে দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচকদের নিন্দাভাজন হতে হয়। 'শেষ শিক্ষা'য় শিখগুরু গোবিন্দসিংহের নিন্দা করা হয়েছে এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুবিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নয় বলে অভিযোগ ওঠে। অথচ গুরুগোবিন্দের প্রতি কবির শ্রদ্ধার পরিচয় আরও একটি কবিতায় আছে—'গুরুগোবিন্দ'। এই কবিতাটি 'মানসী' কাব্য থেকে 'কথা'য় স্থানান্তরিত। গুরুগোবিন্দের জীবনাদর্শ 'মানসী' রচনাকালে কবির কল্পনাকে কিভাবে অভিভূত করেছিল তার পরিচয় পাই এই কবিতাটিতে। শুধু কবিতাতেই নয় নানা প্রবন্ধ নিবন্ধে কবি বলেছেন আমাদের যিনি দেশ-নায়ক হবেন তাঁকেও গুরুগোবিন্দের মতো আত্মপ্রস্তুতির জন্য অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত করতে হবে—

"শিখদের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গমস্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে।[৭১]

'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি পত্রেও কবি অনুরূপ মতামত জ্ঞাপন করেছেন—

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন—গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোক-চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্টভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূবেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছা করি—তা হলে কিছুই হবে না।"

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে যখন আবেদন-নিবেদনই রাজনীতির এক-মাত্র কৃত্য ছিল তখন সেই ক্লৈব্য পরিহার করে আত্মশক্তি বোধনের মন্ত্রে জাতিকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশনায়কের আদর্শরূপে গুরুগোবিন্দকেই মনে মনে বরণ করে নিয়েছেন কবি। সেইজন্যই অত সহজে একথা বলতে পেরেছেন—

"আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই···তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনের মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন।"[১২]

অর্থাৎ কবির কাছে গুরুগোবিন্দ ও আমাদের দেশনায়ক গুরুর আদর্শ এক এবং অভিন্ন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—এই কবিতাটিকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভসে বলেছেন। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার আরও আগে এই কবিতাটিকে অনাগত নেতাজীর জীবনকাব্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। যে কবিতা অনাগত গান্ধীজী বা অনাগত নেতাজীকে আত্মসাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছে, যে কবিতায় কবি নিজের দেশনায়কের ধ্যান আরোপ করেছেন সে কবিতা নিশ্চয়ই গুরুগোবিন্দের প্রতি কবির শ্রদ্ধার অভাব সূচিত করে না।

গুরুগোবিন্দের চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচায়ক আর একটি ঘটনা নিয়ে কবি গুরুগোবিন্দ কবিতা রচনার পরদিনই আরও একটি কবিতা লেখেন—'নিষ্ফল উপহার।' এই কবিতায় বর্ণিত আখ্যায়িকাটি কবি 'ইতিহাস' গ্রন্থের "বীরগুরু" প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। উভয় বর্ণনাতেই শিখগুরুর ধনের প্রতি উদাসীনতাই ফুটে উঠেছে। এই প্রবন্ধে কবি শিখগুরুর মৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়েছেন (খুব

সম্ভব কানিংহামের The History of the Sikhs, Chapter III থেকে তা সংগৃহীত) তাই 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় কয়েক বৎসর পরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য এই কবিতাতে বর্ণিত ঘটনা শিখগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে এক নয়, কাজেই কবিকে শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের বিরাগভাজন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই কবিতাতেও গুরুগোবিন্দের ব্যক্তিগত মহত্ত্বকেই তুলে ধরেছেন কারণ তিনি সেইটিকেই সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন। অবশ্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধে কবির মতামতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সেখানেও কবি গুরুগোবিন্দের বীরত্ব ও মহত্ত্বকে এতটুকু খর্ব করেন নি।

'কথা'র "বন্দীবীর" কবিতার মত অপূর্ব কবিতাও নাকি মুসলমানদের আত্ম-সম্মানে ঘা দিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। কবিতা রচনার প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পরে 'পূজারিণী' কবিতা সম্পর্কে মুসলমান নীতি ও ধর্মবিরোধী কথা প্রচারের অভিযোগ শোনা যায়। এই সব অভিযোগ সম্পর্কে কবির মতো ধৈর্যশীল মানুষও শেষ পর্যন্ত দু'এক কথা বলেছেন দেখা যায়। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সমালোচনার উত্তরে কবি উক্ত পত্রিকার মুসলিম লেখকের উদ্দেশ্যে বলেন—

"লেখক পাপ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে সব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না।

হোমারের ইলিয়ড বা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়—ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়।"[৭৩]

'বিচারক' কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্যনির্বাচন সমিতির নিকট কবিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। কবি এই প্রবন্ধের একস্থানে অতি দুঃখে বলেছেন—"সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি; অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?"[৭৪]

রচনার দিক থেকে 'কথা'র কালসীমার বাইরে আরও একটি কবিতা 'ব্রাহ্মণ' সম্পর্কে সমালোচকদের এই রকম সাহিত্য নীতিবহির্ভূত সমালোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়. 'ব্রাহ্মণ' কবিতা নিয়ে আধুনিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ

যোগ দিয়েছিলেন কি না সে কথা আমাদের জানা নেই তবে কবিতা সম্পর্কে অন্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃত করা চলে। 'গদ্যকাব্য' প্রবন্ধে এই কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্মান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যান মাত্র—কাব্য বিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন, কারণ এতো অনুষ্টুভ্ ত্রিষ্টুক বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয়নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হাল্কা হয়ে যেত।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন তখন তাঁর গদ্যকাব্য রচনার যুগ সবে শেষ হয়েছে, পত্রে, প্রবন্ধে তখন চলেছে গদ্যছন্দের স্বপক্ষে কবি-সমালোচকের ওকালতি। কাজে কাজেই উপনিষদে বর্ণিত জবালা সত্যকামের আখ্যায়িকার গদ্যরূপটিই কবির আলোচ্য হয়েছে। কবি নিজেও এই সময় তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতার একটি গদ্যছন্দে রূপান্তর সাধন করেন। 'ছন্দ' গ্রন্থের 'সম্পূরণ' অংশে বিধৃত গদ্যছন্দে লেখা ঐ কবিতার পাঠের সঙ্গে মূল কবিতার পাঠ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ছন্দে রচিত মূল পাঠটিই বরং চিত্তাকর্ষক। উপনিষদের মূল গল্পটি গদ্যে বর্ণিত হওয়ায় কাব্যগুণ কতটা বেড়েছে তা বলা শক্ত। আমাদের তো মনে হয় 'ব্রাহ্মণ' কবিতার কাব্যগুণ অনেক পরিমাণেই তার ছন্দোধ্বনির উপর নির্ভর করছে। কবিতার শেষদিকে ঘটনার নাটকীয় চমৎকারিত্ব কবিতাটিকে আরোও উপভোগ্য করে তুলেছে।

কিন্তু শুধুমাত্র আঙ্গিকের বিচারেই শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ হয় না, বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপরেও কবিতার রসবিচার অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। বালক সত্যকাম, মাতা জবালা ও গুরু গৌতমের সত্যনিষ্ঠাই এই কবিতার প্রাণ এবং উপনিষদে সেই প্রাণের রহস্যটুকু নিরলঙ্কৃত সহজ ও সরল ভাষায় বিবৃত হয়ে কবিকে সৌন্দর্যে মুগ্ধ করেছিল—শুধু ছন্দ নয়, কবিতার বক্তব্যটিও কবির মনে ঐ কবিতা রচনাকালে গভীর রেখাপাত করেছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু গদ্য কাব্য লেখার সময় কবি সমকালীন ভাবনা দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হওয়ায় গদ্যছন্দের দিকটিই গদ্যকাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, কবিতার প্রাণের দিকটায় তেমন গুরুত্ব দেন নি।

'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকে নেওয়া বৃন্দাবনের সনাতন গোস্বামীর মহত্ত্বঘটিত একটি কিংবদন্তী আশ্রয়ে লেখা 'স্পর্শমণি' কবিতাটি কবির 'পরশ পাথর' কবিতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। 'পরশ পাথর' রূপক কবিতা—রূপকের আড়ালে কবি হয়তো আপনার জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করেছেন। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের কামনায় খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতই কবি অর্ধেক জীবন দূর দুর্লভের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। পরশপাথরের দুর্লভ স্পর্শ জীবনের আপাত-তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সহজ অনুভবের বিষয়কে সহজ পথে না খুঁজলে খ্যাপার মতোই ব্যর্থতাকে বরণ করতে হয়। এই সত্য-জ্ঞানটুকু কবি নিজে পেয়েছেন অপরকেও এই সহজ শিক্ষাটুকুই দিতে চেয়েছেন।

'স্পর্শমণি' কবিতায় কথার আকারে কবি যে ঘটনার বর্ণনা করেছেন তাতেও একটি নীতিমূলক শিক্ষা আছে। সনাতন গোস্বামী যে অধ্যাত্ম চিন্তারূপ স্পর্শমণির সাক্ষাৎ পেয়ে পরশপাথরকে নির্লোভ নিরাসক্ত চিত্তে ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন, জীবন সেই ধন হাতে পেয়েও বৃহত্তর, মহত্তর সত্যকে লাভ করার বাসনায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সনাতনের মহৎ চরিত্রের স্পর্শমণির স্পর্শে তার কামনাকলুষিত হৃদয়ও সোনা হয়ে গেল।

'কাহিনী'র, "গানভঙ্গ" কবিতাটি সোনার তরীর যুগেরই লেখা। এই কবিতার উৎস সম্পর্কে কবি নিজেই 'ছিন্নপত্রাবলী'তে লিখেছেন—

"কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্টেনেন্ট্ গবর্ণর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই। কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়ো রকম ইমন কল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তারপর তৃতীয়বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করেছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা'

করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন—বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল—পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে।"

স্বপ্নের এই গল্পাংশটুকু নিয়ে 'গান ভঙ্গ' কবিতাটি রচিত। কবির কল্পনা-শক্তির গুণে স্বপ্নও এখানে সত্য হয়ে উঠেছে। এমন স্বপ্নলব্ধ কবিতা, গল্প, নাটক, এমনকি উপন্যাস পর্যন্ত কবির অনেক আছে।

'কথা ও কাহিনী'র আলোচনার উপসংহারের আগে কবির 'কাহিনী' নাট্যকাব্যান্তর্গত দুটি কবিতা 'পতিতা' এবং 'ভাষা ও ছন্দে'র আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থে এই কবিতা দুটি 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের শেষাংশে সংযোজিত দেখা যায়। এই কবিতা দুটি "নাট্য বলিয়া গ্রহণীয় না হইলেও কবির ইচ্ছানুসারে গ্রন্থখানির (কাহিনী) অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য" ঐ নাট্য-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং কবিতা হিসাবেও এই দুটি রচনা আলোচনা যোগ্য কারণ মূলতঃ এ-দুটি কবিতাই।

রামায়ণোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'পতিতা' কবিতাটি। ১৩০৪ সালে লেখা এই কবিতাটি ১৩০৮ সালে মজুমদার লাইব্রেরিতে কবি স্বয়ং পাঠ করে শোনান এবং কবিতা পাঠের আগে ভূমিকাস্বরূপ বলেন,

"আমি এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছি যে-রমণী পুষ্পতুল্য—তাহাকে ভোগ বা পূজায় তুল্যভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে যে কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায় তাহা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না,—ফুল বা রমণী চিরপবিত্র, চির অনাবিল,—তাহাতে ফুলের বা রমণীর কোনো ইচ্ছা মানা হয় না বলিয়া সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, এবং তাহাতে নিয়োগ কর্তারই মনের কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায় মাত্র। যে সহজ-পূজ্য তাহাকে ভোগ্যের পদবীতে যে নামাইয়া আনে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হইলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পাইলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ

করিতে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তাহার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই—তাহার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য তাহার সহজ স্বচ্ছতা ও শুচিতা হারাইয়াছে। ঋষির কুমারই পতিতার কলুষ-তামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া প্রকৃত জীবন পথের সন্ধান তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। ভক্ত যখন জাগায় তখনই তো ভগবান্ জাগ্রত হন, তাই তো আমরা বলি জাগ্রত ভগবান্। পতিতার নারীত্বের পূজারী এতদিন কেহ ছিল না, ঋষিকুমার তাহার প্রথম পূজারী হইয়া তাহাকে তাহার নারীত্বের সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দিলেন। সদ্‌গুণ সেই পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক আসিয়া তাহার উপাসনা করে। শক্তিমানের পূজা না পাইলে তো শক্তি জাগ্রত হন না।"[৭৬]

পতিতা নারীর প্রতি এই পবিত্র দৃষ্টি পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে কবির কাছ থেকে পেয়েছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও তদনুসারী সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁরা পতিতাকেও মানুষ বলে স্বীকার করেছেন এবং তাদের ভিতরকার সুপ্ত মানবিক সত্তার মহিমা আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এঁদের কাছে পতিতারাও নারী, নারীর স্বভাবধর্ম প্রতিকূল প্রতিবেশে অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতোই তাদের মন থেকে নারীধর্মের বহ্নিমূর্তি একেবারে মিলিয়ে যায় না। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে পতিতা চরিত্রও সমুন্নীত হতে পারে। যেমনটি হয়েছে 'দেবদাস' উপন্যাসে চন্দ্রমুখী চরিত্রে। মানবিক মহত্ত্বের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীর উন্নত ললাট পৌরাণিক সাবিত্রীর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি মূলতঃ একটি তত্ত্ব কবিতা। বাল্মীকির ছন্দ-লাভ কাহিনীকে আশ্রয় করে প্রকাশতত্ত্ব, এবং কাব্যসত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশই এই কবিতার দুটি মূল বক্তব্য। এই দুই বিষয়েই কবি বুদ্ধিগ্রাহ্য গদ্যের ভাষায় নানা বক্তব্য নানা সময়ে প্রকাশ করেছেন কিন্তু কবিপ্রতিভার স্পর্শে বুদ্ধির বিষয়ও যে কোন উচ্চশ্রেণীর কাব্যরূপ লাভ করতে পারে 'ভাষা ও ছন্দ' তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাল্মীকির কবিত্বলাভ কাহিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবাল্য একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল—তাঁর প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'ই তার প্রমাণ। এই আকর্ষণের কারণ বাল্মীকির ছন্দ-লাভ শুধু আদি কবি বাল্মীকির কথাই নয়—প্রত্যেক মহাকবির সুতরাং কবি রবীন্দ্রেরও কবিত্বলাভের মূল কথা। সমস্ত সৃষ্টির মূলে যে অলৌকিক

আনন্দ প্রকাশের আবেগ আছে 'ভাষা ও ছন্দে' কবি তার স্বরূপ নির্ণয় করে বলেছেন—

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্যজাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

এই অলৌকিক আনন্দ ও অসীম দুঃখ কবির নিজের জীবনেও যে কত সত্য তা ছিন্নপত্রাবলীর এক পত্রে কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নন, তা স্বীকার করতে হয়, আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারিনে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন।"

বস্তুতই কবিতা সৃষ্টির অলৌকিক আনন্দটুকু অপরকে দেওয়ার জন্য কবিকে অন্তরে এক এক সময়ে এমন আলোড়ন অনুভব করতে হয় যে তার বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাব্যসৃষ্টির কালে কবির ব্যক্তিত্বের যুগ্মসত্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বেধে যায় তার গভীরতা কবির সচেতন মনকে এমন বিক্ষুব্ধ করে তোলে, এমন আকুল করে তোলে যে তাকেও 'ছন্দোবাণবিদ্ধ' বাল্মীকির মতই 'রক্তবেগ তরঙ্গিত' বুকে অপূর্ব উদ্‌বেগভরে কাল কাটাতে হয়। কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে কবির ব্যক্তিত্বের যুগ্মসত্তার মধ্যে যখন সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, প্রকাশের অলৌকিক আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে তখনই কেবল কবির চিত্ত শান্তিলাভ করে।

সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আর একটি গভীর কথা বলা হয়েছে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার উপসংহারে—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

এখানে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সত্যের সঙ্গে কাব্যসত্যের পার্থক্য নির্দেশ করে কবিকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন কবি। এ বিষয়ে গদ্যে কবি অন্যত্র যে আলোচনা করেছেন তার সার কথাটা এই—ঐতিহাসিক বস্তুর কারবারী, তাঁর কাজ তথ্য ইংরেজিতে যাকে বলে facts

তাই নিয়ে কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য সত্য ইংরেজিতে যার নাম truth. এই তথ্য বা প্রকৃত সত্য ও সাহিত্যের সত্যে অনেক তফাত—সাধারণ সত্য হলো এক সার্থক সত্য হলো আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই করা। ইতিহাসকার বাস্তবজগতে যা কিছু ঘটে তারই কথা বলেন—অনুলিপি রচনাই তাঁর কাজ কিন্তু সাহিত্যকার 'সৃষ্টি' করেন—তাই সাহিত্যে বাস্তবজগতের তথ্য থাকলেও তা রূপান্তরিত হয়ে যায়। কবির কল্পনা বাস্তবের তথ্যগত সত্যকে কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত করে তাকে সাহিত্যের নিত্যসত্যের পর্যায়ভুক্ত করে দেয়। তথ্যের দাসত্ব হ'তে সত্যের জগতে মনকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র কবিরই আছে—তাই কবিকেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলেছেন তিনি।—

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

রামের জন্মভূমি অযোধ্যা সত্য হলেও কবির চিত্তভূমি মিথ্যা নয়—বরং তা সত্যতর Aritotle-এর কথায়, 'not real but a higher reality'. 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় কবি নারদের মুখ দিয়ে বাল্মীকির প্রতি যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়েছেন—সাহিত্যসৃষ্টিতে সেই স্বাধীন কল্পনা প্রয়োগের অধিকার সমস্ত কবিরই আছে এবং থাকা উচিত। কবিকে উপলক্ষ করে স্বয়ং ব্রহ্মা বলে পাঠিয়েছেন—কাব্যে আদি কবিরা যে কথা বলেন তা মিথ্যা হতে পারে না, Tennyson-এর ভাষায়—'Poetry is truer than facts.' সুতরাং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে কবি 'কথা ও কাহিনী'তে, 'কাহিনী' নাট্যকাব্য বা অন্যত্র যে সব কবিতা কাব্যনাট্য প্রভৃতি রচনা করেছেন, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, ইতিহাসে বর্ণিত উপাখ্যানের সঙ্গে তাদের হুবহু মিল না থাকলেও তারা মিথ্যা হবে না—সেই সত্য যা কবি রচনা করবেন। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন আর 'কথা ও কাহিনী' বা 'কাহিনী' কাব্যনাট্যও ইতিহাস নয়—সুতরাং কবির কাছে থেকে পাঠক যেন ইতিহাসের তথ্য উদ্ধারে আগ্রহী না হন—'ভাষা ও ছন্দে' কবি সেই কথাটিই আগে ভাগে জানিয়ে রেখেছেন।

কল্পনা (১৯০০)

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই এই কাব্য সম্পর্কে কবির অভিমত খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সব কাব্যই সার্থকনামা।

'কল্পনা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কল্পনাকে সঙ্গিনী করে 'স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকে মানসভ্রমণে বের হয়েছেন। 'চৈতালি'তেই 'প্রাচীন ভারত' ও 'কালিদাসের প্রতি' কবির প্রীতি ধরা পড়েছিল কিন্তু 'কল্পনা'তে সেই আকর্ষণ তীব্রতর হয়েছে। 'চৈতালি'র পর এই কাব্যখানি আকস্মিক নয় কিন্তু 'চৈতালি'র জগৎ আর 'কল্পনা'র জগৎ এক নয়। 'চৈতালি'র জগৎ লৌকিক জগৎ, বাস্তব জগৎ কবির প্রত্যক্ষ পরিচিত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রাজ্য কিন্তু 'কল্পনা'র জগৎ অলৌকিক রসের জগৎ, আদর্শের জগৎ—সেই জগৎ আজকের ভারত থেকে নিঃশেষে অপসৃত, সুতরাং ঐ জগৎ নির্মাণে কবিকে প্রাচীন কবির অভিজ্ঞতার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতে স্বপ্নপ্রয়াণের হেতু স্বরূপ 'চৈতালি' রচনাকালে তাঁর ব্যক্তিগতজীবনের পারিবারিক দ্বন্দ্ব—'লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ'-এর প্রতি বিরূপতা, সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, প্রাচীন ভারতের আদর্শরূপের প্রতি মানসিক আগ্রহ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। বাস্তব জগতের মুখোমুখি হয়ে কবি যে রূঢ়তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন—জমিদারী-বণ্টনের কাজে যে আঘাত লাভ করেছিলেন তাই কবির মনকে বাস্তবের উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছে। দেশের অবস্থা—তদানীন্তন পলিটিক্সের ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিও কবির মন বিরূপ—ভাবলোকে তিনি 'ভারতলক্ষ্মী', 'বঙ্গজননী'র যে রূপটি অঙ্কিত করেছিলেন সেই 'ভুবনমনোমোহিনী মূর্তি' বা 'মধুর মূর্তি' বাস্তবে খুঁজে পেলেন না বরং কবি দেখলেন দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; দীনাহীনা কাতরা মাতার আহ্বান কবিকেও কাতর করে তুলল; ফলে দেশের মহত্তর পরিচয় লাভের জন্য প্রাচীন ভারতের আদর্শলোকের দিকেই কবিমন উধাও হল।[৭৭]

কিন্তু কল্পস্বর্গলোকে প্রয়াণ করে বাস্তব জগতের রূঢ়তার হাত থেকে কবি নিষ্কৃতি পেলেন না—কল্পনা ও সত্য, আদর্শ ও বাস্তব, অতীত ও বর্তমান এর দ্বন্দ্ব কবিচিত্তকে আলোড়িত করে তুলল। কবি অবশ্য এই দ্বন্দ্বকে পরবর্তী-কালে 'বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন। 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবির ধর্মটি কি, তার ঝোঁক শান্তির দিকে না, শক্তির দিকে এই কথাটাকে বিচার করে দেখার জন্য কবি কল্পনার 'অশেষ' কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে বলেছেন—

"এর ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার) পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে

মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।...এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।"[৭৮]

'কল্পনা' কাব্যে কল্পনাকে সঙ্গিনী করে কবি যে রসসম্ভোগের কুঞ্জকানন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর মানসসুন্দরী বা জীবনদেবতা তাঁকে দীর্ঘকাল সেই স্বপ্নজগতে থাকতে দিলেন না তাই রসের জগৎ থেকে কর্মের জগতে নেমে আসতে কবিকে কঠোর সুরে আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বানে কবিকে সাড়া দিতেও হল।

'অশেষ' কবিতাটিকে অবশ্য কবিজীবনের দিক থেকে ভিন্নভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি কবি বারবার তাঁর কবিজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, কাব্যসৃষ্টিতে মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ, ক্লান্ত বোধ করেছেন; যখনই তাঁর কবিজীবনের একটি পর্ব শেষ হতে চলেছে তখনই তাঁর মনে একটা বিরতির ভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির সেই সব অবসাদগ্রস্ত মুহূর্তে কবিহৃদয়ে নবীন প্রেরণা সঞ্চার করতে কবির জীবনদেবতার হয়েছে আবির্ভাব। তারই আহ্বানে কবির কাব্যবীণায় নব নব সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

'বর্ষশেষ' কবিতাটিকেও কবি তাঁর ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত রূপেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। কবি পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁর নিজেরই এক পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

"আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

কবির এই উক্তি, শুধু 'ধর্ম' সম্বন্ধেই সত্য নয়, তাঁর কবিধর্ম সম্বন্ধেও কত সত্য সেকথা এই প্রবন্ধেই 'বর্ষশেষ' কবিতা আশ্রয়ে কবি এইভাবে বুঝিয়েছেন—

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ

বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল ? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।"

এই 'বর্ষশেষ' কবিতা সম্পর্কে কবি আরও বলেছেন—

"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিন শেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি··· এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে, চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙ্‌তে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিত্‌কে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।"[৭৯]

কবি এই 'বেরিয়ে আসার' স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি তাই নানাজনে এব নানা-রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন—

"কেবল ভারতীর সম্পাদকত্ব ত্যাগ নিশ্চয়ই এতবড় কবিতার উৎস হতে পারে না। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পুরাতন জোড়াসাঁকোর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবন যাপন করিতে গ্রামে আসিতেছেন, এই কবিতা তাহাই সূচিত করিতেছে।"[৮০]

জনৈক সমালোচকের মতে—

"একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এই কবিতা রচনার পশ্চাতে অলক্ষিতে কবি-মনে রহিয়াছে, পরাধীনতা ও দাসত্বের চাপে ন্যুব্জপৃষ্ঠ শান্তশিষ্ট ভীরু জাতীয় চরিত্রের আলেখ্যটি।···

দেশের চারিদিকে ভীরু, ক্লীব, দাস মনোবৃত্তি কবিকে অহরহ তীব্র পীড়ন করিতেছে। 'সাধনা' ও 'ভারতী'র রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে এই ক্ষুব্ধ, অশান্ত কবি-মানুষটি যে কী দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছেন ···তাহা আমরা দেখিয়াছি। মাঝে মাঝে তাঁহার নিজের মধ্যে সংগ্রামের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সময় তিনি শিলাইদহে স্ত্রীপুত্র কন্যাসহ ঘোর সংসারী জীবন যাপন করিতেছেন। জমিদারী তদারকও করিতে হইতেছে। সুতরাং 'জড়ায়ে আছে বাধা'। শুরু হয় কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব।"[৮১]

'বর্ষশেষ' কবিতার মূলে শেলীর 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' কবিতার প্রভাবের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বীকার করে নিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় সমালোচক এই কবিতা রচনার পিছনকার তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবির বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থার কথা বললেন। অন্য একজন সমালোচক কবির অন্তর্জীবনে এই সময় যে মহত্তর পরিবর্তন ঘটেছিল এই কবিতায় তার আভাস লক্ষ্য করেছেন। এই সমালোচক বলেছেন—

"কল্পনায় একটা Vita Nuova বা নবজীবনের সূত্রপাত হইল। এই নবজীবনের আদর্শ ও বাণী বর্ষশেষ কবিতার উদাত্ত, তীব্র সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। কালবৈশাখীর রূপে নূতনের আবির্ভাব হইল।"[৮২]

এই নতুনের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে কবি তাঁকে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করে বলে উঠলেন—

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে-নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে,
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।

'চিত্রা'য় কবিকে একবার রঙ্গময়ী কল্পনার উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, স্বপ্নজগৎ থেকে তিনি যেন তাঁকে কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন কিন্তু সেখানে কল্পনার মায়াময় গণ্ডী পুরোপুরি ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; 'কল্পনা' কাব্যের এই "বর্ষশেষ" কবিতায় কবি সত্যসত্যই কল্পস্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, কল্পনার গণ্ডীর বাইরে আসার জন্য তৈরি হয়েছেন। অভ্যস্ত কর্ম অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি ও কল্পনার রসসম্ভোগের যে জীবন নিয়ে এতদিন তিনি সুখে কাটিয়েছেন তাতে তাঁর সত্যিকারের তৃপ্তি হয় নি। তাই রুদ্রের আহ্বানে সেই জীবন থেকে বাইরে আসার জন্য কবির অন্তরে এই সময় যে কান্না শোনা গিয়েছে তাই ধরা পড়েছে 'বর্ষশেষ', 'দুঃসময়' প্রভৃতি কবিতায়। কবির বহির্জীবনে ততটা নয় এমনকি তাঁর কবিজীবনেও নয় এই সময় তাঁর

অন্তর্জীবনে এসেছে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক সঙ্কট যার কথা মনে করে 'দুঃসময়' কবিতাটিতে তিনি আপন অন্তর বিহঙ্গকে সাবধান করে দিয়ে গেয়েছেন—

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

'বৈশাখ' কবিতাটি 'বর্ষশেষ' কবিতার পরিপূরকরূপে কল্পিত হতে পারে; 'বর্ষশেষে' কবি যাঁকে রণজয়ী কিশোররূপে কল্পনা করেছেন 'বৈশাখ' কবিতায় তিনিই রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন কবির জীবনে। এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"একজাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার বৈশাখ কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। বলা বাহুল্য এটা শেষ জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। যেমন সোনার তরী কবিতাটি।…ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত। 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন চারিদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেইদিনটিকে যদি ভূমিকা-রূপে ঐ কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠ্‌ত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর,
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ রন্ধ্র হ'তে ছুটে আসে।

খোলা জানলায় ব'সে ঐ ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক রিক্ত দিগন্ত প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হুহু ক'রে ছুটে আসছে ঘূর্ণা নৃত্যে, ধুলো বালি শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি।

তারপরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে

মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব 'পরে

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ। সেদিনকার বৈশাখ-মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল ব'লেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধু-ধু করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল করছে, ঝাউ উঠছে নিঃশ্বসিত হ'য়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ সুরে—গাছের মর্মর, পাখীদের কাকলী, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়া শূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থর গমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটা বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে ব'সে সেটা শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়া নৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয়তো কি? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ; কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণি গতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাইনি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর অবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিইনে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার যো নেই।"[৮৩]

কবিতা কবির বাসনালোকে প্রতিফলিত নানা স্মৃতি স্বাক্ষরের নির্বাচিত বাণীরূপ, সকল কবিতা সম্পর্কে একথা সত্য। কিন্তু একজাতের কবিতা আছে যা বহুদিনের সঞ্চিত স্মৃতির শান্ত বহিঃপ্রকাশ, অন্যজাতের কবিতা সমসাময়িক বস্তু-ঘটনা-দর্শন জাত। প্রথম শ্রেণীর কবিতা যেহেতু বাসনা-লোকস্থিত স্মৃতিজাত তাই কবির মানসলোকের গভীরে ডুব দেওয়ার প্রয়োজন হয় এই জাতের কবিতা লেখার সময়, আর এই স্মৃতির গভীরে ডুব দেওয়ার সময় যদি তৎকালীন ও তৎস্থানিক বাহ্য বস্তু ঘটনা কবি-মনকে বিচলিত করে তবে কাব্যসৃষ্টিকালে বাসনালোকের গভীরে একাগ্রচিত্তে অবগাহন কবির পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্যই কবি বলেছেন—এই জাতের কবিতা লেখা হয় বাইরের দরজা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে। লৌকিক বস্তুভাবকে অলৌকিক বস্তু বিভাবে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময়ের। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা রচনা যেহেতু সেই সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাই লৌকিক

বস্তুকে অলৌকিক রসরূপ দান করতে কবিকে অন্য উপায় গ্রহণ করতে হয়। বাইরের সমকালীন বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে তিনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে তার স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। আর এই একান্ত আত্মপ্রকাশের ফলে কবি নিজস্ব ব্যক্তিমানসের আবেগ এবং কবিতার রসপরিণতিতে নিজস্ব ব্যক্তিগত আত্মিক গভীরতাটুকু সঞ্চারিত করে দিতে চান। এই সব কবিতা কবির ভাষায় 'মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী'।

'কল্পনা' কাব্যে এ দু-জাতের কবিতারই দৃষ্টান্ত আছে। কবি প্রথম জাতের কবিতার মধ্যে যে উপবিভাগ করেছেন তাও এই কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যেমন, অতীতের স্মৃতি-'স্বপ্ন' কবিতায়, অনাগতের প্রত্যাশা 'দুঃসময়', 'অশেষ' কবিতায়, বাসনার অতৃপ্তির দৃষ্টান্ত 'অসময়', 'ভ্রষ্ট লগ্ন', আকাঙ্ক্ষার আবেগ—'হতভাগ্যের গান', রূপরচনার আগ্রহ 'বর্ষামঙ্গলে,' আর বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লেখা দ্বিতীয় জাতের কবিতার দৃষ্টান্ত 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' কবিতা।

কবি স্বয়ং 'বৈশাখ' কবিতার যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন আমরা তা সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করেছি এবং লক্ষ্য করেছি কবির কথায় ঐ কবিতার অনেক আপাত অসঙ্গতিও দূর হয়েছে, কবিতাটির অর্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে কবির সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। রৌদ্ররসের যে সার্থক রূপ কবির অনুভূতিতে স্পষ্ট ছিল তা তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠকের চিত্তেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছে একথা এই কাব্যালোচনার উপসংহারে বলা চলে।

ক্ষণিকা (১৯০০)

"শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মিশ খায় এমন একটি মনের ভাব আছে যাকে বলা যেতে পারে উজ্জ্বল প্রসন্নতা। বর্ষার মেঘপুঞ্জ যখন কিছুক্ষণের জন্যে দিগন্তে তালবন শ্রেণীর মধ্যে কালো তাঁবু ফেলে জমিয়ে বসে তখন যে শান্ত স্নিগ্ধ আলোটি এখানকার মাঠে মাঠে ঝলমল করে ওঠে সেই আলোর মতো স্নান করা উদার বিস্তীর্ণ দীপ্তি যখন মনকে অধিকার করে থাকে তখন এখানে থাকাটা সার্থক হয়ে ওঠে। কিছুদিন থেকে সেই রকমের একটি পরিব্যাপ্ত পরিতৃপ্তি আমার মনে বিরাজ করছিল—জানালা থেকে বাইরের দিকে চাইলেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটি সহজ মিলনের অনুভূতি সেই মুহূর্তেই আমার চেতনাকে কচিধানের কোমল সবুজ প্রাণের রঙে রাঙিয়ে দিত। লিখতুম বা ছবি আঁকতুম

বা চুপচাপ কেদারায় ঠেস দিয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকতুম এই আভাটি তার পিছনে সর্বদাই থাকত। আমার মনে হয় যে-সপ্তকে আমার জীবনের গান বাঁধা এইটিই তার মূল সুর। এইটে চাপা পড়ে যখন তখন প্রাণটাকে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যেন তুফানের টল্‌মলে নৌকাকে দাঁড় টেনে চালানোর মতো অত্যন্ত ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তখন টানাটানি করতে করতে মন হাঁপিয়ে পড়ে অথচ নৌকাও বেশি এগোয় না। আমার একটি কবিতার প্রথম লাইনে আছে 'সুখ অতি সহজ সরল'—সেই দুর্লভ সুখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—সেই সুখের স্পষ্ট হিসেব দেওয়া যায় না, সেই সুখটা বিশেষ কোন্ জিনিস নিয়ে তার সুনির্দিষ্ট জবাব অসম্ভব। যে-বীণার ঠিক তার বাঁধা হয়েছে সে বীণা বাজুক না বাজুক তার নিজের সঙ্গে নিজের যে সামঞ্জস্য—এই সুখটিও তারি মতো। আপনার মধ্যে আপনি বাধা না পাওয়ার সুখ।"[৮৪]

১৩৩৬ সালের ৫ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এই পত্রে কবি আপনার মনের যে উজ্জ্বল প্রসন্নতার কথা বলেছেন 'ক্ষণিকা' কাব্যখানিতে যেন কবিমনের সেই বিশেষ ভাবটিই পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এই কাব্যের কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি কবির অন্তর পরিব্যাপ্ত করেছিল। কবির জীবনসঙ্গীত যে সপ্তকে বাঁধা সেই মূল সুরটিই ধরা পড়েছে এই কাব্যে। জীবনের মূলে যে সহজ সরল সুখের অস্তিত্ব কবি 'চিত্রা'র "সুখ" কবিতায় উপলব্ধি করেছিলেন সেই দুর্লভ সুখের সত্যিকার সাক্ষাৎ পেলেন 'ক্ষণিকা'য় এসে। 'চিত্রা'য় কবির জীবনদেবতা কবিকে বীণাযন্ত্ররূপে গ্রহণ করে ব্যথার পীড়নে তারগুলি একে একে বেঁধে দিয়েছেন, যন্ত্র ও যন্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে বটে কিন্তু অত্যন্ত বেদনার মধ্যদিয়ে এই তার বাঁধা হয়েছে। 'ক্ষণিকা'য় এই নিঠুর পীড়নের পরিচয় নেই, কবি-বীণার ঠিক তার বাঁধা আছে—নিজের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য অতি সহজেই স্থাপিত হয়েছে, কবিব্যক্তিত্বের যুগ্মসত্তার এই পূর্ণ সামঞ্জস্যে 'আপনার মধ্যে আপনি বাধা না পাওয়ার' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিবীণা বেজে উঠেছে—

'শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।'

রবীন্দ্র-কবিজীবনে ক্ষণিকের অবস্থিতি নিয়ে এসেছিল এই 'ক্ষণিকা'

কাব্যখানি। কবি অবশ্য এই কাব্যখানির গুরুত্ব অত্যন্ত লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন। বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন,

আশা করি, নিদেন-পক্ষে ছটা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন-বাসে সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে—
কতকটা কি অগ্নিকণায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?
কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,
তারপরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

ঠাট্টার সুরে বন্ধুর কাছে নিজের সৃষ্টির মূল্য সম্পর্কে যে কথা কবি বলেছেন তাতে এই অপূর্ব কাব্যখানির অবমূল্যায়ন হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। বন্ধুবরের সিগারেটের সহচরী এই কাব্যখানির অনেক কবিতাই ছাইয়ের সঙ্গে ধুলোয় খসে পড়বে বলে কবি যে মন্তব্য করেছেন তা নিজের গৌরবকে অযথা খর্ব করার সকৌতুক চেষ্টা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বরং এই কাব্য সম্পর্কে কবির অপর উক্তিই যথার্থ হয়েছে—'কতকটা কি অগ্নিকণায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?' এই কাব্যখানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই এর উত্তর আছে—রবীন্দ্রকাব্য মালার এই শুভ্র পুষ্পটির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাওয়া যায় তাতে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে এই কাব্যখানি রবীন্দ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীতে একটা স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। 'ক্ষণিকা'র কতকগুলি কবিতা নয়, প্রায় সবগুলি কবিতাই যেমন, "মিষ্ট, হৃদয়স্পর্শী সুগভীর সুললিত (অনেকস্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ" তাতে এই কাব্যের অগ্নিদীপ্তি সম্পর্কে সংশয়ের কোনও কারণই নেই। কবি নিজেও হয়তো মনে মনে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন—এর ছন্দ ভাব ভাষা প্রভৃতির অভিনবত্ব সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম সজাগ হয়ে উঠেন। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা এক পত্রে এই কাব্য রচনার অব্যবহিত পরবর্তীকালেই কবি জানিয়েছেন—

"ওর (ক্ষণিকার) ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয় তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্চে না এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কি না—সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করচে।…আমি লোকেনকে লিখেছি ক্ষণিকায় আমার মনের ভাবগুলিকে এক ঝাঁক বনের পাখীর মত নানা খোপখাপের ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা গানও গাচ্চে এবং উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি। ঐ

লঘুতাটার জন্যে একদলের বিরাগভাজন হব; যারা আকাশের পাখীর স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে শুনতে চায়—আমার ছাড়া পাখীগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাদের দাঁড়ের উপর ধরা দিবে না বলেই তারা চটুবে এক একটি সমালোচকের নিজের নিজের এক একটি দাঁড় আছে—সেই দাঁড়ের উপরে শিক্‌লি দিয়ে কবিতাকে না বাঁধ্‌তে পারলে তারা তীর এবং বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ক্ষণিকার ভাগ্যে সেই রকম অপঘাত মৃত্যুর আয়োজন ঘটা সম্ভব।"[৮৫]

সমালোচকের হাতে 'ক্ষণিকা'র কবিতার অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জেনেও কবি এর কাব্যমূল্য সম্পর্কে এতদূর স্থির নিশ্চয় ছিলেন যে এই কবিতাপক্ষী গুলির মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত কাব্যাকাশে লঘুলীলার সন্তরণ দেখেই খুশী ছিলেন। বড় জোর প্রিয়নাথ সেনের মত বন্ধুর সমালোচনার সংকল্পে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন অথবা চন্দ্রনাথ বসুর প্রশংসাপত্র উদ্ধার করে একটু উৎসাহ-বোধ করেছেন।

অথচ 'ক্ষণিকা' কাব্যখানি রবীন্দ্রকাব্যধারায় কিছুটা পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন 'কথা-কাহিনী-কল্পনা' কিংবা 'নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র সঙ্গে এর ভাব ভাষা ছন্দগত পার্থক্য এত বেশী যে এই কাব্যখানিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-কবিতার যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল তাকে রবীন্দ্র-কাব্যমহাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাতন্ত্র্যের মতোই মনে হয়। নিজের কাব্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি নিজেও সেকথা বলেছেন—

"ক্ষণিকা যখন লিখলুম তখন লোকের ধাঁধা লেগে গেল, গাল দিতেও তাদের মন সরল না। তাতে যে হাস্যরসের ছিট ছিল লোকে মনে করলে লেখক ভদ্রলোক কি পাঠকের সঙ্গে কৌতুক করছেন না কি? আগে লোকে ভালো বলেছে, মন্দ বলেছে এমনতর নিস্তব্ধতা আমি আশা করিনি।"[৮৬]

বাস্তবিকই 'ক্ষণিকা'য় কবির কাব্যরচনা ভঙ্গির যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে তা পাঠকদের হতবুদ্ধি করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। 'রবিরশ্মি' রচয়িতার মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি নিজের প্রতিভার স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ক্ষণিকায় কবি তাঁহার নিজস্ব ভাষার সন্ধান পাইলেন···ক্ষণিকাতে তিনি প্রথম হসন্তবহুল চলতি কথায় সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য ধরিতে পারিলেন। লিরিকের যাহা বাহ্য উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলঙ্কার—তাহা এই কাব্যের কবিতা-গুলির মধ্যে বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[৮৭]

'ক্ষণিকা' কাব্য পাঠকালে সব চেয়ে আগে এর স্বচ্ছন্দ ছন্দ ও সহজ বাক্‌ভঙ্গি—ইংরেজিতে যাকে বলে স্পিচ্‌ রিদ্‌ম্ (Speech Rhythm) তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি যে কথা বলেছিলেন—

"যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"[৮৮]

সেই রামপ্রসাদী ছন্দকে যে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে রূপায়িত করে তোলা যায় তার প্রমাণ 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিতেই। ধারাবাহিকভাবে কবি এই কাব্যে বাক্‌ছন্দেরও ব্যবহার করেছেন। আবার বাক্‌ছন্দ যেহেতু সর্বতোভাবে রচয়িতার ভাবের অনুবর্তী; সেইজন্য কাব্যে বাক্‌ছন্দ ব্যবহারে কবির ভাব কল্পনায় ঋতু পরিবর্তনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কবি নিজেই বলেছেন—'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে' দেওয়া তাঁর 'ক্ষণিকা' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নয়, যদিও আমরা জানি এই কাব্যে সহজ সত্যকেই কবি অত্যন্ত হাল্‌কা করে পরিবেশন করেছেন এবং এই আপাততুচ্ছ ভাবকে প্রকাশের জন্য তিনি চলতি বাক্‌ভঙ্গী ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দকেই উপযুক্ত ভেবেছেন। কাব্যে এই রীতি পরিবর্তনের হেতু স্বরূপ নির্দেশ করা যায় কবির মানসজগতে এই সময়ে ঐ যে একটি ঋতুপরিবর্তনের পালা চলেছিল 'ক্ষণিকা'র প্রথম কবিতাটিতে (উদ্‌বোধন) কবি তার আভাস দিয়েছেন। প্রাক্-কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যে যে গভীর গম্ভীর সুর শোনা যায়, যে মননপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় 'ক্ষণিকা'য় তা থেকে কবি পূর্ণ-মুক্তি লাভ করতে চেয়েছেন, পূর্ববর্তী যুগের তথ্য তত্ত্ব দার্শনিক চিন্তার বেড়ি ভেঙে কবি আনন্দে গেয়ে উঠেছেন—

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি।
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।
বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

অবশ্য 'ক্ষণিকা'র মধ্যেও রবীন্দ্রজীবনের মূল কয়েকটি প্রত্যয়ের কথা আভাসিত হয়েছে—

যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

কিংবা, 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।'

এই ধরনের গভীর কথা 'ক্ষণিকা'তে আরও আছে তবে তা দার্শনিক তত্ত্ব বা মেটাফিজিক্যাল টথ-রূপে নয়, আছে কবির সহজ উপলব্ধিরূপে, রসের সত্যরূপে। সহজ সত্যকে কবি আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে। অনেক গূঢ় গভীর কথা অতি সুখপাঠ্য কবিত্বমণ্ডিত করে কবি পরিবেশন করেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয় এই কাব্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ 'ক্ষণিকবাদ' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা। শুধু কাব্যের নামকরণেই নয়, 'ক্ষণিকা'র বহু কবিতায় এই 'ক্ষণিকবাদ'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—'ক্ষণিকার পাতায় পাতায় ক্ষণিকা আঁকা।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ক্ষণিকা'র রসগ্রহণে পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করেছিলেন কিন্তু বাকি এক আনা স্বাধীন রসগ্রাহী পাঠক যে এই কাব্যখানিকে সৃষ্টিমাত্রেই স্বাগত জানিয়েছিলেন তার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন। চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রপ্রতিভার বিদ্যুদ্বিকাশে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে তাঁর পত্রে এই কাব্যের যে আলোচনা করেন কবি স্বহস্তে তার অনুলিপি প্রিয়নাথ সেনকে পাঠিয়েছিলেন আমরা সেকথা আগেই বলেছি। ঐ পত্রে চন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি--পল্লীপ্রিয়—পাড়াগেঁয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধহয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে এ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু, কি জানি কেন, "বিরহে"র সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছিলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 'বিরহ' কবিতাটি আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সেইটে উনি বিশেষরূপে নির্বাচন করাতে আমিও একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।"

প্রিয়নাথ সেন 'ক্ষণিকা'র সমালোচনা করছেন শুনেও কবি খুসি হয়েছিলেন; অবশ্য প্রিয়নাথ সেনের সেই পরিকল্পিত সমালোচনা লেখা হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই কারণ তা কোথাও প্রকাশিত হতে দেখি না। সে যাই হোক—ঐ এক আনা রসিক পাঠকের রসবোধের উপর কবি যথেষ্ট নির্ভর করতেন তাই অরসিক সমালোচকের বিরূপ সমালোচনাকে তিনি তেমন গুরুত্বই দেন নি।

কবি জানিয়েছেন 'বিরহ' কবিতাটি তাঁর বিশেষ প্রিয় কিন্তু আমাদের মনে হয় 'ক্ষণিকা' কাব্যখানিই রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলীতে অন্ততঃ মধ্য বয়সের লেখা কাব্যসমূহের মধ্যে কবির কিছু বিশেষ প্রিয় ছিল। আমাদের এই অনুমানের কারণ 'ক্ষণিকা'র কবিতায় কবি নিজের সম্পর্কে এবং স্বীয় রচনা সম্পর্কে যেরকম অব্যর্থ সত্য কথা যেমন সহজে উচ্চারণ করেছেন, এমন আর কোনও কাব্যে করেন নি—গদ্যেও এরকম সহজ স্বীকারোক্তি দুর্লভ। একমাত্র 'ছিন্নপত্রাবলী'কেই কবির আত্মকথার কবিত্বমণ্ডিত প্রকাশরূপে 'ক্ষণিকা'র পাশে দাঁড় করান যায়। 'ছিন্নপত্রাবলী'র মতই 'ক্ষণিকা' কবির প্রিয় ছিল তাঁর এই গ্রন্থের কবিকথামূলক কবিতাগুলির সাক্ষ্যেই তা প্রমাণ করা যায়। এইজন্য কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমরা 'ক্ষণিকা'র 'কবি'; 'কবির বয়স', 'জন্মান্তর', 'কর্মফল', 'ক্ষতিপূরণ', 'যথাস্থান' এই কটি কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

কবি নিজেই এক সময় বলেছিলেন—'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে।' জীবনচরিতে পাওয়া যায় ব্যক্তিগতভাবে মানুষটিকে, কবি আছেন তাঁর রচনায়—তাঁর কাব্যে। আর এই কাব্যগত জীবনচরিত কবির বাস্তব জীবনের পক্ষে অমূলক, সেই কথাটিই সহজ করে বলেছেন কবি ক্ষণিকার 'কবি' কবিতায়—

কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে রাখে নি মুখ, দিবারাত্র ভাঙছে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব হাস্যমুখেই বয় গো॥

'কবির বয়স' সম্পর্কে যে কথা 'ক্ষণিকা'য় বলেছেন তা তাঁর নিজের সম্পর্কে যেমন খাটে এমন আর কার সম্পর্কে? পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়ার কথা শাস্ত্রে বললেও সৌন্দর্যরসিক কবি যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চেয়েছেন। কিন্তু পঞ্চাশ পার হলে চুলে যখন পাক ধরেছে তখনও নিজেকে 'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো সবার সমবয়সী' বলে দাবি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই

চিরনবীনতার কথা রবীন্দ্রজীবনী পাঠকের অজানা নেই। নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো কথা, সত্য কথা কবি বলেছেন 'জন্মান্তর' ও 'কর্মফল' নামের আর দুটি কবিতায়।

প্রথম কবিতাটির কথা কবি নিজেই আবার বছর দশক পরে একটি চিঠিতে ভক্ত অজিত চক্রবর্তীকে লিখে জানিয়েছিলেন—

"এবার এই হিমালয়ে এসে আমার মনে হচ্চে, সকলের সব দাবি কাটিয়ে কিছুকাল একলা এই রকম জায়গায় থেকে গেলে আমার যা আবশ্যক তা অনেকটা পূরণ হতে পারে। দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সত্যদৃষ্টি পাওয়া যায়—অনন্তের অনন্তরূপ অমৃতরূপ তখনই চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া ওঠে। সেই রূপটিকে আমি চোখ মেলে দেখে যাব —এরই জন্য আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ক্রন্দন। এই কথাটাকেই সুস্পষ্টভাবে না বুঝেও কৌতুকের ছলে আমি লিখেছিলুম—

আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।
যদি পরজন্মে পাই রে হতে ব্রজের রাখাল বালক—

ব্রজের বালকের সেই সরল দৃষ্টিটি আছে যাতে না বুঝে না জেনেও সমস্ত সুন্দর করে দেখতে পাওয়া যায়—যে দৃষ্টির কাছে অনন্ত আপনিই দিনে রাতে কাজে খেলায় অতি সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দেন।

কিন্তু রাখাল বালকটাকে গুরুমশায়ের আসনে কে বসালে। এ কৌতুক তার সঙ্গে কে করচে। এ কৌতুক চিরদিন কখনই চলতে পারে না—সে যে রাখাল এ কথাটা কখনই চিরদিন চাপা থাকবে না—ধরা পড়বেই তার গুরু-গিরি একদিন সমস্ত ভেঙে যাবে। এ গুরুগিরি তার ভালও লাগচে না। বাঁশের বাঁশিই তার পক্ষে ভাল, আর যমুনার ধার।"[৮৯]

পরজন্ম সত্য হলে কবি রাখাল বালক হতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর কর্মফল এমনই যে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁকে নিজের লেখার সমালোচক হয়ে জন্ম নিতে হবে এমন আশঙ্কার কথা পরবর্তী কবিতায় এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি—
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।

গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক—
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

অবশ্য নিজ কর্মফল ভুগবার জন্য কবিকে "পরজন্ম" পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি—এই জন্মেই নিজের লেখার যে নির্মম সমালোচনা তিনি করেছেন তাতে 'ক্ষণিকা'র ঐ ভবিষ্যৎ বাণীই যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে। 'আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন' কিংবা 'আমি আমায় পাড়ব গালি'—এ সব কথা গদ্য করেও কবি বলেছেন একাধিক বার। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সাক্ষাৎকারে কবি বলেছিলেন—

"আমার নিজের লেখা যদি নিজে সমালোচনা করি তাহা হইলে খুব গাল দিই।"[৯০]

সুযোগ পেলেই নিজের রচনার কি কড়া সমালোচনা না তিনি করেছেন, নিজেকে অকরুণভাবে গাল পেড়েছেন—আমরা পূর্বেই এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছি, পরেও দিতে হবে কারণ আমাদের বর্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্যই তাই, সেইজন্য কবির নিজের লেখার সমালোচনা বিষয়ে এখানে আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে করে কেবল এই কথাটা বললেই যথেষ্ট হবে—'কর্মফল' কবিতাটি কবির সম্পর্কে অভ্রান্ত সত্য।

'ক্ষতিপূরণ' কবিতায় কবি তাঁর কাব্যের প্রবণতার কথা যেমন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এমন আর কোথায়? কবি লিখেছেন—

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য, বাংলাসাহিত্যের সৌভাগ্য, কবি তাঁর কাব্যের এই প্রবণতার কথা কবিপ্রতিভার উন্মেষ লগ্নে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ই বুঝতে পেরেছিলেন—'ক্ষণিকা' পর্যন্ত এই সত্য উপলব্ধির জন্য তাঁকে অপেক্ষা

করতে হয় নি। সেই কারণেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে কবি 'চল্লিশেরই ঘাটের থেকে' তাঁর কাব্যের সোনার তরীটি গীতিকবিতার ফসলে বোঝাই করে 'বিদায়' দিতে পেরেছেন।

কবির নিজের কাব্যের যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা আজকের দিনে কত সত্য তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিতে হয় না—

পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অ-স্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে, যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী সেথায় করবি যাত্রা?
গান তা শুনি কর্ণমূলে মর্মরিয়া কহে
নহে, নহে, নহে॥

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র লীলাখণ্ডে 'ক্ষণিকা'র অনেকগুলি কবিতা স্থান পেয়েছিল, সেই লীলাখণ্ডের প্রবেশকরূপে কবি যে কবিতাটি লিখে দেন তাতে এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবির মর্ম কথাটি ফুটে উঠেছে—

'তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল…'

কবির কথা সত্যই এই যুগে পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। 'সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি'র কবি যে এইভাবে ছলনা করে কথা বলবেন তা সহজে বুঝে ওঠা যায় না। এইজন্যই 'ক্ষণিকা'র "ভীরুতা", "মাতাল" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার অর্থও কবিকেই বুঝিয়ে দিতে হয়। কবির সেই উক্তি উদ্ধার করা যাক—

"ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার, ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে—সংগতকে নহে, অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে—একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক

তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর লীলাখণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিস আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজ-সংগত ভব্যতার ধার ধারি না; বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না। একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"[২১]

কবির এই উক্তি 'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতার মর্মগ্রহণে পাঠককে সহায়তা করে। হালকা সুরে লেখা হলেও 'ক্ষণিকা'র সব কবিতাই হালকা নয়, এমনকি সময় সময় কবিতার সুর সুগম্ভীর হয়ে উঠেছে দেখা যায়। সেইরকম সুগম্ভীর একটি কবিতা 'আবির্ভাব'। এই কবিতাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে স্বয়ং কবি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন—

"কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্ত কালের মেঘপুঞ্জে মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

'ক্ষণিকা'র "আবির্ভাব" কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা গৌণ, সমগ্রভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তা হলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু 'আবির্ভাব' কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে—এক সময়ে মন প্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে, সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা আকাঙ্ক্ষায় একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল; তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যামসমারোহ—জীবনে বাণীর বদল হলো, বীণায় আর এক সুর বাঁধতে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম

এক বেশে এক ভাবে আজ তাকে দেখছি আর এক মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াচ্ছি তারি অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হলেও তার জন্তে একই আসন মানায় না।"[১২]

'ক্ষণিকা'র আর পাঁচটা কবিতার মতো 'আবির্ভাব' কবিতারও একটা স্বরূপ আছে সেটা মনোহর সন্দেহ নেই, কিন্তু এই কবিতাটির অন্তর্গূঢ় যে একটি অর্থ আছে কবি নিজে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপরে যে কথা বলেছেন তাতে বুঝা যায় 'আবির্ভাব' কবিতায় যাঁর আবির্ভাব হয়েছে তিনি রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরী, জীবনদেবতাই বটে, তবে এবারে তাঁর আবির্ভাব যৌবন বসন্তের লীলা-মাধুর্যের মধ্য নয়, বর্ষার দিগন্তব্যাপী শ্যামসমারোহের ভিতরে। কবির জীবনে এই জীবনদেবতাই বিচিত্রবেশে বারবার ধরা দিয়েছেন—এবারে যখন 'ক্ষণিকের পাতার কুটীরে' কবির অন্তর প্রদীপের আলোকে তার আত্মপ্রকাশ ঘটল তখন কবির অন্তর হতে 'ক্ষণিকা মূরতি' অন্তর্হিত হয়ে গেল, কবি বুঝলেন তাঁর কাব্য-জীবনের ক্ষণস্থায়ী লীলাচাঞ্চল্যের মধ্যেও তাঁর জীবনদেবতার গূঢ় লীলাই কাজ করে চলেছে, আজ সকল চপলতার জন্য সেই নিরুপমার কাছে অপরাধ স্বীকার করে কবি 'প্রিয়েরে দেব তা করে' তুলে ভালবাসার অর্থেই ভক্তির নৈবেদ্য রচনা করলেন, কারণ কবি জানেন, তার পথ চলার আজ সমাপ্তি ঘটেছে, 'ক্ষণিকা'র অকারণ পুলকের কখন হয়েছে অবসান, কবি কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই জীবনদেবতার মন্দিরেই বিশ্বদেবতাকে দর্শন করে নতুন সুরে গান ধরে দিয়েছেন—

> তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
> জানি না কখন পশিনু কেমনে।
> অবাক রহিনু আপন প্রাণের
> নূতন গানের রবে।

'নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি' পর্বে আমরা কবিকণ্ঠে এই নতুন গান শুনতে পাব। রবীন্দ্রনাথের সেই নব কাব্যজীবনের আলোচনায় রবীন্দ্র মন্তব্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সংকলন ও সমালোচনা কবব।

•

১ অজিত চক্রবর্তীকে তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া উপলক্ষে কবির ১০-১০-১৯১৬ তারিখে লিখিত পত্র, 'রবীন্দ্রসদন,' শান্তিনিকেতন থেকে প্রাওয়া

২ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র ২৫৬, 'দেশ' ৬ই আশ্বিন, ১৩৫৭
৩ মানসী অধ্যাপনাকালে কথিত 'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা' প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন
৪ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পত্র ৭ (২য় ভাগ) পৃ ১৫২
৫ মানসী অধ্যাপনাকালে কথিত 'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা' প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন
৬ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড পত্র ৬ (২য় ভাগ) পৃ ১৫০-১৫১
৭ Coleridge, 'Biographia Leterarıa', Vol.II Ch. XV পৃ. ১৯ (১৯৪৯)
৮ মানসী অধ্যাপনাকালে কথিত "মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা," প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন
৯ সমালোচনাটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩০০ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
১০ "আমার ছন্দের গতি", ছন্দ পৃ ২২০-২২১ (১৯৫৭)
১১ 'রবিরশ্মি'-পূর্বভাগে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ২৯৬ (৫ম সং)
১২ 'তরী বোঝাই' শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৮শ খণ্ড) পৃ ৩৭৫
১৩ বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা কবির পত্র, রচনা প্রসঙ্গ 'সোনার তরী' পৃ ২১৩ (১৯৫৭)
১৪ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ২৯০ (১৩৬৭)
১৫ 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ'—অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুপ্রভাত' পত্রিকা, ১৩১৬ শ্রাবণ
১৬ 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (২য় খণ্ড) মোহিতলাল মজুমদার পৃ ৬ (১৩৬০)
১৭ 'রচনা প্রসঙ্গ', সোনার তরী পৃ ২১৭ (১৯৫৭)
১৮ শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা ১১ই এপ্রিল ১৯৩৩ তারিখের পত্র, রবীন্দ্রসদন, শান্তিনিকেতন থেকে পাওয়া
১৯ আত্মপরিচয় (১ম প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ১৯৯ ২০০
২০ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত
২১ রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৭৩ (১৩৫৭)
২২ আত্মপরিচয় (৩য় প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ২১৫
২৩ রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৫৮ (১৩৫৮)
২৪ বিশ্বভারতী (৬ষ্ঠ প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ৩৬৫
২৫ রচনা প্রসঙ্গ 'সোনার তরী' পৃ ২১৯ (১৯৫৮)

২৬ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ২৯৬
২৭ শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্ত কৃত জীবনদেবতাবিষয়ক কবির বক্তৃতার অনুলিপি, দেশ ১৩।১।১৯৫৮ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে
২৮ আত্মপরিচয় (১ম প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ১৯৪-৯৫
২৯ Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist-Thompson পৃ ১০৮ (১৯৪৮)
৩০ 'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্র—২, পৃ ১০ (১৯৫৮)
৩১ চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড, পত্র—৩ (মুদ্রণ প্রমাদে গ্রন্থের এই পাদটীকা ৩৩ (১০০ পৃ) ছাপা আছে
৩২ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, (২য় খণ্ড) মোহিতলাল মজুমদার পৃ ১৭৮ (১৩৬০)
৩৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র—১৪৪ পৃ ৩১২-৩১৩
৩৪ 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য' বঙ্গদর্শন মাঘ ১৩১৪, আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ৬১১
৩৫ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত কবির পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ
৩৬ ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (তৃতীয়) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিরচিত পৃ ১২-১৪ (১৩৫১)
৩৭ জীবনদেবতাবিষয়ক কবিকথিত ভাষণের শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্ত অনুলিখিত 'দেশ' পত্রিকা ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৮ তে মুদ্রিত পাঠ থেকে নেওয়া
৩৮ The forms of the Mother of the Universe are three-fold. There is first the Supreme form (Para) of which 'None Know'. Next Her subtle form as Mantra or Sound ; and thirdly Her gross form in the visible Universe and in those embodied aspects or spiritual avataras in which she presents Herself for the benefit of the sadhaka who can only worship Her in such Form".

Introduction to Tantric Texts Voll III. Arthor Avalon

৩৯ 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২০শ খণ্ড) পৃ ৪২৯-৪৩০
৪০ 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা'—ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাংস্কৃতিকী' থেকে নেওয়া
৪১ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, প্রবাসী, ১৩৪৯ বৈশাখ

৪২ রবিরশ্মি (পূর্বভাগে) চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র পৃ ৪৩৩-৪৩৪ (৫ম সং)

৪৩ কবিদৌহিত্রীর স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে লিখেছেন—"The same spirit (The Universal spirit of God) that suffused and ruled this vast Universe dwelt within him and guided his life and genious. He called it Jivandevata or Lord of my life."—Rabindranath Tagore—A Biography, K. Kripalani পৃ ১৬৬ (১৯৫৮)
শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতেও এই বিশ্বসত্তারই সমর্থন তবে তাঁর ব্যাখ্যা একটু ভিন্ন ধরনের। দ্রঃ 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' পৃ ৪-৫ (১৩০০)

৪৪ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা পৃ ৩৫১-৩৬২ (১৩৫৮)

৪৫ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য—'কবিমানসী' (১ম খণ্ড) (১৩৪৮) ও ২য় খণ্ডের অবতরণিকা

৪৬ অজিত চক্রবর্তী—'কাব্য পরিক্রমা' পৃ ২৬-২৭ (১৩৬৫)

৪৭ অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা—'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা', 'কবি ও কবিতা' পত্রিকা, (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)

৪৮ অধ্যাপক ডঃ শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায়—'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে ?' রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

৪৯ অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাশ—'জীবনদেবতা শ্রেণীর কাব্য' (ঐ) উক্ত সমালোচকের মতে 'একমাত্র হেগেলীয় বা নব্য হেগেলীয় ধারণায় অর্থাৎ Unity in pluralityর সূত্রেই জীবনদেবতাতত্ত্ব নির্দোসভাবে অধিগত করা যায়।'

৫০ অধ্যাপক ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ' পৃ ২৮। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও দ্রষ্টব্য

৫১ চিঠিপত্র (৯ম খণ্ড) পত্র ১৯, পৃ ৩৯-৪০

৫২ 'আত্মপরিচয়' (৩য় প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ২২১

৫৩ চিঠিপত্র (৯ম খণ্ড) পত্র ৯৮, পৃ ১৬৯

৫৪ তদেব পৃ ৬১

৫৫ তদেব পৃ ৬১

৫৬ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, প্রবাসী ১৩৪৯ বৈশাখ।

৫৭ "রবীন্দ্রনাথ"—'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'—মোহিতলাল মজুমদার পৃ ১২০ (১৩১৩)

৫৮ রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (১ম) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১০২ (১৩৪৮)

৫৯ "রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাটি বাঙ্গালা ভাষায় কল্পনার ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে বিদ্যমান এবং বিশ্বসাহিত্যে এইরূপ কবিতা সুদুর্লভ'।"—"রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা," 'সাংস্কৃতিকী' প্রবন্ধে আচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন

৬০ 'বিহারীলাল চক্রবর্তী' প্রবন্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মোহিতলাল মজুমদার পৃ ১৮-৪৩ (১৩৬৩)

৬১ রবিরশ্মি—পূর্বভাগে—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৩৭৫-৩৭৬

৬২ ছিন্নপত্রাবলী পত্র ২২৪, পৃ ৪৬৬ (মুদ্রণ প্রমাদে ২ বার ৬২ ছাপা আছে)

৬২ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃ ৭৭ (১৩৬৫)

৬৩ 'উৎসর্গ' কবিতাটিকে মোহিতচন্দ্র সেন 'কাব্যগ্রন্থে'র জীবনদেবতা খণ্ডের অন্তর্গত করিয়াছিলেন।' —রবীন্দ্রজীবনী (১ম) শ্রীপ্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৪০১ (১৩৬৭)

৬৪ রবীন্দ্র সরণী অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী, পৃ ১০৬ (১৩৬৫)

৬৫ 'রবিরশ্মি-পূর্বভাগে' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৪৫৪ (৫ম সংস্করণ)

৬৬ রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড) শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৪৩৯ (১৩৬৭)

৬৭ 'সাহিত্য ঐতিহাসিকতা', সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড পৃ ২৮৩

৬৮ গ্রন্থপরিচয়, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (৭ম খণ্ড) পৃ ৫২৭

৬৯ 'কথা'-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রবীন্দ্রসাগরসংগমে—বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থের পৃ ২৫৮ দ্রঃ (১৩৬৫)

৭০ "কৃষ্ণচরিত্র", 'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী (৯ম খণ্ড) পৃ ৪৫৪

৭১-৭২ "ইংরেজ ও ভারতবাসী", 'রাজা প্রজা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১০ম খণ্ড) পৃ ৪০৩

৭৩ প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৪৫৫-৪৫৭

৭৪ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৫৯ থেকে উদ্ধৃত

৭৫ 'গদ্যকাব্য', সাহিত্যের স্বরূপ পৃ ৪১. (১৩৫১)

৭৬ রবিরশ্মি পূর্বভাগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৪৬২-৪৬৩ (৫ম সং)

৭৭ "রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত যেন বর্তমান যুগের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশের মধ্যে আপনাকে প্রবাসী বলিয়া কল্পনা করিত, সেই জন্যই তিনি উপনিষদ ও বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষের দিকে বারংবার ব্যাকুল আগ্রহ ভরে তদ্গত প্রাণ হইয়া ফিরিয়া তাকাইয়াছেন-ইংরেজি সমালোচনার ভাষায় ইহাকে romantic nostalgia বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।"—"শ্যামাজাতক ও রবীন্দ্রনাথের পরিশোধ কবিতা", 'কাব্য কৌতুক'—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য পৃ ৯৬ (১৩৬৩)

৭৮ আত্মপরিচয় (৩য় প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ ২২২

৭৯ গ্রন্থপরিচয়, 'কল্পনা' রবীন্দ্র-রচনাবলী (৭ম) পৃ ৫৩৮

৮০ রবীন্দ্রজীবনী (১ম) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ৪৩৬-৪৩৭ (১৩৬৭)

৮১ 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (১ম) শ্রীনেপাল মজুমদার পৃ ১০৬ (১৯৩৭)

৮২ কবিগুরু, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পৃ ১০৮ (১৩৩৭)

৮৩ রবিরশ্মি পূর্বভাগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৪১৬-৪১৭ (১৯৩৭)

৮৪ পত্রাবলী, দেশ ১৬ই বৈশাখ ১৩৬৫, পত্র সংখ্যা-১২৬

৮৫ চিঠিপত্র (৮ম খণ্ড) পত্র-১১৮ পৃ ১১৩

৮৬ 'আমার কাব্যের গতি', প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ

৮৭ রবিরশ্মি-পশ্চিমভাগে—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১ (৫ম সং)

৮৮ ছন্দ, পৃ ১৭১ (১৯৩৭)

৮৯ অজিত চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র, 'রবীন্দ্রসদন', শান্তিনিকেতন থেকে প্রাপ্ত

৯০ অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথিত, 'সুপ্রভাত' পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩১৬

৯১ ভূমিকা 'কাব্যগ্রন্থ', মোহিতচন্দ্র সেনসম্পাদিত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাগর সংগমে' গ্রন্থে ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত, উক্তগ্রন্থের পৃ ৩৯০-৩৯১ (১৩৩৭) দ্রষ্টব্য

৯২ রবিরশ্মি পশ্চিমভাগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৬-১৭ (৫ম সং)

তৃতীয় অধ্যায়

গীতাঞ্জলি পর্ব

নৈবেদ্য (১৯০১)

১৮৮৭ সালের ২৭শে জুলাই বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্রকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"দু বৎসর আগে পঁচিশ ছিলুম এইবার সাতাশে পড়েছি···সাতাশ হওয়াই কি কম কথা কুড়ির কোঠার মধ্যাহ্ন পেরিয়ে ত্রিশের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া—ত্রিশ অর্থাৎ ঝুনো অবস্থা।"[১]

কিন্তু ছেলে বুড়ো সবার যিনি সমবয়সী তাঁর ক্ষেত্রে বয়সের সীমা একটু না বাড়ালে চলে না। ত্রিশের কোঠা পার হয়ে চল্লিশের দশকে পা দেওয়ার সময় থেকেই ফুল ছেড়ে তার কাছে ফলের প্রত্যাশা করা উচিত। উত্তর তিরিশ এবং অনাগত চল্লিশ যে কোনো লেখক বা শিল্পীর জীবনের এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণ। প্রথম যৌবনের স্বতোৎসারিত নির্ভাবনা তখন পরিণত বুদ্ধির আবির্ভাবে কিছুটা শাসিত হয়, অথচ জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ রূপটি তখনও ধরা পড়ে না—চল্লিশ পার হলে তবেই আসে ঐ ঝুনো অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় লোকে সহজেই রসের অপেক্ষা শস্যের প্রত্যাশা করে, রচনা থেকে তত্ত্বজ্ঞান নিষ্কাশন, দর্শন উৎপাটন করতে চায়। রবীন্দ্রকাব্যে এই পরিপক্কতা এসেছে ঠিক চল্লিশের পরে। 'ক্ষণিকা'র "যৌবনবিদায়" কবিতায় কবি তাঁর কাব্যজীবনের এই সত্য ইতিহাসটুকু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যখানি রচিত হয়েছে কবির চল্লিশ বৎসর বয়সে এবং আয়ুর মধ্যসীমায় পা দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির জীবনে ও কাব্যে এসেছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। কবির জীবনবোধ পাল্টে গেছে। 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা' রবীন্দ্র-কবিজীবনের এক অর্ধ ধরলে 'নৈবেদ্য' থেকে অপরার্ধ শুরু হয়েছে বলা যায়।

এই দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা তাঁর ধর্মসাধনার অন্তর্গত হয়েছে। কবিজীবনের প্রথমার্ধে তাঁর কবি-প্রতিভা রূপজগৎ ও মানবজীবনের ধ্যান করেছে কিন্তু 'নৈবেদ্য' থেকে জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীই যেন পাল্টে গেছে। এই সময় থেকে কবির কাব্যে যে জীবনদর্শনের পরিচয় পাই তা আধ্যাত্মিক জাতীয়। রূপ নয় অরূপের প্রতি কবির প্রাণগত

আকর্ষণ দেখা দিয়েছে এই সময়ে থেকেই এবং সেই আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। কবির কাব্যে এই সময়ে একটা ধর্মভাব, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম নয়, একটা সার্বজনীন ধর্মচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কবি সীমার মধ্য থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন সাধনের যে পালাকে তাঁর কাব্যের একটিমাত্র পালা বলেছেন তা এই সময়কার কাব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য—এই সময়কার কবিতার মর্মকথাই হল 'সীমার মাঝে অসীমের সুর' ধ্বনিত করে তোলা—বিশ্বদেবতার সঙ্গে জীবনদেবতার ব্যক্তিক সম্বন্ধ স্থাপন করা।

'নৈবেদ্যে' শুধু ধর্মচেতনাই নয়—কবির সমাজ চেতনা ও স্বদেশ চেতনারও পরিচয় আছে। এই স্বদেশচেতনার সঙ্গে কল্পনা প্রিয়তার দ্বন্দ্ব—রোমান্টিক কবিদের 'রিয়্যাল' ও 'আইডিয়াল' এর চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্বের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে—কবি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য পরমপুরুষ বিশ্বদেবতার ধ্যান করেছেন এবং আপন অন্তরের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা তাঁরই চরণে সমর্পণ করেছেন। 'নৈবেদ্য', গীতাঞ্জলি' বিশ্বদেবতার চরণে কবির ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। অবশ্য মনে রাখা দরকার এই পর্বের কাব্যে ভক্তিভাব প্রবল হলেও তা কখনোই কবির কাব্যবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি বরং এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ে অপূর্ব কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিভার বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে কবি ধর্ম ও কাব্যের বিরোধ মিটিয়েছেন। আধ্যাত্মিক কবিরূপে এইখানেই রবীন্দ্রনাথের জয়। ভক্ত ও মরমী হয়েও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কবিই রয়ে গেছেন অথবা বলা যায় রোমান্টিক কবি থেকেও তিনি আধ্যাত্মিক কবি হতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকেরা 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' পর্বের অন্যান্য কাব্যগুলিকে কি চোখে দেখেন তা আমাদের আলোচ্য নয় এই পর্বের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রমনোভাবই আমাদের আলোচনার বিষয় সুতরাং সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক। বিজ্ঞানী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানিয়েছেন—

"নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন - আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।"[২]

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিত কাব্য নৈবেদ্য যে বিশ্বদেবতা সার্থক করে তুলেছেন—

বিশ্বকবি অভিধা লাভ করার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু জগৎ পিতার আগেই রবীন্দ্রনাথের পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব, যাঁর শ্রীচরণ-কমলে এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে তিনিও যে কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন সেই খবরটি দেওয়া দরকার। অবশ্য এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা পরোক্ষ প্রমাণ, জীবনীর তথ্য অপেক্ষা আত্মজীবনীর স্মৃতির উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

"একবার মাঘোৎসবে (১২৯৩ মাঘ ১৮৮৭ জানুয়ারী) সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান - 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের সাতাশ বছরের রচনা শ্রবণে মহর্ষি যদি এতটা পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন তবে চল্লিশোর্ধ কবি পরিণত প্রতিভার সহায়তায় যে গান রচনা করেছিলেন সেই কবিতা শতক যে তাকে কি পরিমাণে পরিতৃপ্ত করেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ সাহিত্য হিসাবে ব্রহ্মসঙ্গীত অপেক্ষা 'নৈবেদ্যে'র কবিতার উৎকর্ষ যে আরও বেশী তাতে সন্দেহ কি।

'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলিকে কবি নিজে কি চোখে দেখতেন তার পরিচয় আছে বিলাত প্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লেখা একখানা চিঠিতে। কবি লিখেছেন -

"আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে 'নৈবেদ্য' বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত

অনুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল—তাঁর কাছে নির্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে যদি কর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপতে দেব—বোধহয় তুমি ইংলণ্ডে থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজ্‌বে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে ?"[৪]

কর্মকোলাহলের মধ্যে সংসারের শতকর্মে রত থেকে কখনও স্নানের ঘরে কখনও গোলমালের মধ্যে যে কবিতাগুলি তিনি রচনা করেছেন সেগুলো কেবলমাত্র কবিতাই নয়, বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবির ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিও বটে। এই গানগুলি রচনার মধ্যেই কবির প্রাণের যথার্থ আনন্দ এই—গীতি কবিতাগুলি লিখেই তাঁর সুখ। কবির মনে এই সময় যে প্রশ্ন জেগেছে তা তার ভবিষ্যতের আলোকময় সম্ভাবনার পূর্বগামিনী ছায়ার মত আবির্ভূত হয়েছে বলা চলে। 'ভারতবর্ষের নির্জন দেবালয়ের এই গানগুলি' কর্মমুখর ইংলণ্ডের রসিক ব্যক্তিদের কানে কোন সুরে বাজবে 'নৈবেদ্য' রচনার সময় থেকেই এমন একটা ভাবনা কবির মনে এসেছিল। এই ভাবনাই কিভাবে চেষ্টার আকার নিয়েছিল তার ইতিহাস 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনায় পাওয়া যাবে।

'নৈবেদ্য' সম্পর্কে কবির মনোভাবের কথা আরও পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আরম্ভকালের পরিচয় দিতে গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার আলোচনা প্রসঙ্গে। কবি লিখেছেন—

"এমন সময় (১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাইনি। বস্তুত এর অনেককাল পরে এই-সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এক জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে

সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেই রকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রাক্কালে তাঁর ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধে পত্রের দ্বারা তাঁকে সংবর্ধিত করেছিলেন তাঁর প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৪৬ দ্রঃ) আর তাঁর কবিজীবনের মধ্যভাগে প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রপ্রতিভার মহত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন সর্বপ্রথম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্রিকার সম্পাদকীয় আলোচনায় (১৯০০ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যা) তিনি রবীন্দ্রনাথকে "দি ওয়ালড্ পোয়েট অব্ বেঙ্গল" অর্থাৎ বিশ্বকবি বলে সংবর্ধিত করেন। এই রচনা প্রকাশের এগার মাস পরে ৩১শে জুলাই ১৯০১ তারিখের 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় নরহরি দাস এই ছদ্মনামে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। সেই সমালোচনাপাঠে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীত হন। রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' সম্বন্ধে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবি রাখবেন না বলেছিলেন কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের সমালোচনা তাঁর সে প্রতিজ্ঞা রাখতে দিল না। ব্রহ্মবান্ধবের বিশ্বকবি আখ্যাকে সার্থক করে তুলতে নিজের অজ্ঞাতসারেই কবি যেন মনে মনে আপন কবিতার ইংরেজি অনুবাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে আমরা তাঁর এই সুপ্ত ইচ্ছার পরিচয় পাই।

সে যাই হোক, আমরা বলেছি 'নৈবেদ্য'—কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের পরিচয় আছে। এই ধর্মবোধটি কি এবং কেমন করে তার জাগরণ হল 'আত্মপরিচয়ে' কবি নিজেই সেই কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে 'নৈবেদ্যে'র দুটি সনেট (৪৬, ৪৭) উল্লেখ করেছেন—

"বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্।... এই শিবকে জানার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যর দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে :

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরস রাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি

এই বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়ে কবি পরবর্তী সনেটে প্রার্থনা করলেন—

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

সংসারের সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অবহেলা করে বৈরাগ্য সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ কিংবা স্বর্গের আনন্দলাভ কবির কাম্য নয়, 'সংসারকে বিশ্বাস করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি', 'জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন।' আবার শুধু সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্য দিয়েই নয়, সুখ দুঃখ ভালোমন্দ আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের মুক্তির পথে অগ্রসর করে দিচ্ছেন। সংসারের মধ্যে থেকেই মুক্তির সাধনা করতে হবে। সংসার বিবক্তির ধারণা, দুঃখকে পরিহার, সুখ ও আরামের প্রতি আকর্ষণ—কবির মুক্তি সাধনার পথ নয়, তাঁর জীবনের ভাবমন্ত্রটি 'কড়ি ও কোমলে'র "প্রাণ" কবিতায় যা একভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই 'নৈবেদ্যে' আর একভাবে প্রকাশ পেয়েছে—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়" কবিতায়। জীবনের সমস্ত রস আস্বাদন করে পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা—একেই কবি মুক্তির সাধনা বলেছেন। 'জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ' সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।' কবির মুক্তি সাধনার এই মূল তত্ত্বটি 'নৈবেদ্যে'র ৩০ নং কবিতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর একটি কবিতায় (৪৪) কবির ধর্ম সম্বন্ধে ধারণার কথা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে বলে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সেই কবিতাটিও উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে কবি বলেছেন—

সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে,
কিন্তু তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়

এইজন্য

কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

'ক্ষণিকা'র "সমাপ্তি" কবিতার সুরেই এই কবিতার পরিসমাপ্তি—

পথে যতদিন ছিনু ততদিন অনেকের সনে দেখা,
সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই আস্তিক্যবোধ ও ঈশ্বরের পদে গভীর আস্থা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবির ধর্ম সম্পর্কে এটাই চরমতম বাণী। 'নৈবেদ্য-খেয়া ও গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনের এই ধর্মবোধ ও ঈশ্বরবোধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেত—এ কথা কবি নিজেও স্বীকার করেছেন, কারণ 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে কবির ধর্মবোধেরই ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু 'আত্মপরিচয়'-এ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

"যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম-ব্যাখ্যা করেছি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয় সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"

'নৈবেদ্যে' কবির আত্মপরিচয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ—এখানেও বাইরের শোনা কথা—ঔপনিষদিক শিক্ষা, ব্রাহ্মমন্ত্রে নিষ্ঠা, সর্বোপরি পিতৃদেবের জীবনসাধনা ও ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানের প্রভাব কবির কথাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, তবু কবি এখানে নিজের অন্তরতম কথা অনেকখানিই বলতে পেরেছেন বলে আমাদের মনে হয়।

'নৈবেদ্য' গ্রন্থে ঈশ্বরানুভূতির কথা ছাড়াও কতকগুলি কবিতায় কবির দেশাত্মবোধের কথা আছে। 'নৈবেদ্যে'র যে অংশ 'স্বদেশ ও সংকল্পের' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা স্পষ্টতঃ স্বদেশপ্রেমের বাণী বহন করে জাতীয় জীবনের উদ্‌বোধনে সহায়ক হয়েছিল। অবশ্য স্বদেশ ও স্বদেশ-মহিমা সম্বন্ধে যে কবিতা-গুলিতে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে—তাদের প্রায় সবকয়টি কবির মহান অধ্যাত্ম আদর্শের সঙ্গে জড়িত। কবির স্বদেশচেতনা যে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা থেকে পৃথক নয় আর 'নৈবেদ্য' কাব্যের অধ্যাত্ম সাধনার উৎসমূলে যে আছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদ' তাতে সন্দেহ নেই। কবির স্বদেশপ্রেমের ধারণাও প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক আদর্শবাদের দ্বারা পরিশোধিত সে-কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কবির অনুমান—সেই আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েই আজ ভারতবাসী আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 'নৈবেদ্যে'র ৮০ সংখ্যক সনেটে কবি সেই কথাই বলেছেন। অষ্টকে উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোক 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঋষিকে কবি বলেছেন—

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃত-বার্তা।

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্যপথ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবাদে ব্রাহ্ম মতবাদের প্রভাব থাকলেও 'নৈবেদ্যে'র ঈশ্বর-ধর্মিতা যেমন সর্বাস্তিক গভীর, সকল ধরণের উপাসনা ক্ষেত্রেই তা প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনি কবির স্বদেশপ্রেম ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হলেও সর্বমানবের মঙ্গল চিন্তাতেই তার পরিণতি ঘটেছে। এইভাবে 'নৈবেদ্যে' একধারে কবির ব্যক্তিগত আদর্শ, জাতীয় আদর্শ এবং মানবীয় আদর্শ—এ তিনেরই সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু এই সমন্বয়ের সূত্র কবি নিজে কোথাও ব্যাখ্যা করে বুঝাবার চেষ্টা করেন নি। কেবল 'নৈবেদ্যে' বিশ্বদেবতার যে পিতৃরূপের পরিচয় আছে স্থানে স্থানে তারই আভাস দিয়েছেন। কবি উপনিষদের সেই 'ওঁ পিতা নোঽসি'র ব্যাখ্যাই যেন 'নৈবেদ্যে'র কবিতায় করেছেন।

স্মরণ (কাব্যগ্রন্থাবলী : ১৯০৩)

পরিণত বয়সে "সঞ্চয়িতা"য় আপনার কাব্য সংকলনের মাধ্যমে কবিজীবনের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে আগে যে কবিতাটি স্মরণ করেছেন তা মৃত্যুবিষয়ক, 'ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী'র "মরণ" কবিতাটি। এই কবিতায় কবির অপরিণত প্রতিভা মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণার যে আভাস দিয়েছে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যে সেই ধারণারই সমর্থন মিলছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা মূলতঃ ভারতীয় দর্শন চিন্তারই অনুবন্ধী। উপনিষদের মৃত্যুদর্শনই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন। মানুষ যে মৃত্যুর ভয়ে ভীত, মর্ত্য-প্রেমিক কবিদের কণ্ঠে যে মৃত্যুর কথা ভেবে বাষ্পগদ্গদ সেই মৃত্যুকেই রবীন্দ্রনাথ 'শ্যাম সমান' বলে স্বেচ্ছায় তাঁর কণ্ঠলগ্ন হতে চেয়েছেন। তিনিও জীবনকে ভালবাসতেন আর বাসতেন বলেই মৃত্যুকে জীবনের শেষ পরিণাম মহাশূন্য বলে বিশ্বাস করতেন না। উপনিষদের আদর্শে বিশ্বাসী এই কবি জানতেন মৃত্যু দৃশ্যতঃ

থাকলেও কার্যতঃ নেই। মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণতা বলে তিনি মানতেন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সঙ্গতি স্থাপনের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের দেবতা যিনি মরণের দেবতাও তিনিই। 'চিত্রা'র "সিন্ধুপারে" কবিতায় মরণের পরপারে গিয়ে কবি সেখানেও জীবন-দেবতারই দর্শন পেয়েছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির মৃত্যু-বিষয়ক যে ধারণার প্রকাশ হয়েছে তা ভারতীয় দর্শনেরই অনুরূপ—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথা দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

কিংবা স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

কিন্তু তত্ত্বগতভাবে মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্র মনোভাব যাই হোক ব্যক্তিজীবনে কবি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি পরিচয় পেলেন, 'নৈবেদ্য' রচনার অব্যবহিত পরবর্তী-কালে যখন কবির স্ত্রী বিয়োগ ঘটল, তখন সেই মৃত্যুশোকের অভিঘাত কবির চিত্তে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কবির জীবনে চব্বিশ বৎসর বয়সে যে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ঘটেছিল পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'জীবন-স্মৃতি' রচনাকালে সেই অভিজ্ঞতা ও কবিমনে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয় কবি নিজেই দিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা কবিকে না ভেঙে গড়ে তুলতে কিভাবে সাহায্য করেছিল 'কড়ি ও কোমল'-কাব্যের আলোচনায় তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে কবির কাব্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস জমাট হয়ে কাব্যের তাজমহল গড়ে তুলবে আমরা এইরকমই একটা প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু 'স্মরণ' কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের শোক দুঃখের তীব্রতম ব্যথাকে অগ্রাহ্য করবার যে মনোভাব লক্ষ্য করা গেল তাতে আশ্চর্য হতে হয়। "কবির ব্যক্তিগত শোকে তাঁহার সমস্ত উদ্গত অশ্রুধারাকে গ্রহণ ও গ্রাস করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অনুশীলিত জীবনদর্শন প্রস্তুত হইয়াই ছিল।"[৬]—সমালোচকের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করার আগে দেখা দরকার এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কবিমনে সত্যসত্যই কি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবিহৃদয়ে যে গভীর আঘাত হেনেছিল, কবি

আজীবন যে বিচ্ছেদ বেদনাকে মনে মনে লালন করে চলেছিলেন হয়তো 'এই শোক তাঁকে গভীরতর কোনো সত্যের সন্ধান দেয় নি।'[৭] কিন্তু কবির কাছে এই শোক পত্নীবিচ্ছেদ-বেদনা অপেক্ষা যে কত সত্য, কত বাস্তব, কত গভীর ছিল তা 'মৃত্যুশোক' (জীবনস্মৃতি) 'প্রথম শোক' (লিপিকা) 'পুষ্পাঞ্জলি' (ভারতী ১২৯২ বৈশাখ) প্রভৃতির পাশে 'স্মরণ' কাব্যের কবিতাগুলি রাখলেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে কবির যে চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল নিজ স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর চিত্তের নির্লিপ্ততাকে তেমন বিঘ্নিত করতে পারে নি। পত্নীশোককে কবি যেরকম অনায়াসে অনন্তের পটভূমিকায় স্থাপিত করে তাকে দার্শনিক প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত করেছেন তাতে মৃত্যুর তত্ত্বরূপ উঁকি দিলেও পত্নীবিয়োগের মর্মান্তবিদারী চরম অভিজ্ঞতার পরিচয় তেমন পরিস্ফুট হয় নি।

'স্মরণ'কাব্য খানি পত্নীবিয়োগের প্রতিক্রিয়ায় রচিত হলেও স্পষ্টাক্ষরে পরলোকগতা পত্নীর নামের সঙ্গে গ্রন্থখানি যুক্ত হয় নি, গ্রন্থসূচনায় মৃণালিনী দেবীর লোকান্তরপ্রাপ্তির তারিখের উল্লেখ আছে মাত্র ৭ই অগ্রহায়ণ ৩০৯। কবির শোকের গভীরতার করুণ সুন্দর সংযত বহিঃপ্রকাশ বলে একে মনে করলে হয়তো ভুল হবে না এবং সেক্ষেত্রে মনে হতে পারে ৭ই পৌষ কবির দীক্ষার দিনটির মতো ৭ই অগ্রহায়ণও কবির জীবনে চিরস্মরণীয় হয়েছিল। কিন্তু ৭ই পৌষকে কেন্দ্র করে কবির যত বিচিত্র ভাব ও ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে ৭ই অগ্রহায়ণ তেমনভাবে কবির চিত্তে সাড়া জাগাতে পারেনি। আবার আমরা আগেই দেখেছি কাদম্বরীর মৃত্যুশোক কবিকে যেভাবে নানা গদ্য পদ্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুশোক তাঁকে সেভাবেও উদ্বুদ্ধ করে নি। কবির বয়োধর্মের মধ্যেই হয়তো এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে কবির বয়স চব্বিশ বৎসর আর পত্নীবিয়োগের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একচল্লিশ বৎসর। সুতরাং কবিমনে এই দুই শোকের আঘাতের তারতম্য ঘটতে পারে। কবি 'জীবন স্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে বলেছেন—

"শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই।"

তাই সেদিনকার দুঃসহ আঘাত কবির সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছে—'পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' কিন্তু পরিণত বয়সে পাওয়া পত্নীর মৃত্যুশোক কবির জীবনে সেইরূপ কালো ছায়া ফেলতে পারে নি। বয়সের পরিণতিতে এটাই তো স্বাভাবিক। আরও পরবর্তীকালে পাওয়া শোকের আঘাত সম্পর্কে কবির এই প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু, কিংবা দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের আকস্মিক বিয়োগ ব্যথাকে কবি এমনই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে নিয়েছিলেন। আসলে এই সহ্য শক্তিটা পরিণত বয়সের দান। একচল্লিশ বছরের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক চব্বিশ বছরের কাছে সেটা প্রত্যাশা করা উচিত হবে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির আত্মসংযমের শক্তি যেমন বেড়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর জীবনব্যাপী সুতীব্র দুঃখতাপের মধ্যে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। সংসারের নানা অভিঘাতেও তিনি অবসাদগ্রস্ত হন নি—তিনি বরং আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠেছেন—

'আরো আঘাত সইবে আমারো'

কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সে পাওয়া কাদম্বরীর মৃত্যুশোক কবিকে এতদূর পর্যন্ত ব্যাকুল করেছিল যে "সেই সময়ে আবার কিছু কালের জন্য আমার একটা সৃষ্টি ছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল।"

মৃণালিনীর মৃত্যুশোক তাঁকে এমন কোনও মহত্তর সত্যের সন্ধান দিয়েছিল, কিংবা সেই সত্যে তাঁর প্রত্যয়কে দৃঢ় করেছিল যার ফলে মৃতপ্রিয়ার জন্য কবির শোকাভিভূত চিত্তের ব্যাকুলতার প্রকাশ অত্যন্ত সংযত হয়েছে। 'স্মরণ' কাব্যের প্রথম কয়েকটি কবিতায় সেই ব্যাকুলতার কিছু পরিচয় থাকলেও ব্যক্তিগত বেদনা থেকে নূতন লোকে উত্তরণের প্রয়াসই এখানে লক্ষণীয়। কবিচিত্তের এই উত্তরণ, গৃহলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মীতে উদ্বর্তনের মাধ্যমে কবির বিয়োগ বিধুর চিত্তে সান্ত্বনা লাভের যে চেষ্টা 'স্মরণে'র কবিতায় দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনের পরিচয় দিলেও তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের সংবাদ অতি অল্পই দেয়। 'নৈবেদ্যে'র কবির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক হলেও পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে কবির ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর পরিচয়টাই আমরা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু "যে শোক যে দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অন্তরগত তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতেই তিনি অভ্যস্ত ; যেখানে যতটুকু ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া

পড়িয়াছে ততটুকুর প্রকাশই কবির রচিত সাহিত্যে ও জীবনের বাহিরের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে, তাহার বেশি নয়, এবং সেখানে ব্যক্তিগত শোক দুঃখ সহজে ধরা পড়িতে চায় না এবং ধরা পড়িলেও তাহার গভীরতা পরিমাণ করা যায় না।"[৮] সমালোচকের এই উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকারের একটি মন্তব্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"তিনি কখনো নিজের দুঃখ শোককে অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে শোকের অপমান মনে করিতেন; তাই অতি বেদনার সময়েও তাঁহাকে কর্মে নিরত থাকিতে দেখিয়াছি। তাঁহার বেদনাকে তিনি অন্যের কাছে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিয়া বেদনার গুরুত্বকে হ্রাস করিতে চাহিতেন না।"[৯]

সমালোচকদের এই সব মন্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করেও বলা চলে তাঁদের উক্তি উত্তর-চল্লিশ রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে যতটা সত্য চব্বিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ততটা নয়। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকারোক্তিতেই তার প্রমাণ। পত্নীবিয়োগের শোককাতরতা প্রকাশ করে কাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়। রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্যখানির নাম এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে। কাব্য হিসাবে গ্রন্থখানি হয়তো কিছুটা কাঁচা, কাব্য-রসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের সঙ্গে তার তুলনা ঠিক হবে না, কিন্তু মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা, তীব্রতম শোক ব্যথার প্রকাশ সেই কাব্যে যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যে তার অভাবটা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। কবি মনের সান্ত্বনাহীন বেদনার কথা বরং 'উৎসর্গে'র ৩১ সংখ্যক কবিতায় অনেকখানি সার্থক রূপ লাভ করেছে। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে কবির জীবনে কি নিদারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আপনার বেদনার কালিমায় সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন ক'রে কবি কিভাবে ব্যক্তিগত বেদনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তার পরিচয় আছে এই কবিতায়। একমাস ধরে অসুস্থ স্ত্রীর যিনি অহোরাত্র সেবাযত্ন করেছেন, নার্স না রেখে নিজেই অক্লান্তভাবে যাঁর নার্সিং করেছেন, সেই স্ত্রীর মৃত্যুতে কবিমন ভেঙে পড়ারই কথা। সর্বলোকের সামনে নিজের সেই গভীরতম দুঃখকে প্রকাশ করে লজ্জা দিতে তিনি চান নি, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত শোকই যে সাময়িকভাবে কবির কাব্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল তার প্রমাণ আছে ঐ কবিতায়। নচেৎ নিজের দুঃখকে সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে সমস্ত বিশ্বব্যাপীরূপে দেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যে কবি কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লিখেছেন—

"শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি।"[১০]

সেই কবিই ঐ কবিতায় কেঁদে বলেছেন—

"আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা—
আজি কোনো দিকে তিমির প্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।"

আশ্চর্যের কথা 'স্মরণ' কাব্যে কবিমন অসাধারণভাবে নির্লিপ্ত। এ বিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"কবিমনের নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তি সত্তার অবদমন বিষয়ে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য কবি ও সমালোচকের যে-অভিমত তাহাই এখানে অভাবনীয়রূপে উদাহৃত। বিশ্বজীবনের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিগত ভাব-জীবনের প্রবলতা কিছু পরিমাণে বিসর্জন দিতে হইবে। নিখিলের প্রাণ তরঙ্গকে ব্যক্তি-আত্মার গভীরে অবাধ প্রবেশাধিকার দিলে সেই স্রোতে আত্মজীবনের আংশিক নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রাকে বিশ্ব-কেন্দ্রিক করিতে হইলে অহং-জীবনের সঙ্কোচ উহার একটি অপরিহার্য সর্ত। কাজেই কবিসত্তার স্বভাবমুক্ত প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ জীবনদর্শন উভয়ের সম্মিলিত প্রভাব তাঁহার শোকের তীব্রতা হ্রাস ও রূপান্তরে সহায়তা করিয়াছে। তিনি সহজেই দুঃখের ঘন সম্মোহ ভেদ করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত আবেগের স্রোতস্বতীকে নিখিল প্রাণসমুদ্রের বৃহত্তর আধারে বিলীন করিয়া দিয়াছেন। শেলি ও টেনিসন তাঁহাদের শোকগাথায় যে হৃদয় চাঞ্চল্যকে অতি সচেতন দার্শনিক সান্ত্বনায় স্তব্ধ করিয়াছেন ও দীর্ঘকালের ভাবরোমন্থন প্রক্রিয়ায় প্রশান্ত আনন্দে পরিণত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা এক মাসের মধ্যেই সাধন করিয়া তাঁহার চিত্ত গঠনের অনন্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। কবির বহির্জীবনে যে কবির অন্তরস্বরূপকে ধরা ছোঁয়া যায় না, যে মানুষটিকে মরজীবনের আধি-ব্যাধি, শোক দুঃখ, স্তুতি-নিন্দা বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপায় তিনি যে কাব্যজগতে সমস্ত ক্ষণ-দুর্বলতার অতীতরূপে, বিশ্ববিধানের স্থির, অকম্পিত প্রত্যয়ে শক্তিমান হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দময় সত্তার অংশরূপে প্রতীয়মান হন—এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ, পরীক্ষিত সত্যরূপে 'স্মরণ'-এর কবিতাগুচ্ছে রূপ ধারণ করিয়াছে।"[১১]

কবিমনে কবি-পত্নীবিয়োগের প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সুধী সমালোচক রবীন্দ্র-কবিমানসের নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিসত্তার অবদমন বিষয়ে উপরে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তার সার্থকতা বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলেও 'স্মরণ' কাব্যের এমন অপূর্ব ও যথার্থ ব্যাখ্যা আর হয় না। উপরের উদ্ধৃতির শেষাংশে সমালোচক কার্যতঃ কবির উৎসর্গ কাব্যের ২১ সংখ্যক কবিতার সার সংক্ষেপ করেছেন—এ কবিতাটি কবির নিজেরই কথা সুতরাং আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকও বটে। কবি নিজেই বলেছেন—

'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।'

বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ কবির জীবনচরিত তাঁর কবিজীবনী হতে পারে না, তা জীবনের ঘটনাগুলিকে মাত্র লিপিবদ্ধ করে রাখে কিন্তু কবি-মানসটিকে ধরে দিতে পারে না, তাঁর সুখ-দুঃখ শোক-ব্যথার বিবরণ সেখানে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু সেই সুখ দুঃখ শোক আনন্দ তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সে কথা জীবনীকারের আয়ত্তগত নয়।

সে যাইহোক, মৃত্যুতত্ত্ব বিষয়ে কবির যে দার্শনিক প্রত্যয় 'স্মরণ'-এর কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে তা আগে থেকেই কবির মনে গড়ে উঠেছিল। পত্নীবিয়োগের মাস চারেক আগে ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'মরণ' (উৎসর্গ-৪৫) কবিতায় মৃত্যুর যে ঐশ্বর্য মূর্তি কবি এঁকেছেন এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অসুস্থ পত্নীর শয্যাপার্শ্বে তাঁর শুশ্রূষার কবি কর্তৃক রচিত এই কবিতায় কবিজায়ার মৃত্যুসম্ভাবনার পূর্বগামিনী ছায়াপাতই শুধু লক্ষ্য করা যায় না, সেই সঙ্গে মৃত্যুরূপী শিবের প্রতি কবির অপূর্ব ভালবাসার পরিচয়ও পাওয়া যায়। মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে শ্যাম সমান আবার তিনিই শিব-সুন্দর। শ্যামের মধ্যে মৃত্যুকে আবার মৃত্যুর মধ্যে শিবকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মৃত্যুর স্বরূপ সন্ধানে তাঁর আগ্রহের কথা সহজেই অনুমেয়। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থেও কবি মৃত্যুতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সুচির পোষিত দার্শনিক ধারণার পরিচয় দিয়েছেন সেকথা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং কবি-পত্নীর মৃত্যু নূতন কোনও গভীরতর সত্যের সন্ধান দিয়েছিল কিংবা ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বজনীন করে তুলতে পত্নীর মৃত্যু অপরিহার্য ছিল এমন কথা হয়তো নিশ্চয় করে বলতে পারি না কিন্তু এই সময় থেকেই 'আর্টিস্ট' রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন

সে কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। 'আর্টিস্ট' হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উর্ধ্বে উঠেছেন।

শিশু (কাব্য-গ্রন্থাবলী : ১৯০৩)

পত্নীবিয়োগের দুঃসহ বেদনা বুকে নিয়ে অসুস্থ মধ্যম কন্যার শুশ্রূষার জন্য কবি তাকে নিয়ে যান আলমোড়া। নানা কারণে মন তাঁর শ্রান্ত। ঠিক এই সময়ে মোহিতচন্দ্র সেন-এর সম্পাদনায় 'কাব্যগ্রন্থ' ছাপা হচ্ছিল। সম্পাদক কাব্যগ্রন্থে একটা শিশুখণ্ড জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের সমর্থনে কবি তাঁকে জানান,—

"গ্রন্থাবলীতে একটা 'শিশুখণ্ড' জুড়ে দেবার যে প্রস্তাব করেছেন সে অতি উত্তম। আপনি তার যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে "নদী" কবিতাটি দেখলুম না। "কাগজের নৌকা" বলে একটি কবিতা মুকুলে দিয়েছিলুম—বহুদিনের কথা। সেটা জগদীশের (জগদীশচন্দ্র বসু) সাহায্যে উদ্ধার করে এর মধ্যে দিতে পারেন। আপনার ভূমিকায় একটু বলে দেবেন যে "শিশু" খণ্ডের কবিতা সবগুলিই যে শিশুদের সম্বন্ধে তা নয় কতকগুলি শিশুদের পাঠ্য। "বালক" কাগজে "শীতের বিদায়" বলে একটি শিশুপাঠ্য কবিতা প্রকাশ করেছিলেম। তা ছাড়া 'পুরাতন বট' বলেও একটা ছিল। সেটা কিন্তু ছেঁটেছুঁটে দেওয়া দরকার।

গ্রন্থাবলীর যে অংশে ছেলেদের কবিতা দেবেন তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে "কিশোর" বা "কুমার" নাম দেবেন। কারণ শিশু অতি ছোট—সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না।"[১২]

শেষ পর্যন্ত কবি অবশ্য নামকরণের ভার সম্পাদকের উপরেই ছেড়ে দেন। শিশুমনের রহস্য সম্পর্কে কবির ঔৎসুক্য বরাবরেরই। মোহিতচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে এবং তৎকালীন মানসিক অশান্তি ভুলতে স্মৃতির দুয়ার খুলে কবি শিশুর কল্পনারাজ্যে মানসপ্রয়াণে উৎসাহিত হলেন। 'শিশু' খণ্ডে প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতাই কবির পূর্বরচিত 'ভারতী', 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'মুকুল', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত, রচনাকালের দিক থেকে তাই 'শিশু' খণ্ডে প্রকাশিত কবিতাবলী ১২৮৭ সাল থেকে 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশের কাল অর্থাৎ ১৩১০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অবশ্য আলমোড়া বাসকালে ৪ঠা শ্রাবণ থেকে ৩১শে শ্রাবণ ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত ৩১টি নতুন কবিতাই 'শিশু'

কাব্যের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অংশ—মা ও ছেলের যুগ্ম দৃষ্টিতে প্রতিভাত ভাবজগতের বর্ণনাই এখানে কবির প্রধান উপজীব্য। এই অংশের কবিতা রচনার প্রেরণা সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

"আলমোড়াতে যখন তাঁকে (মেজ মেয়ে রেণুকা) চেঞ্জে নিয়ে যাই, তখন তার অসুখ খুব বেশী। তাকে খুশি রাখবার জন্যে রোজ রোজ কবিতা লিখে বিছানার পাশে বসে শোনাতুম, যাতে কিছুক্ষণও অন্ততঃ রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকে। এমনি করেই আমার শিশু বইখানা লেখা হয়েছে—ও কবিতাগুলো রাণীর অসুখের সময় লিখেছিলুম।"[১৩]

বাস্তবিকই তাই। পীড়িতা কন্যা ও মাতৃহীন শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথকে মাতা ও পিতার স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে গিয়েই এক একটি করে 'শিশু'র ৩১টি কবিতা লেখা হয়েছিল। শিশু পুত্র কন্যার সঙ্গে শিশু হয়ে শিশুর মনের ভিতরে বাসা বেঁধে লেখা এই কবিতাগুলিতে কবি আপনার শৈশব স্মৃতিকেই বারবার স্মরণ করেছেন। কবি নিজেই সেকথা মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা পত্রে জানিয়েছেন—

"যতই লিখছি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে।"[১৪]

তাই 'শিশু'কাব্যগ্রন্থটি একদিকে যেমন বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্য দিকে তেমনি এই কাব্যখণ্ডটির প্রতি কবিরও একটা বৎসলতার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'শিশু'র সব কবিতা এক করে একটি সম্পূর্ণ কাব্যগন্থ বসজ্ঞ পাঠকদের কাছে নিবেদন করবেন কবির এইরকম একটা ইচ্ছা ছিল। তাই 'বঙ্গ-দর্শনে'র পাতায় 'শিশু'র একটি কবিতা মুদ্রিত হতে দেখে কবি আলমোড়া থেকে মোহিতচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখলেন,—

"শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গ-দর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তা হলে শুকিয়ে মারা যাবে—এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিস—হাটবাটের জিনিস নয়।"

সপ্তাহকাল আগে লেখা আর এক পত্রে কবি লিখেছেন,

"এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে—শৈলেশকে এই কথা আপনি বুঝিয়ে বলবেন। বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে

খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়। ছেলেদের হাতে যে পুতুল দেব আগে থাকতেই যদি তার রং উঠে কাপড় ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় তবে সে কি সঙ্গত হবে?"[১৫]

এই ব্যাপারে জনৈক রবীন্দ্রকাব্য সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"অনেক সময় দেখা গিয়াছে নিজের সম্পাদনায় বা তত্ত্বাবধানে কোন 'কাগজ' না থাকিলে (সময় বিশেষ, থাকিলেও) রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিতেন যে তাঁহার রচিত আন্-কোরা নূতন কবিতাগুলি একেবারেই গ্রন্থে প্রকাশ লাভ করে। অনেক সময় রচনাও এমন দ্রুত হইত, ধীরে সুস্থে সাময়িক পত্রে ছাপিবার অবসর থাকিত না বা বিলম্ব সহিত না।"[১৬]

সে যাই হোক, 'শিশু'র কবি রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য কবিতা লিখবার সময় নিজের শৈশবস্মৃতিচারণে মনোনিবেশ করলেন—এর কারণ কি? কবি চিঠিপত্রে সেই কারণটিও বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রৌঢ় বয়সে রচিত 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যে কবিকে শৈশব-যৌবনের স্মৃতির জগতে বিচরণ করতে দেখা যায়—এখানেও যেন কবিব মনে পড়েছে, একদিন তাঁর 'যেমন খুশির ব্রজধামে ছিল বালগোপালের লীলা।'

আসলে প্রত্যেক মানুষেরই মনের ভিতরে আছে শিশুর কল্পনার জগৎ যে জগতে প্রবেশ করতে পারলে সংসারের দায় দায়িত্বের বোঝা ক্ষণেকের জন্যেও ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখা সম্ভব, শোক দুঃখ যতই তীব্র হোক সমস্তই জীবনের লীলার সঙ্গে মিশিয়ে উপভোগ করা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ ঐ কল্পনার জগৎ, সান্ত্বনার জগৎ থেকে দূরে সরে আসে, কিন্তু শৈশবের ঐ খেলার জগতের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করে। কবি সাহিত্যিকদের কল্পনা শক্তি সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী বলে তাঁরা অতি সহজেই ঐ কল্পনার রাজ্যে মানসপ্রয়াণ করতে পারেন। 'শিশু'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ শিশুজীবনের সেই মুক্তলীলাই আস্বাদন করেছেন এবং পাঠককেও তার আস্বাদন দিতে চেয়েছেন। পত্নীবিয়োগ এবং সদ্য কন্যাশোক থেকে, বিশ্ব-ভারতীর সমস্যা হতে মনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কবিকে শিশুর মনোরাজ্যেই প্রবেশ করতে হয়েছে।

একথাও আমাদের অজানা নয় যে, কবি শৈশবে 'ভৃত্যরাজতন্ত্রে' মানুষ হয়েছেন। মা ও ছেলের স্নেহমধুর সম্পর্কের স্বাদ যথেষ্ট পান নি। মা ও ছেলের যে মধুর জগৎ কবির কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু বাস্তবে যার দর্শন কবি কদাচিৎ পেয়েছেন

সেই জগতেই স্বপ্নপ্রয়াণ করেছেন কবি 'শিশু'র কবিতায়। শিশুর সঙ্গে মাতৃমনের নিগূঢ় সম্বন্ধের যে চিত্রগুলি 'শিশু'কাব্যে তিনি এঁকেছেন তা কবির নিজের মনে আবাল্য পোষিত কতকগুলি মধুর চিত্র—আপন সন্তানের সঙ্গে সন্তানের মায়ের স্নেহমধুর সম্পর্কের ভিতরে কবি হয়তো সেই ছবিগুলিই দেখে নিতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে কবির একটি পত্রাংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করা চলে। 'শিশু'র কবিতায় খোকার কথাই আছে খুকীর স্থান নেই কেন মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে কবি মোহিতচন্দ্রকে লেখেন—

"আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে তার একটি প্রধান কারণ এই, যে-ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের প্রতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছি তাই তার লেখনীর সম্বল---খুকীর চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে—খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃ-শয্যার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্রনাথ) তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"[১৭]

কবিপত্নীর মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র আট বৎসর। সেই মাতৃহীন শিশু সন্তানকে একাধারে মাতা ও পিতার স্নেহ দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলেন কবি। তাঁর মনে তখনও উজ্জ্বল ছিল গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—মাতৃশয্যার পার্শ্বে একচ্ছত্র অধিপতি শিশু শমীন্দ্রের স্নেহমধুর সম্পর্কের আদান-প্রদানের কথা। শিশুচিত্র অঙ্কনে আপনার শিশু পুত্রই কবির আদর্শ ছিল এবং আত্মজের ভেতর দিয়ে আপন বাল্যস্মৃতির অপরিতৃপ্ত সাধ আহ্লাদের কথাও কবি স্মরণ করেছেন। শৈশব জীবনের সেই মাধুর্যের আস্বাদ করে শিশু স্নেহ 'কেন মধুর' এই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজেছেন কবি। এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন সুন্দর ও মধুর জিনিস দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই তখনি বুঝতে পারি আমাদের জন্য জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত—ওর কোনো তাৎপর্য পাওয়া যায় না; কিন্তু আমাদের সব রকম ভালোবাসার উপলক্ষেই

সৌন্দর্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে উঠে। ভালোবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোনো অর্থই থাকে না—মধুর হওয়া—মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ—ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাহিরে। খাদ্য আমাদের কাছে মধুর না হয়েও ক্ষুধার জবরদস্তিতে খাদ্য হতে পারত—শব্দ আমাদের কাছে সঙ্গীত না হয়েও নিজের গায়ের জোরেই শব্দ হতে পারত—কিন্তু যার এত জোর আছে সে তার সমস্ত জোর লুকিয়ে মধুর হতে চায় কেন? ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপনে রেখে এমন কোমল এমন অপরূপভাবে ফুল হয়ে উঠ্‌চে কেন? আমরা যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই—মাধুরী দিই—মাধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য বুঝতে পারি।"[১৮]

এই তাৎপর্যের কথা কবি বৈষ্ণবের প্রেমধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্যত্র খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।"[১৯]

কিন্তু শিশু ও তার মায়ের সঙ্গ যত মাধুর্যমণ্ডিত হোক বেশীদিন সেই মাধুর্যের জগতে কবি কল্পনাকে বন্দী করে রাখতে পারেন না। এইজন্য শ্রাবণের শেষে 'শিশু'র কবিতাগুচ্ছেরও পরিসমাপ্তি হল। কবি ৩১শে শ্রাবণ ১৩১০ সালে একখানি পত্রে মোহিতচন্দ্রকে লিখলেন "বাস্ আর নয়। পিণ্ডি না দিলে যেমন ভূতের শান্তি হয় না তেমনি শেষের মত একটা কিছু না লিখলে আইডিয়া থামতে চায় না। ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত—একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল—এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না, পৃথিবীতে আবার আপিস আছে।"

'বিদায়' কবিতায় মৃত্যুর যে অভিনব অভিনয় খোকা মায়ের সঙ্গে করেছে তাতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকল্পনার যে পরিচয় আছে তা তত্ত্ব হিসাবে প্রশংসাযোগ্য,

কিন্তু ব্যক্তি খোকার অমরত্বের যে আশ্বাস এখানে দেওয়া হয়েছে বাস্তবে মাত্র তিন বৎসর পরে নির্মম সত্যরূপে কবির জীবনে যখন তার সাক্ষাৎকার ঘটল তখন কবির মনোভাব কেমন হয়েছিল তা জানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পত্নীর মৃত্যুর মতই পুত্র বিয়োগের দুঃখকেও কবি যেভাবে বুক পেতে গ্রহণ করেছিলেন তাতে কবির চিত্তের নির্মম নিরাসক্তির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। মৃত্যু সম্বন্ধে কবির প্রকৃত মনোভাব বুঝে ওঠা ভার।

সে যাই হোক, 'বিদায়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিশুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'খেয়া' কাব্যের গভীরতর অধ্যাত্মচেতনার রাজ্যে পাড়ি জমাতে চলেছেন।

কাব্য হিসাবে 'শিশু' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। শিশুর দুরন্তপনার স্নেহবিগলিত উপভোগ মাত্র এখানে কবির উপজীব্য নয়, সেই সঙ্গে মা ও ছেলের মনস্তত্ত্বে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয়ে অধ্যাত্মচেতনা-নিবিড় যে রহস্যরসের আস্বাদন আছে তাই এর অপূর্বতার কারণ। শুধু বাংলাভাষায় বা সাহিত্যেই এই জাতীয় গ্রন্থ দুর্লভ নয় বিশ্বের শিশু সাহিত্যে অর্থাৎ শিশুদের নিয়ে লেখা সাহিত্যে এই কাব্যগ্রন্থখানির উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে 'দি ক্রিসেণ্ট মুন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থপাঠে বিদেশী সমালোচকেরা উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং বিদেশী শিশুরাও আনন্দ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে কবি এক পত্রে মণিলালকে লিখেছেন—"মণিলাল, আমি শিশুর গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এঁদের খুব ভাল লেগেছে। রোদেনস্টাইনের ইচ্ছা অবন কিংবা নন্দলাল যদি গোটা তিনচার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন।"[২০]

উৎসর্গ (কাব্য-গ্রন্থাবলী : ১৯০৩)

'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের কাব্য-সম্পর্কে কবির বক্তব্যের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবির মন্তব্যের পরিমাণ যদিও সামান্য কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলীতে এই কাব্যগ্রন্থটির গুরুত্ব অসামান্য। রবীন্দ্রজীবনীকার এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন—

"তত্ত্বের দিক দিয়া সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতির ধারা যদি কোনো

একখানি কাব্যে সংহত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে 'উৎসর্গ'।"[২১]

'উৎসর্গ' কাব্যান্তর্গত কবিতাগুলি রচনার প্রেরণা ও ভাবতাৎপর্য জীবনী-কারের আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর বিবরণী পাঠে জানা যায়—মোহিত-চন্দ্র সেন যখন সূচনা থেকে 'শিশু' কাব্য খণ্ড পর্যন্ত সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ভাব তাৎপর্যমূলক নব-শ্রেণীবিন্যাস করে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ করছিলেন তখন তাঁরই অনুরোধে সাগ্রহে কবি তাঁর বিভিন্ন জাতীয় কবিতাবলীর ভাব প্রেরণার পরিচিতিস্বরূপ প্রত্যেকটি শ্রেণীর ভূমিকারূপে এক একটি প্রবেশক কবিতা লিখে দেন। কাব্যগ্রন্থাবলীর ২৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২৬ খণ্ডের জন্য কবি ২৬টি প্রবেশক কবিতা লিখেছেন দেখা যায়। 'স্মরণ' ও 'গান' এই দুখানি গ্রন্থের কোনও প্রবেশক কবিতা নেই। সবগুলি কবিতাই জীবনদেবতাকে স্মরণ করে লেখা এবং সমগ্র কাব্যরচনাবলীর প্রবেশক কবিতারূপে নির্বাচিত করে দেন 'চিত্রা' যুগের একটি গান 'আমাবে কর তোমার বীণা'। জীবনদেবতা তত্ত্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে বর্তমান গন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি জীবনদেবতা চেতনা ববীন্দ্র-কবিজীবনের কোনো একটি বিশেষ যুগের বিশেষ উপলব্ধি নয়—এটি সমগ্র রবীন্দ্র-কবিজীবনেরই মূল তত্ত্ব। কাব্যগ্রন্থাবলীর উৎসর্গ কবিতাগুলি আমাদের সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। এবং 'আমারে করো তোমার বীণা' গানটি কবি-জীবনে জীবনদেবতার স্থান সম্পর্কে অভ্রান্ত সংকেত বহন করছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত: আরও একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। কাব্য-গ্রন্থাবলীর যে দুই খণ্ড কাব্যের প্রবেশক কবিতা নেই বলেছি তার মধ্যে 'গান' খণ্ডের প্রবেশক কবিতা না থাকার হেতু বুঝা যায়, কিন্তু 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থখানির প্রবেশক কবিতা না লেখার কারণ কি? 'স্মরণ' কাব্য আলোচনাকালে আমরা 'উৎসর্গে'র ৩১ সংখ্যক কবিতাটির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের কথা বলেছি। আমাদের মনে হয় ঐ কবিতাটি হয়তো 'স্মরণ'-কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক কবিতারূপেই কবি রচনা করেছিলেন, রচনাভঙ্গীর দিক থেকে প্রবেশক কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এই কবিতাটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। "হৃদয় বন্ধু, শুনগো বন্ধু মোর" সম্বোধন জীবনদেবতার সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ সম্পর্কেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু কবি কেন এই কবিতাটিকে উক্ত গ্রন্থের প্রবেশকরূপে বসান নি তার কারণস্বরূপ আমাদের অনুমান—যে কারণে কবি উৎসর্গপত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় লোকান্তরিতা স্ত্রীর

নামোল্লেখ করেন নি, ঠিক সেই কারণেই সদ্য স্ত্রী-বিয়োগের চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার প্রকাশ হয়েছে যে কবিতায় তাকেও গ্রন্থের প্রারম্ভে বসান নি। কবির ব্যক্তিগত শোকের সংযত প্রকাশই কবিতাটিকে প্রবেশক কবিতার সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে অথচ 'স্মরণ' কাব্যের কি সার্থক ভূমিকা,—কবির তৎকালীন মনোভঙ্গীর কি অভ্রান্ত নির্দেশ না এই কবিতায় পাওয়া যায়?

কিন্তু আমরা বলছিলাম 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবির জীবনদেবতা তত্ত্বোপলব্ধির কথা, অতঃপর সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত মোট ঊনষাটটি (মূল গ্রন্থের ছেচল্লিশটি ও সংযোজন অংশের তেরটি) কবিতাকে আটটি নতুন শ্রেণীতে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শ্রেণীর কবিতাবলীর পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রবেশ মুখে সমালোচক একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন,—তিনি লিখেছেন,

"তিনি সচেতনভাবে নিজ কাব্যবিবর্তন ধারাটিকে অনুসরণ ও উদ্‌ঘাটিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ফুলরূপে তাঁহার কাব্য-উপবনে ফুটিয়াছিল তাহাই পরে মাল্যগ্রথিত হইয়া বিভিন্ন স্তবকে সন্নিবিষ্ট হইল। কবি নিজ কাব্যমালঞ্চে শুধু ফুল ফুটাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি মালাকরের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হইলেন।

কিন্তু যাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে তাহা হইল কবির আত্মকাব্য-সমীক্ষার গভীরতা ও প্রত্যেক শ্রেণীর কবিতার মর্মবাণী সঙ্কেতের অভ্রান্ত নির্দেশ।"[২২]

কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আত্মকাব্য-সমীক্ষার গভীরতা ও অভ্রান্ত সঙ্কেতদান সম্পর্কে সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদেরও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আমরা বিস্মিত হই এই কথা ভেবে—জীবনদেবতা তত্ত্বে একান্ত প্রত্যয়শীল রবীন্দ্রনাথ কি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি জীবনের মধ্যসীমায় পদার্পণকালেই সমগ্র কবিজীবনের কেন্দ্রবিন্দুটির ধারণা করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'উৎসর্গ' কাব্য রচনা করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর। এর পরে আরও প্রায় চার দশক তিনি অজস্র কাব্যকবিতা প্রভৃতি রচনা করেছেন। কিন্তু কাব্যবৃত্ত যখন মাত্র অর্ধেক সম্পূর্ণ হয়েছে তখনই কবি কেন্দ্রবিন্দুতে জীবন-দেবতার শাসনের কথা স্বয়ং উপলব্ধি করে আমাদেরও বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'উৎসর্গ' কাব্যরচনার অল্প কিছুকাল পরে 'বঙ্গভাষার লেখক'

প্রবন্ধে (১৩১১ ভাদ্র) কবি জীবনদেবতা বিষয়ক এই ধারণাটিই ব্যাখ্যা করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে কবি স্পষ্টতই তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা থেকেই জীবনদেবতার প্রচ্ছন্ন ক্রমোদ্‌ভিন্ন অভিপ্রায়টি উপলব্ধি করে সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তাঁর সমগ্র কবিজীবনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন দেখা যায়। 'প্রভাত-সঙ্গীত' কাব্য আলোচনার উপসংহারে আমরা যে কথা বলেছি প্রাসঙ্গিকতা বোধে পুনশ্চ সেই কথাই এখানে বলতে পারি। কবি বলেছেন,

"বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পবে পবে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, কেন্দ্রটা একই।"

রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। অসম্পূর্ণ রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে কবি যে কথা বলেছেন পারণতির প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে তার সার্থকতা আলোচনা করে আমরা কবির আর্ষদৃষ্টির অভ্রান্ততা সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হতে পারি। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির প্রত্যেকটিকেই কবির নিজের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা বলা চলে। কবি নিজে আলোচনামূলক এই কবিতাগুলির দু'একটি কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দেখা যায়—যথা 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ'। এই কবিতার আলোচনায় কবি বলেছেন—

"বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা; এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহে এই তাৎপর্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম—ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া অবসান হইবে—কুড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম 'মুমুক্ষু'।"[২৩]

কুঁড়ির গন্ধের এই ক্রন্দন যিনি শুনেছেন, যিনি তাকেও আঘ্রাণ করেছেন, যিনি আমাদের গোপন অন্তঃপুরের বন্ধ বাসনা কামনার খবর রেখেছেন তিনি যে

একজন বড়ো কবি তাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু এই কবিই তাঁর নিজের কাব্যের কতবড়ো রসজ্ঞ সমালোচক তারও পরিচয় পাই তাঁর নিজেরই ব্যাখ্যায় এবং সময় সময় তাঁর নিজের কবিতাতেই। 'উৎসর্গে'র 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে' প্রভৃতি কবিতায় সূত্রাকারে কবির স্বকাব্যের যে সমালোচনা আভাসে করা হয়েছে তা অতি-ব্যাখ্যা-ভারাক্রান্ত রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে মূল্যবান সংকেত বলেই গ্রহণীয়।

খেয়া (১৯০৬)

রবীন্দ্রকবিজীবনে অধ্যাত্মরসঘন আত্মনিবেদনের গীতিসাধনার যুগে প্রবেশ মুখে স্থাপিত হতে পারে 'খেয়া' কাব্যখানি। এই কাব্যটিকে কবির অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কাব্য 'নৈবেদ্য'র অনুক্রমণ হিসাবে দেখা সম্ভব হলেও স্বীকার করতে হবে 'নৈবেদ্য' হতে 'খেয়া'র দূরত্ব বিস্তর। এই দুই কাব্যের মধ্যে কালগত ব্যবধান খুব বেশী নয় মাত্র পাঁচ বৎসর কিন্তু কবিজীবনে এই পাঁচটি বৎসর যেন ঝঞ্ঝামুখর—শোকের ঝড়, রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত এবং সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে নিদারুণ অর্থসঙ্কট—এই ত্রিবিধ তাপে তপ্ত কবির ব্যক্তিজীবন। ফলে রবীন্দ্র কবিমানসে ইতিমধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার 'খেয়া' কাব্যে কবির বহির্জীবনের কিছুটা প্রভাব অনুমান করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই ধারণার প্রতিবাদ করে বলতে চেয়েছেন—

"রবীন্দ্র মানসে তাঁহার ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা যে অন্যোন্য নিরপেক্ষভাবে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কক্ষপথে বিচরণশীল ছিল তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন 'খেয়া' রচনার কাল পর্বে আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হয়।"[২৪]

'খেয়া' কাব্যের কবির নেপথ্যচারী ব্যক্তিটিকে জানার জন্য আমাদের স্বভাবতই কৌতূহল হয় কিন্তু 'খেয়া' কাব্যের সমকালে রচিত কবির এমন কোনও আত্মজীবনী, দিনলিপি, পত্র বা প্রবন্ধ আমাদের হাতে নেই যার সাহায্যে কবির অসাধারণ মনীষাকে আমরা তাঁর পতনবন্ধুর জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। কবির অন্তর্জীবন হয়তো অনেক পরিমাণে বহির্জীবন নিরপেক্ষ—কবির কথাই হয়তো ঠিক 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। তবু কবির জীবনচরিতকার প্রভাতকুমার-উপস্থাপিত তথ্যাবলীর আলোকে কবি-মানস বিশ্লেষণ করে দেখা যাক জীবনীকারের অনুমানের যাথার্থ্য কতখানি।

রবীন্দ্রজীবনীতে আমরা দেখতে পাই 'খেয়া' কাব্য রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে কবির জীবনে মৃত্যুর আঘাত পুনঃ পুনঃ এসে পড়েছে—স্ত্রী ও মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যুর কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু এই সময় শান্তিনিকেতনে কবির এক তরুণ সহকর্মী বন্ধু—যিনি বেঁচে থাকলে কবির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হতেন—আদর্শ বিশ্বাসে যিনি কবির খুব কাছে আসতে পেরেছিলেন সেই কবি সতীশ রায় অকস্মাৎ বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অল্পকালের মধ্যেই কবির পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই শোকের আঘাত কবির বুক ভেঙে দিল না বটে কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় বিলক্ষণ নাড়া দিয়েছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যখানি পিতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পিতৃদেবের মহাপ্রয়াণের পর যিনি 'পরমপিতা, পিতৃতম পিতৃণাম' তাঁকেই অন্তরে নিবিড় করে পাবার জন্য কবির চিত্ত ক্রমশ আকুল হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর পুনঃ পুনঃ আঘাতে কবির অন্তর্জীবনে যখন এই পরিবর্তন ঘটেছে তখনই শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে আর্থিক সঙ্কট কবিকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কিছু চিঠিপত্রের মধ্যে কবির অর্থচিন্তার পরিচয় পাই। কবি নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে সেই সঙ্কট-পারাবার পার হওয়ার চেষ্টা করলেও এই সময় বাঙলা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যে বিরাট ঝড় নেমে এসেছিল—'কুর্জনী' শাসনে বঙ্গভঙ্গের যে কুনীতিকে কেন্দ্র করে বৃটিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশময় গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছিল—রাজনৈতিক উত্তেজনার বিষয়ে স্বভাব-নিরাসক্ত কবিকেও তা কিছুকালের জন্য প্রভাবিত করেছিল। তার প্রমাণ আছে 'খেয়া'র সমকালীন গদ্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এবং কবির ক্ষণকালীন রাজনৈতিক কর্মজীবনের কার্যাবলীতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ আদর্শবাদী, তিনি তথাকথিত রাজনৈতিক লিডার বা মিসলিডার কিছুই নন, তা হতে পারেন না। তিনি কবি, তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উত্তেজনায়, স্বদেশবাসীর স্বরাজ-সাধনার আকাঙ্ক্ষার টানে অল্প কিছুকাল স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরধর্ম গ্রহণ করলেও বেশীদিন সেই পরধর্ম রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে কবির স্কন্ধে যখন নানা কাজের ভার আসার উপক্রম হয়েছে তখনই দেখি বাইরের কর্ম কোলাহল থেকে দূরে সরে কবি স্বদেশীওয়ালাদের কাছ থেকে বিদায় চেয়েছেন। 'খেয়া'র 'বিদায়' কবিতায় তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মালা লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়া তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।

রাজনীতিক্ষেত্র হতে অকস্মাৎ এই 'বিদায়' নেওয়ার জন্য কবিকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু কবি যা যথার্থ মনে করতেন তা করতে কখনও ইতস্ততঃ করেন নি। এ বিষয়ে অজিত চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে কবির মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাই—'আপনি হওয়ার সাধনা' যে কত কঠিন সাধনা সেই কথাটা বুঝাতে গিয়ে কবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন—

"একথা যখন আমাকে কেউ বলে কেবলমাত্র কবি না হয়ে আর কিছু হলে তোমার পক্ষে আরো ভালো—তখন তাকে উত্তর দিতেই হয় এই আরো ভালো জিনিসটা কোথাও নেই। আমি যদি কবি হই তবে এই কবি হওয়ার মধ্যেই আমার সমস্ত ভালো—অরসিক একথা বুঝবে না, বৈজ্ঞানিক এর প্রতিবাদ করবে, ধার্মিক লোক মাথা নাড়বে কিন্তু যিনি আমার ওস্তাদ তিনি আমাকে বকশিস দেবেন। বাইরে থেকে আমার হিতৈষীবর্গ আমাকে যতই তাড়না করেন কোনো ফল হবে না—আমি ঋষি তপস্বী গুরু বা তার চেয়ে গুরুতর কিছুই হব না, আমি চিরকাল কবিই থেকে যাব—যদি তাই থাকি তা হলেই আমার রক্ষা—তার চেয়ে বড় হতে গেলেই সত্যকে ডিঙবার চেষ্টা করতে হবে। আমি কবির মত করেই কাজ করব, কবির মত করেই দেব এবং নেব, কবির মত করেই দেখব এবং দেখাব।"[২৫]

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করলেও কবির মত করেই কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ লেখা ও গানে ও বক্তৃতায় তাঁর নিজের মত করে রাজনীতিচর্চা করেছেন তিনি। এই সময়কার দেশপ্রেমমূলক—

যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে
তবে একলা চলরে।

কিংবা, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

প্রভৃতি অপূর্ব সঙ্গীতাবলী রচনার মাধ্যমে এবং 'দেশনায়ক', 'দেশীয় রাজ্য' প্রভৃতি স্বাজাত্যবোধপ্রসূত প্রবন্ধাবলী রচনা করে পরোক্ষে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জুগিয়েছেন। তথ্যযুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধে কিংবা বাউলধর্মী গানে রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, তিনি যে মূলতঃ কবি—কবিতা রচনাতেই যে তাঁর স্বরূপ পরিচয় ফুটে উঠবে একথা কদাপি বিস্মৃত হন নি। তাই বাইরে থেকে দেশ-প্রেমিকগণ তাঁকে যতই তাড়না করুন কোনো ফল হয় নি, কবি 'খেয়া' কাব্যের আধ্যাত্মিকতার গভীরে ডুব দিয়েছেন।

কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় বহির্জীবনের ঘটনা ও কার্যাবলী কিংবা গদ্য রচনাবলীতে ধরা পড়েনি সত্য, কিন্তু বহির্জীবনের ঘাত-সংঘাত তাঁকে আরও অন্তর্মুখী করে তুলেছে এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার সাধনা এই সময় থেকে কবিকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যে 'খেয়া' ও তার পরে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্য সম্পর্কে বহিরঙ্গ তথ্য প্রমাণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা যতই কেন পাই তার মধ্যে এমন উপাদান খুব অল্পই আছে যার সাহায্যে কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। হয় তো 'খেয়া' থেকেই শুরু হয়েছে কবির একান্ত আপন কথা যা অপরকে বুঝাবার নয়, যা শুধু অন্তরে অনুভব করা যায়। কবির এই সময়কার মনের অবস্থা 'খেয়া' কাব্যের প্রবেশ-মুখে স্থাপিত বিষাদকরুণ সুরে রচিত 'শেষ খেয়া' কবিতাটির মধ্যেই সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্যের সার্থক ভূমিকা যেমন সেই কাব্যের প্রথম কবিতাটির মধ্যে ফুটে ওঠে এখানে এই 'শেষ খেয়া'র মধ্যে দিয়েই 'খেয়া'র মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে বলা যায়। এই কবিতাটি অরূপ লোকে প্রবেশের সংকেত নির্দেশ করছে। রূপের জগতের সঙ্গে কবি নিজেকে আর যুক্ত না রেখে অরূপ লোকে উপস্থিত হতে চেয়েছেন—কিন্তু কবি তখনও এ পারের অভিজ্ঞতা হতে ও-পারের অভিজ্ঞতায় উত্তরণের মাঝখানে রয়েছেন, তাই তাঁর মনের অবস্থা পারাপারের মাঝদরিয়ায় ভাসমান মানুষেরই মতো—'ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে'। এই অবস্থায় কবি-মনে বিষাদ-বেদনার ভাব জাগাটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু বেদনার কথাই নয়, দুঃখের কথা এবং মানব-জীবনে দুঃখের সার্থকতা বিষয়ে অর্থাৎ দুঃখতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির বক্তব্য 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতায় কাব্যভাষ্য রচনা করেছে। দুঃখের মধ্য দিয়েই ঘটে জীবনে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব এই কথা শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি বারবার বলেছেন—দুঃখ অশান্তিতেই ঈশ্বর প্রেমের যথার্থ পরীক্ষা। ঈশ্বরের এই দুঃখ-

মূর্তির কথা 'খেয়া'র অনেক কবিতাতেই আছে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে কবি এই দুঃখ অশান্তির কথা 'খেয়া'র কবিতায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

"খেয়াতে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘ গর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তার রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি 'আসছেন' পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

এই খেয়াতে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম?

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভেতর দিয়ে না পাওয়া যায়।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি প্রায়শই সার্থকনামা হয়ে থাকে—'খেয়া' কাব্যখানির সঙ্কেতধর্মী নামকরণ এই সময়কার কবি মানসিকতাকে সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত করছে। কবি এই সময় রূপের জগতের রসলীলা ছেড়ে অরূপ জগতের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে পা বাড়িয়েছেন কিন্তু গীতাঞ্জলি পর্বে তখনও তাঁর প্রবেশ ঘটে নি। তাই কবি সত্য সত্যই যেন খেয়ার জন্য প্রতীক্ষা করেছেন যে খেয়ায় চড়ে অধ্যাত্ম সাধনার জগতে পাড়ি জমাবেন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রবেশমুখে 'খেয়া' কাব্যখানি স্থাপিত হয়ে যেন আমাদের এইটাই বুঝাতে চেয়েছে কবি এখন সীমা অসীমের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন—তিনি এখন ঘরেও নন, ওপারেও পৌছুতে পারেন নি, মাঝ-দরিয়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর জীবন-তরীর মাঝিকেই ডাকছেন—

ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

আমরা জানি কবির ঐ জীবনতরীর মাঝি বাইরে নেই, তিনি আছেন কবিরই অন্তরে, তিনিই কবির জীবনদেবতা,—'যিনি, 'আমি' নামক এই নৌকাটিকে···কালস্রোতে বাহিয়া আনিতেছেন' সেই তিনিই কবিকে ওপারে বিশ্বদেবতার চরণ প্রান্তে নিয়ে যাবেন। 'খেয়া' কাব্যেই রূপকধর্মী অনেকগুলি কবিতায় তিনি কবির সঙ্গে বিশ্বদেবতার সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। 'খেয়া' রবীন্দ্র কবিজীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের পরিচয় দিচ্ছে—'খেয়া' পূর্ববর্তী রূপের জগতের উপর যখন গোধূলিমায়া বিস্তারিত হয়েছে তখনই কবি পরবর্তী ভগবদ্‌রস সাধনার জগতের একটি সার্থক ইশারা লক্ষ্য করেছেন। 'খেয়া' রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ভগবৎ প্রেম কাব্যগুলি—'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র সার্থক ভূমিকা রচনা করেছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের সমগোত্রীয় তত্ত্ব-প্রধান ও অনুভূতিপূর্ণ কবিতা এখানে আছে। কতকগুলি সঙ্গীতধর্মী কবিতা 'গীতাঞ্জলি'র গানের মতই সংকেতধর্মী—প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 'খেয়া' কাব্যের এই শ্রেণীর এগারোটি কবিতা ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'তে অনূদিত হয়ে গৃহীত হয়েছে।

'খেয়া' কাব্যে যে দুঃখ আঘাতের কথা কবি বলেছেন তার মূলে ব্যক্তি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা আমরা বলেছি। গীতাঞ্জলি পর্বের শুরুতেও দেখি ব্যক্তি জীবনের কঠিনতর বেদনায় কবির বুকের পাঁজর কিভাবে টন্‌টন্ করে উঠেছে। মৃত্যু কবির জীবনে সবচেয়ে নিদারুণ আঘাত হেনেছে ঠিক এই সময়েই। এই সম্পর্কে কৃষ্ণকৃপালনীর সাক্ষ্য মূল্যবান জ্ঞানে উদ্ধৃত হল। তিনি লিখেছেন—

"In November 1907 came the crowning tragedy of his family life. His youngest son, Samindra, a lovely and gifted boy who might have become something like his father, suddenly died of cholera at the age of thirteen, five years the day after the death of his mother. With the untimely death of his youngest son, he was reduced to utter loneliness."[২৭]

আর এই নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেই কবি বেশী করে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন—এটাই স্বাভাবিক। জীবননাথের দেওয়া দুঃখ বুক পেতে গ্রহণ করে তাঁকে না পাওয়ার বেদনায় কবির ক্রন্দন যেন গুমরিয়ে উঠেছে। পরবর্তী 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে ঈশ্বরের সঙ্গে কবির বিরহ ও মিলনের কথাই কবির প্রধান বক্তব্য।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি (১৯০৮—১৯১৪)

'গীতাঞ্জলি'র বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর।"

কবির এই উক্তি অনুসরণ করে 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'কে ভাবের ঐক্যে আমরা একই কাব্যগ্রন্থ বলে বিবেচনা করে একত্র আলোচনা করতে মনস্থ করেছি। কবির গভীর ঈশ্বর প্রেমের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই তিন কাব্য গ্রন্থে। বৈষ্ণব পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে 'গীতাঞ্জলি'তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কবির অভিসার ও তাঁর সঙ্গে কবির মিলন, 'গীতিমাল্যে' বিরহ, 'গীতালি'তে ভাবসম্মিলন। ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ এই ছ'সাত বৎসর ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়ে কবি তাঁর গানে যে কথা বলেছেন গদ্যে তার ব্যাখ্যা কমই করেছেন। এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কেই তাঁর অল্পস্বল্প মন্তব্য পাওয়া যায়, তাও আবার ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' ও তারই সূত্রে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে। এই কাব্য রচনার প্রেরণা সম্পর্কে কবি প্রায় নীরব। এর কারণ হয় তো এই 'গীতাঞ্জলি'পর্বের কাব্যে কবির যে বিশেষ উপলব্ধি, যে নিগূঢ় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে ব্যাখ্যা করে সে অনুভূতিকে বুঝানো সম্ভব নয়—কাব্যের মধ্যেই আছে সেই উপলব্ধির পরিচয়। অবশ্য তত্ত্বাকারে এই উপলব্ধির কথা 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় কবি কিছু কিছু বলতে চেষ্টা করেছেন এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে কবির সাধন জীবনের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানা সম্ভব। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্যে কবির অনুভূতি সাধকোচিত—কবি ও সাধক এই পর্বে এক হয়ে গেছেন—কবি-সাধক রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির কথা সমালোচক-কবি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই বলেছেন।

অবশ্য "ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্য একদল ধর্ম ব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খ্রীষ্ট ধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশের বহু লোক, সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন।" আর তখনই কবিকে বাধ্য হয়ে "কবীরের অনুবাদ ক'রে দেখাতে হ'ল এই জাতীয় চিন্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসেনি। এই সব চিন্তা তারও পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যেও ছিল। কবীরের পূর্বেও ছিল।"[২৮]

গীতাঞ্জলির ভাবধারায় ভারতীয় পূর্বসূরীদের প্রভাবের কথা কবি নিজেই বলেছেন, আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবো না। আমরা গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের কথা কবির মুখে শুনতে চেষ্টা করবো। ৬ই মে ১৯১৩ ইংলণ্ড থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্মকথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

"গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না।...গেল বারে (মার্চ, ১৯১২) যখন জাহাজে চড়বার দিনে (১৯শে মার্চ, আসলে আগের রাতে) মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল।...কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেইজন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম।..একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম (২৭শে মে, ১৯১২)। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে,ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখনি উসখুস করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন (যাঁকে ইংরেজি গীতাঞ্জলি উৎসর্গ করা হয়েছে) আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের (অজিত চক্রবর্তী অনূদিত রবীন্দ্র কবিতা কলকাতার বন্ধু মারফৎ সংগ্রহ করে) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েটসের কাছে আমার খাতা (আসলে খাতার তিনটি কপি করে তিনি Stopford Brooke, Bradley এবং Yeates কে) পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে।"[২৯]

'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে এই পত্রে এবং আরও কয়েকখানি চিঠিপত্রে কবির যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ

বিনয়ের প্রকাশক বলেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি. য়েটস' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মিত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সুতরাং আমরা সে বিষয়ে পুনরালোচনায় অগ্রসর না হয়ে উপরে উদ্ধৃত চিঠিতে কবি ইংরেজি গীতাঞ্জলির যেটুকু ইতিহাস দিয়েছেন তার ভিতর থেকে আসল সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করবো। গীতাঞ্জলির অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি অনুসারে দুর্বল মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয় তার অজস্র প্রমাণ আমরা পেয়েছি—ঐ অনুবাদ কর্মে কবির ইংরেজির বিশেষ দোষত্রুটি স্বয়ং য়েটসও বের করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—"এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায় যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না।"৩০ রোদেনস্টাইনের উচ্চ প্রশংসার কথা কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। রোদেনস্টাইন বলেছিলেন—

"Here was poetry of a new order, which seemed to me on a level with that of the great mystics."৩১

তাঁর এই প্রশংসাসূচক উক্তি থেকে একটা সিদ্ধান্তে আমরা সহজেই আসতে পারি তা হল—'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে কবি নিজেই কিছু অবমূল্যায়ন করেছেন ও এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে তাঁর খ্যাতির যে ইতিহাস কবি নিজে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ নয়, এবং ভ্রমপ্রমাদহীন নয়। কোনও রকম বাহাদুরি করার দুরাশায় কবি হয়তো এই অনুবাদ কর্মে হাত দেন নি, কিন্তু পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হওয়ার পর বিদেশের সাহিত্য সভায় নিজের আসন কোথায় এই তথ্যটুকু জানার একটা ইচ্ছা কবির মনে হয়েছিল কিনা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে? বিদেশী কিছু রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিদেশী সাহিত্যের বাজারে নিজের বাজার দর যাচাই করার বাসনায় 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের কিছু ভালো কবিতার অনুবাদ কর্মে কবি আত্মনিয়োগ করেছেন একথা বললে খুব অযৌক্তিক হবে না। কবির নিজের একখানি পত্রেই আমাদের এই অনুমানের সমর্থন মিলবে। এই পত্রখানি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই ভক্ত অজিত চক্রবর্তীকে লেখা। ১৩ই মার্চ ১৯১৩ সালে ইলিনয় থেকে লেখা ঐ চিঠিতে কবি লিখেছেন—

"আসলে আমার কবিতাগুলি তর্জমা করতেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে —একেবারে নেশার মত চেপে ধরে। যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে

আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ যেন বিবাহের পর বৌভাতের মত—স্বামীর সঙ্গে ত বধূর মিলন হয়েই গেছে, কিন্তু মণ্ডলীর সঙ্গে ত তার যোগসাধন করতে হবে। তার হাতের অন্ন যখন সকলে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবে তখনই বর-বধূর মিলনটা বিশ্বের ব্যাপার হয়ে উঠবে। বাংলায় যখন কবিতা প্রথম লিখলুম তখন সেটা কেবলমাত্র কবির সঙ্গে কাব্যের মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন আমার মনের সামনে আর কোনো অভিপ্রায় স্পষ্টত জাগ্রত ছিল না। এখন যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেছি তখন আমার বধূর হাতের অন্ন সকলের পাতে পরিবেশন করবার জন্যে ভোজের নিমন্ত্রণ করা গেছে। সুতরাং এর আনন্দ অন্যরকম। এই যজ্ঞের আয়োজনের উৎসাহে আমার মনকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। বার বার ঘুরে ফিরে কাটচি, কুটচি, মাজচি, ঘষচি—একটা যেন ধুম পড়ে গেছে। এ দেশে আমার এই লেখাগুলিকে কোনোমতেই কেউ অনুবাদ বলে স্বীকার করতে চায় না।···ইংরাজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে সেইটিকে অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারলে তবেই এ লেখাগুলি সার্থক হতে পারবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে লিখি বলেই আমি এই রচনায় নূতন আনন্দ পাই।”[৩২]

বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতা রচনাকালে কবির মনের সামনে কোনো অভিপ্রায় জাগ্রত না থাকতে পারে কিন্তু যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনের সামনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য জাগ্রত হয়ে ওঠে—তার কবিতা বিশ্বের ব্যাপার হয়ে উঠুক, তাঁর কাব্যবধূর হাতের অন্ন জগত সভার রসিকজনের পাতে পরিবেশিত হোক এই অভিপ্রায় কবি-মনে জাগ্রত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। “দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব দিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে।”[৩৩]—এই যাঁর অন্তরের বিশ্বাস তাঁর নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় এমন কথা কোনও ক্রমেই মনে করা চলে না। বিশেষ করে এই অনুবাদ কার্যে কবি নিজে কি পরিমাণে যত্নবান ছিলেন তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমা কবি ঘুরে ফিরে কাটাকুটি করে, ঘষে মেজে উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন—তাঁর

সচেতন শিল্পকর্মের সার্থক প্রয়োগে লেখাগুলি এতদূর উজ্জ্বলতা লাভ করেছে যে তাকে অনুবাদকর্ম না বলে 'সৃষ্টিকর্ম'ই বলা চলে। ইংরেজি ভাষার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও গৌরব কবি এতদূর পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যে বাংলা কবিতাগুলিকে ইংরেজি ভাষায় নবজন্ম দান তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় নি। এই 'জন্মান্তর' আকস্মিক কোনও ব্যাপার নয়, কিংবা কবি যেমন বলেছেন, অসুস্থ মস্তিষ্কের কর্মও নয়। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে তাতে সন্দেহ হয় কবি নিজে অসুস্থতার সময় ডাক্তারের পরামর্শমত মানসিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে কতদূর বিরত ছিলেন। ডাক্তারের উপদেশ অপেক্ষা জীবনদেবতার নির্দেশ তাঁর জীবনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কবি নিজেও উইলিয়ম পিয়ার্সনকে লেখা একপত্রে সে ইঙ্গিতটুকু রেখে গেছেন। তিনি লিখেছিলেন—

"যতদিন আমার গীতাঞ্জলির খাতা পূর্ণ হয় নি ততদিন আমি বার বার চেষ্টা করেও দেশ ছেড়ে বেরোতে পারিনি।...রুগ্ন শরীর নিয়ে শিলাইদহে গিয়ে চৈত্রমাসের বসন্ত বাতাসে জানি না কি মনে করে গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসলুম। আমের মুকুলে আমার বাগানের গাছ যেমন ভরে উঠতে লাগল আমার ছোট খাতাটিও তেমনি পূর্ণ হয়ে উঠল। য়ুরোপে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এই কথাই স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন যাব মনে করেছিলুম—তখন আমাকে যেতে দিলেন না—আর যখন যাব না মনে করে স্থির হয়ে বসেছিলুম তখন যাবার আয়োজন মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেল—কোনোদিক থেকে কোনো বাধা এল না। কেন এমন হল? যাঁকে আমি গীতাঞ্জলি নিবেদন করেছিলুম, তিনি সেই পূজা তাঁর পূর্বদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন আবার সেই পূজা তিনি তাঁর পশ্চিমদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলেন। সেইজন্যেই পূজার অর্ঘ্য হাতে করে আমাকে সমুদ্র পারে আসতে হল। এর থেকেই আমি জানতে পেরেছি আমার গানগুলি তিনি খুশি হয়ে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সেই খুশিই আমাকে পশ্চিম দেশে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি এবার তাঁর কবিকে তাঁর পশ্চিম বাতায়নের নীচে দাঁড়িয়ে গান গাইবার হুকুম করেছেন। তাঁর সূর্য যেমন আলোকের অঞ্জলি নিয়ে পূর্ব সমুদ্রতীরে বন্দনা আরম্ভ করে এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে বন্দনা সমাপণ করে তাঁর কবিকে দিয়ে তেমনি তিনি পূর্বদিকের গানগুলিকে আজ পশ্চিম দিকে আহরণ করালেন—আমার সঙ্গীতের উদয়াস্ত আজ সমাধা হল।"[৩৪]

সুতরাং বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র মত ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'ও কবির জীবন-দেবতারই রচনা ; তাই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কবি নিজেও স্থির-নিশ্চয়। অবশ্য কি বাংলা আর কি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'—এই উভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে সাহিত্যিক কারণটিকেই কবি যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেন নি। 'গীতাঞ্জলি'র উৎকর্ষের মূলে আর একটি ব্যক্তিগত কারণকে (Purely personal) কবি বড় করে দেখাতে চেয়েছেন—কবির ধারণা এই কারণেই 'গীতাঞ্জলি' বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা হয়ে উঠে সকলের কাছে এত সমাদৃত হয়েছে। কবি নিজেই লিখেছেন—

"আমি কতবার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি, বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা—নিতান্তই নিরলঙ্কার। এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্য লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্যে লেখা হয়—এবং অলঙ্কারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি গীতাঞ্জলি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলেই সকলকে দেওয়া হয়েচে।"[৩৫]

সাহিত্য সম্পর্কে কবি-সমালোচকের এই উক্তির বিপরীত উক্তি তাঁর সাহিত্য বিচারমূলক প্রবন্ধে দুর্লভ নয় কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র মত 'গীতাঞ্জলি'কেও কবি বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে দেখেননি, তাই এর সাহিত্যমূল্য বিচার না করে কবি এর মর্মকথারই অনুসন্ধান করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রের উপসংহারে কবি এ কবিতাগুলি সম্পর্কে তার মতামত এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"এই কবিতাগুলি আমি লিখ্‌ব বলে লিখিনি—এ আমার জীবনের ভিতরকার জিনিষ—এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন—এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।"

'গীতাঞ্জলি' এই কারণেই শুধুমাত্র গীতিকবিতা না হয়ে গানের অঞ্জলিতে পরিণত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক কবি মাত্র না থেকে ভক্ত কবি-সাধকে পরিণত হয়েছেন। আমাদের দেশের বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি-সাধকদের মতো কিংবা বিদেশে সেণ্টজন ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মরমিয়া কবি ও সাধকদের মতোই কবির আত্মনিবেদন এখানে গানের মধ্য দিয়েই বিগলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অহংলয় এমনকি কবি ব্যক্তিত্বকে পর্যন্ত ঈশ্বরের পদে সমর্পণ করে নিরলঙ্কৃত ভাষায় কবি আপনার অন্তরের কথাগুলি বলেছেন। কবির সেই আত্মনিবেদনের ভক্তিস্তোত্র

শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও ভক্তচিত্তকে সহজেই স্পর্শ করেছিল। Stapford Brooke এর এক পত্রে সেই স্বীকৃতি আছে। কবি নিজেই সেই পত্রখানি অজিত চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দিয়ে উক্ত পত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—

"আমি নানা লোকের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছি কিন্তু বৃদ্ধের এই চিঠিখানি আমি ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছি। এ রকম উৎসাহ বাণীতে নিজের ভিতরকার যেটা সবচেয়ে ভাল সেইটেকে জাগ্রত করে তোলে। নিজেকে সত্যভাবে এবং ঠিক জায়গায় শ্রদ্ধা করতে না পারলে নিজের মঙ্গল হয় না। ব্রুকের চিঠিখানি পড়ে আমার মনে এই কথাটি বাজতে লাগ্‌ল যে, আমার জীবনে অন্ততঃ একটা জায়গায় সত্যের প্রকাশ হয়েছে—আমার কবিতা যদি ভক্তলোকের জীবনের অবলম্বন হয়ে থাকে তবে সে ত ফাঁকি দিয়ে হতে পারে না। সে ত কেবল রচনা নৈপুণ্য নয়—আমার জীবনের কোনো একটা তার আমার ওস্তাদ নিজের হাতে সুর মিলিয়ে বেঁধে দিয়েছেন—নইলে এমন হবে কেন? সেই সুরটিকে ত আর নাবাতে দিতে পারব না—সেইটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একে একে আমার সব তারগুলিকে খাঁটি করে বেঁধে নিতেই হবে—কোনো তারে ঢিল দিলে আর চলবে না।"[৩৬]

কবির ভক্ত অজিত চক্রবর্তীও 'গীতাঞ্জলি'র এই ভক্তিপূর্ণ সমালোচনার প্রশংসা করে পত্রোত্তরে কবিকে জানিয়েছিলেন—

"যথার্থ ভক্ত যেমন কাব্যকে জীবনের জিনিস করে নেন—তাঁরা যে জায়গা থেকে তার রসটি পান—এমন শুদ্ধ মাত্র লিটারেরি লোক পান না। কাব্য as কাব্য যতই তার দর থাকুক—সে যদি জীবনকে কোন জায়গায় আশ্রয় না দেয় শান্তি না দেয় তবে তার বাইরের চাকচিক্য দীর্ঘকাল মানুষের ভাল লাগতেই পারে না।"[৩৭]

বলা বাহুল্য কবি ও তাঁর ভক্ত দুজনেই এখানে 'গীতাঞ্জলি'র কাব্যরস অপেক্ষা ভক্তিরসের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন--একে যথার্থ অর্থে কাব্য সমালোচনা এমনকি কাব্য ব্যাখ্যাও বলা সঙ্গত হবে না। কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের মূল্যায়নের মনোভাব নয়, এখানে ভাবুক ভক্তের অন্তরের গভীর আবেগটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। নাহ'লে কবি রবীন্দ্রের মতো বিচিত্রের দূত একমাত্র ভক্তিভাবের সুরে জীবনবীণার সকল তার বাঁধতে চাইবেন কেন? 'গীতাঞ্জলি'র সুর—তা সে যত উঁচু সুর হোক না কেন সেই এক সুরে রবীন্দ্র-কাব্যবীণা যে চিরকাল বাজেনি, বাজতে পারে না, একথা আমাদের চেয়ে কবির

বোধ করি বেশী করে জানা ছিল। তবু 'গীতাঞ্জলি' কাব্যরচনায় প্রায় সমকালীন উক্ত কাব্য ব্যাখ্যায় ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের মনে ভক্তিভাবনার প্রাবল্য ঘটেছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। 'গীতাঞ্জলি' ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হলেও, কবির অনুভূতির সার্থক বাণীরূপ লাভ করেই এই গানগুলি কবিতা হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ভক্তিকাব্য হিসাবে এর মূল্য থাকলেও ভক্তিকাব্য কাব্য হয়ে উঠেছে কোন গুণে কাব্য ব্যাখ্যা বা সমালোচনা কালে তাই দেখা প্রয়োজন। অবশ্য একথাও সত্য নিছক কাব্য হিসাবে 'গীতাঞ্জলি'র কাব্যমূল্য বিচার্য হতে পারে না। কাব্যরস ও ভক্তিরস এই উভয় দিক থেকেই তার কাব্যমূল্য বিচার করতে হবে তবেই এ কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হবে। 'গীতাঞ্জলি'র কবির অনুভূতির কিছু পরিমাণে শরিক হতে পারলে তবেই এর রসাস্বাদ সম্ভব হবে. না হলে এই কাব্য পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক্রকের মতো appreciation এর শক্তি যে পাঠকের আছে তিনি এর ভক্তিরসের দিকটা উপলব্ধি করবেন কিন্তু কাব্যরসের দিকটা পুরোপুরি তাঁর উপলব্ধির পক্ষে অসুবিধা হতে পারে—কিন্তু যিনি ভক্তিরসের দিকটা উপেক্ষা করে এর কাব্যরস বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবেন তিনি আরও বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। কবি নিজে এই কথাটি বুঝেছিলেন বলেই এই কাব্য ব্যাখ্যার তেমন চেষ্টা করেন নি, নাহ'লে 'গীতাঞ্জলি'র সমকালীন 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় 'গীতাঞ্জলি'র ভাবধারা অনেকখানিই ধরা পড়েছে একথা কবি নিজেও বুঝেছিলেন। আমেরিকার ইলিনয় থেকে লেখা ১০ই পৌষ ১৩১৯ (ডিসেম্বর, ১৯১২) এর এক পত্রে কবি অজিত চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন—

"শান্তিনিকেতনের আইডিয়াগুলো ইংরেজি ভাষায় এ দেশের লোকের সামনে উপস্থিত করলে ভালো হয়। আমারও অনেকবার এ কথা মনে হয়েছিল যে কেবল কবিতায় আমাদের পুরো কথাটা ত এরা পাবে না—কিন্তু আমার কোনোদিন মনে হয় নি যে ইংরেজি গদ্যে এ কথা আমি প্রকাশ করতে পারব।"[৩৮]

কবির এই বক্তব্যের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে 'শান্তিনিকেতনে'র আত্মীয়তার কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। "শান্তিনিকেতনের ধারাবাহিক উপদেশাবলীর সহিত গীতাঞ্জলির ধারাবাহিক গানের লিখিত আলোচনা হইলে পরস্পরের সাহায্যে কবির সাধনজীবন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।"[৩৯] সমালোচকের এই অনুমান সত্য, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের

সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই বলে প্রাসঙ্গিক দু-একটি দৃষ্টান্ত চয়নেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকৃত 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র কোনো কোনো বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার কোনো কোনো প্রবন্ধের মিল আছে তাই নয়, 'গীতাঞ্জলি'র কোনো কোনো গানেরও গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান—'আনন্দরূপমমৃতং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহর্ষি বলেছেন—

"ভূলোক দ্যুলোকে আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণীদিগকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মধ্যে সেই প্রকাশমান স্মরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্যের অন্তরাত্মা, আমারদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমির মুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্যে সেই সৌন্দর্যের সৌন্দর্য আমারদের নিকট প্রকাশিত হন। আমারদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাহার চক্ষু আমারদের উপরে স্থাপিত দেখি।…"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ"।

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোকে ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না।"[৪০]

এই ব্যাখ্যানের সঙ্গে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার "সৌন্দর্য" প্রবন্ধটির তুলনা করা চলে। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে সেইরূপ তুলনার অবকাশ অল্প বলে তুলনার ইঙ্গিত দিয়েই নিবৃত্ত হ'তে হবে। 'গীতাঞ্জলির' ৬ সংখ্যক গানটি—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ রস সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে—
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

এর সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের তুলনা করলেই দেখা যাবে মহর্ষির ধ্যান রবীন্দ্রনাথের গানের রূপ নিয়ে কি আশ্চর্য সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীতেও মহর্ষির প্রভাব আছে কিন্তু কবির ভক্তিরসাত্মক গানে ঐ প্রভাব আরও সুগভীর। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণাবলীতে কবি-মানসের যে পরিচয় পাই তার আরও সার্থকরূপ 'গীতাঞ্জলি'র গানে।

কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র গানের সঙ্গে 'শান্তিনিকেতনের' কোন্ বাণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাদৃশ্য রয়েছে তার পরিসংখ্যানের দ্বারা এই দুই গ্রন্থের মিল লক্ষ্য না করে আর একদিক থেকে ঐ মিলের আলোচনা করা চলে। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে ভক্ত কবির যে মন প্রকাশিত হয়েছে, আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মন আত্মপ্রকাশ করেছে—এদের মধ্যে রয়েছে একটা অত্যন্ত সহজ ও আশ্চর্য মিল। এই মিল কতটা সচেতন প্রয়াসজাত আর কতটাই বা অচেতনভাবে গড়ে উঠেছে তা বলা শক্ত। একই চিত্তধাতুর উপকরণে গড়ে উঠেছে বলে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে একটা মৌলিক মিল থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কবির স্বীকৃতি অনুসারে এই দুই গ্রন্থের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে কাব্য ও প্রবন্ধের সৃষ্টি মূলে।

'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে 'শান্তিনিকেতনে'র প্রবন্ধের বক্তব্যের মিল অনুসন্ধান যে দুঃসাধ্য কার্য নয় তার প্রমাণস্বরূপ আরও দু-চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

দুঃখের মধ্য দিয়েই দুঃখের দেবতার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে আমাদের

জীবনে। দুঃখের সার্থকতা বিষয়ে কবির এই সুচির পোষিত বিশ্বাসের সমর্থন আমরা যেমন পাই 'গীতাঞ্জলি'র গানে, তেমনি পাই 'শান্তিনিকেতনে'র প্রবন্ধে। 'গীতাঞ্জলি'র ১২৬ সংখ্যক গানে কবি লিখেছেন—

নিন্দা দুঃখে-অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি, কিছুই সেথা
হারাবার তো নাই।

অনুরূপ বক্তব্যই 'শান্তিনিকেতনে'র 'দুঃখ' প্রবন্ধের নিম্নোধৃত অংশে ব্যক্ত হয়েছে—

'পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখ-কষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণ সংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।"[৪১]

'গীতাঞ্জলি'র ২৪ সংখ্যক গানে আছে—

"যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই।
শয়নে স্বপনে।

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার এক প্রবন্ধে ব্যাকুল বেদনার সঙ্গে কবি এই প্রার্থনাই করেছেন—

"যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকালবেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।'[৪২]

'শান্তিনিকেতনে'র "প্রেম", "দ্বিধা", "সামঞ্জস্য" প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র বহু গানের ভাব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে কিন্তু সেরকম তুলনামূলক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করা চলে। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'য় যে আত্ম-সমর্পণের সঙ্কল্প উচ্চারিত হয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র গানে সুর দিয়ে ঈশ্বরের চরণ

স্পর্শ করায়, চোখের জলে সকল অহংকার ডুবিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের মিলনে মিলিত হওয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং 'গীতাঞ্জলি' ও 'শান্তিনিকেতন' পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

বস্তুত: 'গীতাঞ্জলি' পর্বের সাহিত্য জিজ্ঞাসায় কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসা একত্রিত হয়ে আছে। 'গীতাঞ্জলি'র গানে কাব্যজিজ্ঞাসার উত্তর আংশিক মিললেও সম্পূর্ণ উত্তর মিলবে 'শান্তিনিকেতনে'র অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার অনুশীলনে। আবার মনে রাখতে হবে 'গীতাঞ্জলি' বিশুদ্ধ গীতি কবিতা—গানের স্বভাব এই কবিতাগুলিতে একটু অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। সুর ও ছন্দ বাহিত হয়ে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির প্রত্যেকটি আমাদের মনে যে একটি বিশেষ আবেগ জাগায় একটা বিশেষ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে তা বিশুদ্ধ গীতিকবিতাতেই সম্ভব। এই আবেগ যখন ভক্তির মতো নির্দিষ্ট একটি ভাবকে আমাদের মনে জাগ্রত করে তখন রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার মধ্যে গীতি-প্রতিভা ও ভক্তিভাবের অপূর্ব সমন্বয় দেখে আমরা চমৎকৃত হই। স্ট্যাফোর্ড ব্রুক-এর মতো যাঁরা ভক্ত ও কবি তাঁরা 'গীতাঞ্জলি' পাঠে কেন এত বিচলিত হতেন তার কারণ বুঝতে পারি।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের কবিতায় ভক্তিভাবনার সঙ্গে গীতি কবিতার লীরিক সুরের এমন আশ্চর্য মিলন ঘটেছে যে তা কেবল অনুভব করাই সম্ভব ব্যাখ্যা করে বুঝাতে গেলে সেই নিবিড় অনুভূতির গভীরতা নষ্ট হয়—'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলি কানে শুনলে, হৃদয় দিয়ে ঐ গানের কথাগুলির মর্মার্থ অনুধাবন করলে তবেই কবির ঐ অপূর্ব সৃষ্টির রস গ্রহণ সম্ভব। গানের ভিতর দিয়ে কবি নিজে যে অপূর্ব ভুবনখানি দেখতে পেয়েছেন এবং যে ভুবনেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাঁর কৃতিত্ব এই যে ভাষার মধ্য দিয়েই তিনি সেই ভুবন ও ভুবনেশ্বরকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। ভক্তিকাব্য হিসাবে এই অপূর্ব গানগুলি পাঠ করলেও আমরা ঐ অপূর্ব জগতের পরিচয় পেতে পারি। টীকা ভাষ্য করে ঐ জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করানো যায় না কবি হয়তো সেই কথা ভেবেই কি 'গীতাঞ্জলি', কি 'গীতিমাল্য' আর কি 'গীতালি'—গীতাখ্য এই তিনখানি গ্রন্থের কবিতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন, তবে সময় বিশেষে কোন কোন গান বা কবিতা সম্পর্কে কবির এক-আধটুকু মন্তব্য পাওয়া যায়। 'গীতিমাল্যে'র ৩১ সংখ্যক গানে আছে—

কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।

এই গান সম্পর্কে কবি সন্তোষকুমার মজুমদারকে ইলিনয় থেকে ২৪শে পৌষ ১৩২৯ (৮ই জানুয়ারী, ১৯১৩) তারিখে লেখা একখানি পত্রে লিখেছেন—

"আজ সকালে বসে খামকা একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা হল। ধাঁ করে লিখে ফেললুম। লেখা হয়ে গেলে তারপর চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস—আমার জীবনদেবতা হাস্যমুখে সেইটা লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কি রকম লাভের ব্যবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষকালে নিঃসম্বল খরিদ্দারদের কাছে বিনামূল্যে কি রকম বিক্রিটা হল।"[৪৩]

এই পত্রটিতে যে ঘোরাঘুরির কথা আছে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে ইংরাজ রসিকসমাজে সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতিলাভের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মার্কিন দেশে কবিকে যে ভ্রমণ ও ভূরি পরিমাণ বক্তৃতাদান করতে হয় তার কথাই বলা হয়েছে। ২৮শে অক্টোবর, ১৯১২ নিউইয়র্ক শহরে পদার্পণ করে কবি প্রথমে আর্বানা, সেই জায়গা থেকে শিকাগো, তারপর রচেস্টার এবং বস্টন হয়ে পুনরায় নিউইয়র্ক আসেন এবং দেশে দেশে বক্তৃতা করে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। প্রয়োজনের তাড়নায় কবিকে যা করতে হয় অন্তর থেকে কবি তার সমর্থন পাচ্ছিলেন না তাই এই উঞ্ছবৃত্তির জন্য কবি যে বেদনা বোধ করছিলেন এই কবিতায় ও উক্ত পত্রে তারই পরিচয় আছে। সত্যি সত্যিই কবিতাটিতে কবির সমকালীন জীবনের ইতিহাস লেখা হয়েছে। কবি হয়ে বিষয়ী লোকের মত অর্থকরী কাজের বিষম বোঝা মাথায় নিয়ে ছ মাস কাল আমেরিকায় কাটাতে হয়েছে। আমেরিকা ভ্রমণ শেষে কবি আবার যখন লণ্ডনে ফিরে আসেন তখন ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় তা উচ্চ প্রশংসিতও হয়েছে। খ্যাতি যখন সবত্র তখনও কবির মনে একটা অশান্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। সেই কথাই ৮ই ভাদ্র, ১৩২০ সালে Cheyme walk-এ রচিত 'গীতিমাল্যে'র ৩৪ সংখ্যক গানে ব্যক্ত হয়েছে—

> এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
> পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।

এই গান রচনার সমকালেই লণ্ডন থেকে কন্যা মীরা দেবীকে কবি একটি পত্রে যা লিখেছেন তা থেকে কবির এই মনোভাবের কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কবি লিখেছেন,—

"এখানকার লোকসমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়।"[৪৪]

১৯১৩-র আগস্টে লেখা এই চিঠির মনোভাব অক্টোবরে দেশে এসে পাল্টে গেছে—'দেশে ফিরে এসেই পুনর্মূষিকোভব হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে' বলে কবি আক্ষেপ করে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখেছিলেন।

মনের যখন এই অবস্থা কবি তখন অসংখ্য গান রচনার মধ্যে মনের শান্তি খুঁজছিলেন, মাত্র দেড় মাসে কবি 'গীতালি'র ৮৩টি গান রচনা করেন। 'শান্তিস্বর্গ' খুঁজে পাওয়ার জন্য এই সময় কবি বুদ্ধগয়া যান, হরিদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি, গয়া থেকে কবি গেলেন এলাহাবাদ। গয়ায় যাওয়ার সময় পথে, গয়াতে এবং এলাহাবাদে 'গীতালি'র বাকি গানগুলি রচিত হল। 'গীতালি'র শেষের ক'টি গান এবং 'বলাকা'র কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রায় একই সময়ের রচনা। 'গীতালি' সত্য সত্যই কবির গানের পূর্ণ অঞ্জলি—দেবতা ও নরদেবতা এই দুইয়েরই উদ্দেশ্যে। 'গীতালি'র শেষ কবিতায় কবি যেন সেই কথাটিই জানিয়ে গেলেন—

> এই তীর্থ দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে···
> যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
> সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
> মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী—
> সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
> হে মোর অতিথি যত।··· ···
> রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

কবি তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী পরিষদ আয়োজিত জন্মোৎসব সভার অভিনন্দন বার্তার প্রতিভাষণে যে উত্তর দেন তার পরিসমাপ্তিতে নিজের সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গদ্যে যে কথাগুলি বলেন 'গীতালি'র এই শেষ গানে সেই কথার রেশটুকু যেন আমাদের কানে বাজে। কারণ এই অভিভাষণে যে তাঁর যথার্থ আত্মপরিচয় দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ প্রবন্ধটি সমগ্রত পরে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধে কবি বলেছেন—

"আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্ব জাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তারই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"[৪৫]

এই প্রবন্ধের উপসংহারে কবি 'গীতালি'র উপান্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করেন। এই কবিতার পরিসমাপ্তিতে আছে—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে নানা গানে ও কবিতায় কবি যা বলতে চেয়েছেন 'গীতালি'র শেষ দুটি কবিতায় তারই যেন সারকথাটি বলা হয়েছে।

---

১ ছিন্নপত্র, পত্র-৮ (২৭ শে জুলাই, ১৮৮৭) পৃঃ ১৯ (১৩৪৫)
২ চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ খণ্ড), পত্র ১৬ (আগস্ট ১৯) পৃঃ ৩৬
৩ হিমালয় যাত্রা অধ্যায়, জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৫০ (১৩৬৩)
৪ চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ খণ্ড), পত্র ৬, (২০ নভেম্বর, ১৯০০) পৃঃ ১১-১
৫ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (৩য় প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী (২৭ খণ্ড), পৃঃ ৩৩০
৬ রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা (২য় খণ্ড), ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৬৭ (১৩৪৫)
৭ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ পৃঃ ৬ (১ম সং)
৮ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃঃ ১০০ (১৩৬৯)
৯ রবীন্দ্রজীবনী (২য়) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৪৯ (১৩৪৫)
১০ পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৯৩ (১৩৩৭)
১১ রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা (২য় খণ্ড) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৭২-১৭৩ (১৩৪৫)
১২ পত্রাবলী, মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত, 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
১৩ "বাইশে শ্রাবণ" গ্রন্থে 'ওঁ পিতা নোঽসি' অধ্যায়, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ পৃঃ ১২ (১৩৬৭)

১৪ পত্রাবলী, মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক, ১৩৪৯
১৫ তদেব ফাল্গুন, ১৩৪৯
১৬ রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা, পাণ্ডুলিপি পরিচয়, শ্রীকানাই সামন্ত, 'কবি ও কবিতা' পত্রিকা ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫
১৭ পত্রাবলী, মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক, ১৩৪৯
১৮ তদেব ফাল্গুন, ১৩৪৯
১৯ পঞ্চভূত গ্রন্থের 'মনুষ্য' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ ৫৭৭
২০ চিঠিপত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক পৌষ ১৩৪৫
২১ রবীন্দ্র জীবনী (২য়) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৮২ (১৩৪৫)
২২ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (২য়) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৫ (১৯৫৭)
২৩ গল্পবিচয়, উৎসর্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১০ম খণ্ড), পৃঃ ৮৪৬ ৬৪৭
২৪ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (২য়) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২০০ (১৯৫৭)
২৫ অজিত চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন থেকে প্রাপ্ত
২৬ আত্মপরিচয় (৩য় প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী (২৭ খণ্ড), পৃঃ ২২৮-২২৯
২৭ Rabindranath Tagore—A Biography, K Kripalani পৃ ২০৩ (১৯৬)
২৮ গ্রন্থভূমিকা, বলাকা-কাব্য পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন পৃঃ ৭৬ (১৩৪৫)
২৯ চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড), ১ম ভাগ, পৃঃ ১২ ১১
৩০ 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি য়েটস', শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র, দেশ ১৯শে ডিসেম্বর, '৭০
৩১ Rabindranath Tagore—A Biography, K Kripalani পৃ ২১৮ (১৯৫৭)
৩২ 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৪৫
৩৩ চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড), পত্র ১১
৩৪ ২৪শে চৈত্র, ১৩১৯ সালে উইলিয়ম পিয়াসনকে লিখিত পত্র 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৩০।
৩৫ অজিত চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র প্রবাসীতে মুদ্রিত, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন থেকে সংগৃহীত।

৩৬ অজিত চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্র, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৫৭
৩৭ কবির উক্ত পত্রের উত্তরে ভক্ত অজিত চক্রবর্তীর পত্র, 'দেশ' ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭
৩৮ অজিত চক্রবর্তীকে লিখিত কবির পত্র, 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৫৭
৩৯ রবীন্দ্রসরণী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ১৫২ (পাদটীকা) (১৩৫৭)
৪০ ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬-৭ (১৩৫১)
৪১ 'দুঃখ', শান্তিনিকেতন (১ম খণ্ড)পৃঃ ১৮-১৯ (১৩৫৬)
৪২ "কী চাই" ঐ পৃঃ ৩৯
৪৩ গ্রন্থ-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১১শ খণ্ড) পৃঃ ৪৯৮
৪৪ চিঠিপত্র (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ৫৮-৫৯
৪৫ আত্মপরিচয় (৫ম প্রবন্ধ) পৃঃ ১০৬-১০৭ (১৩৫০)

চতুর্থ অধ্যায়

বলাকা পর্ব

বলাকা (১৯১৬)

গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যসম্পর্কে কবির আলোচনা যেমন সংক্ষিপ্ত বলাকা পর্বের কাব্য বিশেষ ক'রে 'বলাকা' কাব্যখানি সম্পর্কে কবির আলোচনা তেমনি বিস্তারিত। রচনাকালের দিক থেকে গীতাঞ্জলি পর্বের শেষ কাব্য 'গীতালি' ও বলাকা পর্বের প্রথম কাব্য 'বলাকা' সমসাময়িক কিন্তু এই দুই কাব্যে ভাব ভাষা ও ছন্দগত কতই না পার্থক্য। গীতাঞ্জলি পর্বের কবি-মনোভাব বলাকার একটি কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে—কবি বলেছেন,—

> চলেছিলেম পূজার ঘরে
> সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
> খুঁজি সারাদিনের পরে
> কোথায় শান্তি স্বর্গ।

গীতাঞ্জলি পর্বে পঞ্চাশোর্ধ কবির 'পূজাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। 'কিন্তু অন্তরে একটা দাবি এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গণ্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে।'[১] কাজে কাজেই কবিকে পূজার ঘরের শান্তি-স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল, তুলে নিতে হল বিধাতার পাঞ্চজন্য শঙ্খ 'জাগাতে জগত জনে'।

'বলাকা' রচনার সাক্ষাৎ প্রেরণা হিসাবে কবি নিজেই সবুজপত্রের তাগিদের কথা উল্লেখ করেছেন। সবুজপত্র প্রকাশ উপলক্ষেই এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান' রচিত হয়। এই কবিতার পরিপূরক বক্তব্য 'কালান্তরে'র "বিবেচনা ও অবিবেচনা" নামক প্রবন্ধে কবি ব্যক্ত করেছেন—ঐ প্রবন্ধটিও সবুজপত্রের পাতায় এই কবিতার সঙ্গেই মুদ্রিত হয় ১৩২১ বৈশাখ সংখ্যায়।

কিন্তু সবুজপত্রের প্রেরণা 'বলাকা'র কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার, আসল কারণ এই সময় কবির মনে কাব্যের পালাবদলের একটা আন্তরিক প্রেরণা এসেছিল—কবি স্বেচ্ছায় পূজার ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন বৃহত্তর ও মহত্তর কর্তব্য সাধনের জন্যে।

'বলাকা'র চার-পাঁচটি কবিতা যুদ্ধ ভাবনামূলক। এই সব কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের অভিমত—

"বলাকার চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙা-চোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন।"[২]

কবির উক্তি সামান্য একটু সংশোধনসাপেক্ষ। 'বলাকা'র মাত্র তিনটি কবিতাই রামগড়ে থাকতে লেখা চার-পাঁচটি নয় এবং সেই সব কবিতা রচনা-কালে এণ্ড্রুজ কবির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন না। তবে রামগড় থেকে দিল্লীতে এণ্ড্রুজকে কবি প্রতিদিন যে চিঠি লিখতেন সেইগুলি থেকে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থার কথা এণ্ড্রুজের অজানা ছিল না কিন্তু এই কাব্য রচনাকালে কবির মানসিক অবসাদের যে বর্ণনা তিনি করেছেন তাও কবির এ সময়কার ব্যক্তি-জীবনের ঘটনাবলীর সাক্ষ্যে সম্পূর্ণ যথার্থ প্রমাণিত হয় না। এণ্ড্রুজ কবি সম্পর্কে লিখেছেন—

'...জুলাইয়ের (১৯১৪) আরম্ভে তাঁর (কবির) জীবনে সেই পুরানো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আবার তিনি তার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অস্বাস্থ্য বা প্রতিকূল আবহাওয়া এ সব কিছুই নয়, এমন কি স্কুলের কাজও তখন খুব চমৎকারভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি কতবার আমাকে বলতেন যে, কি রকম একটা অনির্দেশ্য এবং অবর্ণনীয় ক্লেশ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।'[৩]

এণ্ড্রুজ সাহেব কবির এই মানসিক অবসাদের হেতু নির্দেশ করতে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিকার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তিনি বলেছেন,

"আমার নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবির্ভাব বহুপূর্বেই ছায়াপাত করেছিল। অন্য কোনোভাবেই তো আমি তাঁর এই তীব্র মনোবেদনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি না।"

'বলাকা'র কবিতা আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে কবিতা রচনাকালে পৃথিবীময় ভাঙাচোরার যে আয়োজন হচ্ছিল তার উল্লেখ ক'রেও কবিতা ব্যাখ্যায় যুদ্ধের অনুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি; আমরা কবির এই কাব্য রচনাকালে ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাবলীর মধ্যে কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছি।

এই কাব্য রচনাকালে এক পত্রে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে তাঁর মনের তৎকালীন অবস্থার কথা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন দেখা যায়—

"কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous break down হয়েছে তার সন্দেহ নেই। কানে এবং মাথার বাঁদিকে ব্যথা। ··· আর মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা ও অশান্তি লেগেই আছে।

দিন রাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ; অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তারপরে রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ংকর আঘাত করচে যে, বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করিনি—আমার উচিত ছিল নিঃসঙ্কোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার ideal-কে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আর নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।"[8]

এই চিঠিতে যে ত্যাগের কামনা ফুটে উঠেছে তা সমকালীন 'সর্বনেশে' কবিতায় খুব স্পষ্ট রূপ নিয়েছে এবং কবির মানসিক অশান্তির মূলে রোমান্টিক কবিদের 'আইডিয়াল' ও 'রিয়্যাল'-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বই যে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে তাও কবির পত্রে সুস্পষ্ট। রামগড়ে থাকাকালে বিদ্যালয়, জমিদারী, সংসার, দেশ সম্পর্কে কবি তাঁর যথাকর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এমন কথাও তিনি বলেছেন। রামগড়ের অপরূপ প্রতিবেশ প্রভাবে শরীর *সুস্থ* হলেও মনে মনে কবি যে কতদূর পর্যন্ত অশান্তি ভোগ করছিলেন কবির পত্রেই তার প্রমাণ আছে।

কিন্তু 'বলাকা'র ৪নং কবিতার ব্যাখ্যাকালে কবি বলেছেন,—"ব্যক্তিগত যে কথাটুকু এই কবিতার মধ্যে আছে, তাকে ছাড়িয়ে আমি যে ভাবটি প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই···" অর্থাৎ কবিতায় কবির ব্যক্তিগত যে কথা প্রচ্ছন্ন আছে তার অনুসন্ধানে বিরত থেকে তার ভাবার্থের ব্যাখ্যার দিকেই কবি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। কবির পরামর্শ শিরোধার্য করে আমরা অতঃপর সেই চেষ্টাই করব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য কবির ব্যক্তিগত কথাটুকু ছেড়ে দিলেও 'বলাকা' কাব্যসম্পর্কে কবির আলোচনার পরিমাণ কম নয়। ১৩২৩ সালে প্রকাশিত এই কাব্যখানি মাত্র পাঁচ বছর পরে কবি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সাহিত্যালোচনার ক্লাসে অধ্যাপনা করেছিলেন। কবি কথিত—বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনার বেশ কিছু অংশ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনু-লিখিত হয়ে সংরক্ষিত হয়, মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে ২৫টি কবিতার কবিকৃত আলোচনা পাওয়া যায়। বর্তমানে 'বলাকা' কাব্যের গ্রন্থ-পরিচয় অংশে তা আনুপূর্বিক সংকলিত হয়েছে। 'বলাকা' কাব্য সম্পর্কে কবির দুর্লভ আলোচনা এইভাবে সুলভ হওয়ায় আমাদের বক্ষ্যমান গ্রন্থে কবির বক্তব্যের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কবির মূল্যবান বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু মন্তব্য করার থাকলে অথবা অমুদ্রিত কোনও আলোচনা আমাদের নজরে পড়লে আমরা কেবল সেই সম্পর্কেই আলোচনা করবো। শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্তের বিশেষ সৌজন্যে মূল পাণ্ডুলিপির যে অংশ মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় কবি সেই পাণ্ডুলিপিতে স্থানে স্থানে যোগবিয়োগ করে তা সম্পাদন করতেও ত্রুটি করেন নি। সম্পাদনা কালে কবি-কথিত যে অংশ পরিবর্জিত হয়েছে আমরা সেইরূপ বর্জিত দু'একটি বক্তব্যের উপর প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য করবো। এইখানে বলে রাখা ভালো 'বলাকা' কাব্য আলোচনায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন রচিত 'বলাকা কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থখানির অপরিসীম গুরুত্বের কথা মনে রেখেও আমরা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুলিপির উপর বেশী নির্ভর করেছি তার কারণ রবীন্দ্র-কাব্যসম্পর্কে রবীন্দ্র-বক্তব্যই আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান আলোচ্য আর শ্রী সেনগুপ্তের অনুলিখন আদ্যন্ত কবিরই কথা—কবি কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত লেখা। পক্ষান্তরে আচার্য সেনশাস্ত্রীর ব্যাখ্যা ও আলোচনা বিভিন্ন সময়ে, প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরে, নানাজনের সঙ্গে 'বলাকা' সম্বন্ধে কবির আলোচনার সংকলন—এটিও মূলতঃ অনুলেখন কিন্তু এই অনুলিপি কবি কর্তৃক সংশোধিত নয়, গ্রন্থকার কর্তৃক বিশেষভাবে সম্পাদিত। ফলে কবির নিজের কাব্য সম্পর্কে তার নিজের খাঁটি কথাটুকু এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য নয়। সেই খাঁটি কথা আছে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুলিপিতে অবশ্য, তাঁর অনুলিপি বলাকার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার মর্যাদা দাবি করতে পারে না, 'বলাকা কাব্য-পরিক্রমা' বরং সেদিক থেকে অনেক বেশী সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

সে যাই হোক, আমরা শ্রী সেনগুপ্তের অনুলিপির মূল পাণ্ডুলিপিতে দেখতে

পাই ৬নং কবিতা 'ছবি'র ব্যাখ্যা থেকেই এই অনুলিখন শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে শ্রী সেনগুপ্তের কাছে জেনেছি প্রথম পাঁচটি কবিতার ব্যাখ্যাকালে তিনি সাহিত্যালোচনার ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন না। আচার্য সেন ঐ পাঁচটি কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনার যে অনুলিপি গ্রহণ করেন শ্রী সেনগুপ্ত আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে তা আচার্য সেনশাস্ত্রীর কাছ থেকে নেন ও শান্তিনিকেতন পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। কিন্তু 'ছবি' কবিতার ব্যাখ্যা থেকেই তাঁর অনুলিপি লিখন শুরু হয়। আমরাও এই কবিতার আলোচনা দিয়েই আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করবো।

'ছবি' কবিতার আলোচনা শুরু হয়েছিল এই কথা দিয়ে—

"যাকে অবলম্বন করে ছবি আঁকা হয়েছে সেই চিত্রিত মূর্তি দেখে আমার মনে সুখ দুঃখের তরঙ্গ উঠছে। এখানে প্রশ্ন এই যে, পটের ছবির সঙ্গে আমার চিত্তের যে বেদনার যোগ আছে—এই সত্য ছাড়া কি ছবির মধ্যে আর কোনো সত্য নেই? কেবল কি পটের বর্ণ ও রেখাই এর শেষ কথা, এর কি অন্য কোনো অবলম্বন নেই?"[৫]

কবিতাটির কবিকৃত যে আলোচনা মুদ্রিত হয়েছে তাতে এই অংশ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। ফলে ঐ ছবির সঙ্গে কবির মনের বেদনার যোগটি পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে। কবিতাটি কার ছবি দেখে লেখা কবি নিজে সে বিষয়ে এখানে কোনও ইঙ্গিত দেন নি অথচ তিনিই তা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারতেন। তাহলে ছবিটির সম্পর্কে সমালোচকদের মতবিরোধের অবসান হ'তো। ছবিটি কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী অথবা নোতুন-বৌঠান কাদম্বরী দেবীর, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে পৌছানো না গেলেও ছবিটি যে কবির কোনও একজন স্বর্গতা প্রিয়জনের তথ্য হিসাবে এটুকু জানলেই কবিতা আস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে কবি হয়তো বিবেচনা করেছেন।

প্রথম শ্লোকের (স্তবক) ব্যাখ্যায় শেষাংশে যে পাঠ বর্জিত হয়েছে তা— তৃতীয় বন্ধনীর অনুরূপ ছিল :

"ছবি দেখে অন্তরে এই প্রশ্ন উদিত [হচ্ছে যে, ঐ যে আকাশে নীহারিকা যুগ যুগান্তর ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে, নক্ষত্রের সারি অন্ধকারে চলেছে, তুমি কি তাদের মত সত্য নও। এই প্রশ্নে মন জবাব দিতে চাচ্ছে যে, তুমি ছবি ছাড়া আর কিছু নও।]

প্রথম স্তবকের ব্যাখ্যায় এই অংশ যুক্ত থাকলে আলোচনা আরও প্রাঞ্জল

হ'তো, কবি নিজে কবিতার ব্যাখ্যায় অত সুস্পষ্টতা নিষ্প্রয়োজন মনে করে তা বর্জন করেছেন।

কবিতার পরবর্তী স্তবকগুলির ব্যাখ্যায় অংশতঃ বর্জনের প্রমাণ যা পাই তাতেও অতি সরলীকরণ বজনের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় স্তবকের ব্যাখ্যার বর্জিত পাঠে দু'একটি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার হয়েছে দেখা যায়, যেমন, 'তুমি breathe করতে' বা 'personalityর জগৎ' প্রভৃতি, এর কারণ শ্রোতাদের মধ্যে দু'একজন অবাঙালী শ্রোতাও উপস্থিত থাকতেন তাদের বোঝবার সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে পরে অপ্রয়োজনীয় মনে করে কবি কখনও কখনও তা বর্জন করেছেন। এই স্তবকের ব্যাখ্যায় একস্থানে 'নিজের নামটি তুমি যেন লিখে দিয়েছিলে'—এই অংশের পরে ছিল—

[তার রূপ আর রসকে তুমি আমার মনে বিশেষ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলে। তোমার মত প্রিয়জনের কাছ থেকেই আমি পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখেছিলাম।]

ছবিটি যে কবির কোন প্রিয়জনের তার কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন এবং প্রিয়জনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম যে ভালবাসা সে কথাও কবির এই কথাতেই প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ স্তবকের ব্যাখ্যায় আছে—

"আমরা দুজনে এক-সঙ্গে চলেছিলাম, হঠাৎ অনন্তরাত্রি তোমাকে অন্তরালে নিয়ে গেল। আমি চলতে লাগলাম তুমি নিশ্চল হয়ে গেলে।"

বর্জিত ব্যাখ্যায় 'অনন্তরাত্রি' কথার আগে 'রাত্রির ব্যবধান এসে প্রাচীরের মত দাঁড়াল' এই অংশ ছিল, কবি নিজে রাত্রি কথাটা সংশোধন করে 'কাল-রাত্রি' ব্যবহার করেছিলেন পরে সম্পূর্ণ অংশ কেটে দিয়েছেন। কালরাত্রি কথার মধ্যে মৃত্যুর ভীষণতার আভাস আছে, কিন্তু অনন্তরাত্রি কথার মধ্যে সেই ভীষণতা নেই বরং অসীমত্বের ব্যঞ্জনা আছে।

মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর কিছু নয় সে যে জীবনেরই পরিপূরক জীবনের গতিবেগকেই সে অব্যাহত রাখে তার কথা কবি এর পরেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। 'আমার দুরন্ত জীবন নির্ঝর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে।' 'এই অংশের পর জীবনের যে গতিবেগ তার একটা অঙ্গ হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সে সচলতা লাভ করেছে'—এই অংশ ছিল। মূল পাণ্ডুলিপিতে দেখি শেষের অংশ কেটে দিয়ে প্রথমাংশের পর কবি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন। 'অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত ধ্বংস হতে

হতেই প্রাণের পথ তারা কেটে দিচ্চে। কবির বক্তব্য কিন্তু বর্জিত অংশে আরও স্পষ্টতা লাভ করেছিল—মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে স্থির হয়ে যান না, জীবনের গতিবেগের সঙ্গে তাঁরও যোগ আছে। সেই যোগ কেমন তা কবি পঞ্চম স্তবকের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট করেছেন। কবির সেই বক্তব্য সূত্রাকারে বিন্যস্ত করা চলে :

'বিশ্বের যে অন্তরের বার্তাকে তুমি এনেছিলে, তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করছে। তুমি আমার সামনে নেই, কিন্তু জীবনের মূলে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আছ, তুমি আর পৃথক থাকলে না। তোমাকে আমি যে ভুলেছিলুম সে ভুল বাইরের। তুমি আমার জীবনের চৈতন্যলোক থেকে মগ্ন চৈতন্যের জীবনে চলে গেছ। বিস্মৃতির কেন্দ্রস্থলে বসে তুমি আমার রক্তেতে দোলা দিয়েছ। অন্তরের যে কবি সংগীত কাব্য রচনা করছে তার প্রেরণারূপে তুমি আজ মর্মস্থলে রয়েছ। রাত্রিতে তোমাকে হারিয়ে ফেলে, রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই গভীরভাবে আবার তোমাকে ফিরে পেলাম।'

সুতরাং কবির কাছে ছবি শুধু ছবি নয়। ছবি স্থবির (static) নয়, ছবি গতিশীল (dynamic)। ছবির মধ্যে গতির তত্ত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার কারণস্বরূপ 'ছবি' কবিতার উৎসমূলে যে বিশেষ ঘটনাটি নিহিত আছে প্রসঙ্গতঃ তা উল্লেখ করা চলে। শিল্পী অসিত হালদার তাঁর 'রবিতীর্থে' গ্রন্থে এই ঘটনার কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

"১৯১৪-তে রবিদা এক দার্শনিক মতের অবতারণা করলেন আমাদের কাছে। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ললিতকলা (চিত্র ও ভাস্কর্য) সঙ্গীত বা কাব্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কেন না সেগুলি দেখার পরে অন্তরে তার স্পন্দন থাকে না ; কাব্য ও সঙ্গীত গতিশীল আর ললিতকলা স্থবির।…আমার বক্তব্য হল সঙ্গীতের মতই চিত্র ও ভাস্কর্য রসাভাস (emotion) জাগায়। কেবল Commercial pattern design-ই স্থবির—দেখলে মনে তার ছাপ থেকে যায় না। সঙ্গীত ও কাব্যের মতই চিত্রকলা ভাব-জগতের বস্তু। অতএব ভাল একটি ছবি দেখলে চিরকাল তার ভাব-রণন মনে জাগরূক থাকবে—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিসমাপ্তি নয়। সেই বছর রবিদার সঙ্গে গয়া হয়ে এলাহাবাদ গেলুম, এলাহাবাদে বসে (৩রা কার্তিক, ১৩২১) তিনি লিখলেন বলাকাতে একটি কবিতা "তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা।"[৬]

'ছবি' কবিতায় 'বলাকা'র অন্যতম প্রতিপাদ্য গতির কথা কি ভাবে ব্যক্ত

হয়েছে তা ঐ কবিতার আলোচনাকালে কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। পরবর্তী 'তাজমহল' ('শাজাহান' কবিতার পূর্বনাম) কবিতায় কবি ভাস্কর্য শিল্পের স্থবিরত্বই প্রমাণ করেছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের খাতায় অথবা 'বলাকা'র গ্রন্থপরিচয়ে এই কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না তবে এই কবিতার ব্যাখ্যাস্বরূপ অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীকে লেখা কবির দুখানি পত্র পাওয়া যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখেছিলেন—

"শাজাহানকে যদি মানবআত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই, সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না—ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তার চলে যেতে হয়—পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়।"[৭]

মানবাত্মার যে বৃহৎ ভূমিকায় চিরসত্যরূপী শাজাহানের অমর আত্মার জয়-যাত্রার কথা কবি এখানে উল্লেখ করেছেন, আমাদের বিশ্বাস তাই এ কবিতায় কবির মূল বক্তব্য। বলা বাহুল্য বক্তব্যটি চিন্তাগর্ভ দার্শনিক তত্ত্বের আকার নিয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কবিতাটি যখন কবির মনেতে আকার ধারণ করেছিল তখন কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাকে তিনি হয়তো অনুসরণ করেন নি, কিন্তু যে ভাবের বীজ কবির চিত্ত ক্ষেত্রে এসে পড়েছে তাই ভেতরে গিয়ে পরিণত প্রতিভার অধিকারী কবির দার্শনিক মনের কাছ থেকে চিন্তার খাদ্য পেয়ে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে যে বিশেষ আকার ধারণ করেছে তাতে আপনা থেকেই দার্শনিক তত্ত্বকথার আমেজ এসে পড়েছে। মমতাজের প্রতি শাজাহানের বিরহী প্রেমের একটা উচ্চ আসন স্বীকার করলেও কবি তাঁর মহৎ বক্তব্যটি এখানেই শেষ করেন নি ; ভাব-চিন্তার রাজ্যে কবি আরও একটু অগ্রসর হয়ে গেছেন। কবির নিজের জীবনে ছবি যেমন তাঁর প্রিয়জনকে চৈতন্যলোক থেকে মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে নিয়ে গেছে, শাজাহানের ঐ তাজমহলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়, সুতরাং তাজমহল শাজাহানের সেই মগ্ন-চৈতন্যের বার্তাকেই আজও প্রচার করে চলেছে—

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'

কিন্তু এই শাজাহানের স্বরূপ কী? তিনি যে বৃহৎ মানবাত্মার ক্ষণিক রূপ, তার সেই আত্মা চিরমুক্ত স্বভাব, সে পথিক, তাকে বাঁধবে কে? সুতরাং বৃহত্তর মানবাত্মার চিরচলার বেগে ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য—তাজমহল মমতাজের জীবনকে যেমন ধরে রাখতে পারে নি, তেমনি সম্রাটের স্মৃতি নাম-রূপের বন্ধনে যে শাজাহান একদা ধরা দিয়েছিল তাকে ধরে রেখেছে মাত্র, শাজাহানের অব্যক্ত মানব স্বভাবকে ধরে রাখতে পারে নি।

জীবন সম্বন্ধে এই তত্ত্বোপলব্ধি কবির নিজের সম্বন্ধেও কতখানি খাটে তা কবি এক পত্রে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"আমাদের আর্টিস্ট যা গড়েন তার নব নব সংস্করণ ঘটতে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন—অতএব রবীন্দ্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়—অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর একটা ধারা চলতে পারে, কিন্তু তার এ নাম নয়, এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানে চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।"[৮]

নিরবধিকালের চয়নিকায় শাজাহানও একবারই ধরা দিয়েছেন—পরবর্তী-কালে মমতাজ নেই, শাজাহানও নেই, তাই শাজাহানের অমর প্রেমের ঐ চিরন্তন বাণীরও সেখানে কোন সার্থকতা নেই। তাজমহলকে উপলক্ষ করে লেখা 'বলাকা'র ন' নম্বর কবিতায় বরং সম্রাট শাজাহানের মনের কথাটি বিশদ করে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে কবির প্রেমচেতনার পুরাতন কথাটি পুনরুচ্চারিত হয়েছে। কবি নিজে এই কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

—"ন' নম্বরের কবিতায় সম্রাট একটি ভাবকে (idea) জীবন্ত করে রেখে দিতে চান। সম্রাট চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর idea রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের মাল্য হতে ভ্রষ্ট একটি বীজ পথের ধূলায় পড়ে অমর অঙ্কুরে আকাশের পানে উঠেছে। সেই অমর অঙ্কুর সেই idea-কে এই কবিতায় আরও একটু বিশদ করা হয়েছে। সেই idea কেন অমর হল? আজ সেই সম্রাটও নেই রাণীও নেই, স্মৃতিও নেই তবে অমরত্ব আজ রয়েছে কাকে আশ্রয় করে?"[৯]

এই প্রশ্নের উত্তর আছে ঐ কবিতার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

সম্রাট মহিষী—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
... • ... ..

যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীকে লেখা এক পত্রে 'শাজাহান' কবিতার যে প্রেম সম্মুখ পানে……উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।' ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি যে কথা বলেছিলেন ('বলাকা' গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য) তাতে শাজাহানের দুর্বোধ অংশটুকু কিছুমাত্র সহজ হয় নি, বরং 'তাজমহল' কবিতায় কবির কথা অনেক বেশী সহজবোধ্য, এর কারণ মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল তখনই ঐ কবিতার ঐ অংশের অর্থ এই 'তাজমহল' কবিতায় ধরা পড়েছে, তাই কবিতায় বক্তব্য কবিতাতেই অনেক বেশী স্পষ্ট হয়েছে—কবির চিঠির গদ্য ভাষায় নয়।

কিন্তু 'বলাকা'র "ছবি" ও "শাজাহান" কবিতার ব্যাখ্যায় লেখা না হলেও— 'বলাকা' তখনও সুদূর ভাবীকালে প্রচ্ছন্ন—কবির অনতিক্রান্ত পঁচিশ বছরের রচনা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র "রুদ্ধগৃহ" ও "পথপ্রান্তে" পঞ্চাশোত্তর এই কবির পরিণত ভাবনার পূর্বাভাস আছে। কবি নিজেই সে কথা ২১. ৯. ৩৪ তারিখে এক পত্রে অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"দেখা যাচ্চে পরবর্তীকালের বলাকার ভাবের সঙ্গে এই লেখার মিল আছে।"[১০] আমরা অতঃপর সেই মিলটুকু লক্ষ্য করতে পারি।

'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও। জীবন মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।"[১১]

তার কারণ 'রুদ্ধগৃহে'র পরিপূরক প্রবন্ধ 'পথপ্রান্তে'তে কবি বিশদ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ

আসে নাই। ...পথ চলিতে আর কিছুরই আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।"[১২]

দেখা যাচ্ছে, এখানে কবি মানুষকে জন্মপথিক বলেই বর্ণনা করেছেন এবং প্রেমকেই পথিকের পথ চলার পাথেয় রূপে দেখেছেন।

জীবন, মৃত্যু, প্রেম সম্পর্কে কবির এই অনাসক্ত দৃষ্টি তাঁর প্রৌঢ় বয়সে যে আরও পরিপক্বতা লাভ করবে আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি? 'শাজাহানে' মানবের যে পথিক স্বভাবের কথা তিনি বলেছেন বা 'ছবি' কবিতায় পথের আলো রূপে তিনি যে প্রেমের বর্ণনা করেছেন কবির ধ্যানধারণা ও মননকল্পনার ক্ষেত্রে তা যে অভিনব কিছু নয়—'বলাকা'র ভাবধারা যে রবীন্দ্র কবিস্বভাবের চিরপ্রবাহিণী ধারামাত্র—আমাদের আলোচনায় আশা করি সে কথা স্পষ্ট হয়েছে।

'বলাকা'য় গতিবাদের যে বিস্ময়কর প্রকাশ অনেকে লক্ষ্য করে গতি তত্ত্বকেই 'বলাকা'র মূল সুর বলেছেন—সে সম্পর্কেও আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য আছে এবং আমাদের কথা, বলা বাহুল্য, কবির নিজেরই কথা।

'বলাকা'র গতিবাদের মূলে বের্গসঁর প্রভাবের কথা অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। এ বিষয়ে 'বলাকা' আলোচনা কালে কবিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার উত্তরে কবি বলেন,—

"আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন করে বলবো? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তাঁদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপর প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব, সে পাথর। কিন্তু দেখতে হবে, যে কথাটা বলেচি তার কোনো মূল কি ভারতের পূর্বে কোথাও ছিল না?

"আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলচে। হংসের মতোই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেচে। তার মন্ত্র 'চরৈবেতি'।... এই তত্ত্ববাদ তো এই দেশে ছিল। অন্ততঃ আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার ছেলেবেলায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হতে আমার কবিতায় গানে নাটকে সর্বত্রই এই গতিব্যাকুলতা। তবু য়ুরোপের মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েচি তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার

চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা, গতি আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। বলাকাতে সেই গতিরই জয়গান করা হয়েচে।"[১৩]

'বলাকা'তে পাশ্চাত্য মনীষী বের্গসঁর চিন্তার প্রভাব অবশ্যই কিছু পড়েছে। বের্গসঁর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে শুধু ফরাসী চিন্তাজগতেই নয় সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার সাহায্যে সত্যকার দার্শনিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদ (Creative Evolution) বিশ্বব্যাপী জীবনী-শক্তির আত্মপ্রকাশের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাত্মক চিন্তা পদ্ধতির সঙ্গে দার্শনিক বোধের সমন্বয় সাধন করে বের্গসঁ যে অভিনব সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাতে পরিবর্তনকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। বের্গসঁর মতে—

"There is no feeling, no idea, no volition which is not undergoing change every moment" তাই তিনি বলেছেন,—

"The truth is that we change without ceasing, and the state itself is nothing but change."

এই ক্রমবিবর্তনশীল অগ্রগতির মূলে বের্গসঁ যে একটি শক্তি বা প্রাণাবেগ-এর কল্পনা করেছেন তার নাম Vital Impetus দার্শনিকের নিজের ভাষায়—(এলাঁ ভিতাল) 'Elan vital' এই শক্তির ক্রিয়ায় চেতনের মধ্যে যে পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় তার বিশ্লেষণে দার্শনিক বলেছেন—

"For a conscious being, to exist is to change, to change is to mature and to mature is to go on creating oneself endlessly."

"Each of its moments is something new added to what was before. We may go further, it is not only something new, but something unforseeable."

তাই তিনি বলেন,

"I change, then without ceasing." এবং এইভাবে

"We are creating overselves continually."[১৪]

অর্থাৎ সৃজনশীল ক্রমবিবর্তন পরিণামহীন। রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকের ধারণার সঙ্গে বের্গসঁর ধারণার এইখানেই পার্থক্য। বিচ্ছিন্নভাবে 'বলাকা'র কোনও কোনও পঙ্‌ক্তি বা দু' একটি কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে যেমন, 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা', 'আমি যে অজানার যাত্রী' কিংবা 'চঞ্চলা' কবিতা; কিন্তু 'বলাকা'র কবিতাগুলি যেহেতু সমষ্টিগত তাৎপর্য নিয়েই আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং রবীন্দ্র প্রতিভার মহত্ত্ব যেহেতু তার সমগ্রতায়, বিক্ষিপ্ত রচনা কি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিতে তার যথার্থ পরিচয় নয়, তাই 'বলাকা'র কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করলে কবি স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির ধারণা—ঐকান্তিক বোধ ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা আমাদের সহজেই মনে উদিত হবে, তার সঙ্গে বের্গসঁর অকারণ অবারণ এবং পরিণামহীন চলার পার্থক্যটি দৃষ্টি এড়াবে না। ভারতীয় দর্শনেও গতির কথা আছে কিন্তু স্থিতিকে কেন্দ্র করেই তার যাত্রা এবং স্থিতির অভিমুখেই তার চলা। বের্গসঁ যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন তিনি কেবল গতি-রূপেই সত্য তিনি বলেন—

"God, thus defined, has nothing of the already made. He is unceasing life, action, freedom."

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা তথা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে বের্গসঁর ঐশী চিন্তার মৌলিক পার্থক্যটি এখানে প্রকট। ভারতীয় সাধনার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কবি ভাবনায় ব্রহ্ম যুগপৎ স্থিতি ও গতিরূপেই কল্পিত হয়েছেন—তিনি একাধারে রূপ ও অরূপ, সীমা এবং অসীম। স্থিতিকে বাদ দিয়ে গতির কল্পনা কিংবা গতিকে বাদ দিয়ে স্থিতির ধারণা করা সম্ভব নয়—এই দুইই এক সত্যের অধীন। এইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে—তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই একসঙ্গে সত্য। আবার ঔপনিষদিক ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নন—'রসোবৈসঃ'—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। কেন্দ্রীয় সত্যরূপে জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি স্থিতিশীল তিনি ধ্রুব সত্য কিন্তু তিনিই তো সৃজ্যমান বিশ্বচরাচরে আনন্দরূপে অমৃতরূপে আপনাকে নিত্য বিকশিত করে তুলেছেন—তখন তিনি গতিশীল। গতিকে আমরা যে স্থিতির মধ্য দিয়ে জানি সেই স্থিতির তত্ত্বটি যেমন আমাদের নিজের গড়া নয় তেমনি গতিই সত্য, স্থিতি

সত্য নয়, একথা বললে চলবে না। কবি 'বলাকা' কাব্য প্রকাশের সমকালীন এক প্রবন্ধে গতি ও স্থিতির সমন্বয় তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩২১ সালে লেখা ঐ প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া চলে—কবি লিখেছেন,—

"এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন—ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ একপক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না কিন্তু সরল বুদ্ধি জানে চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।"[১৫]

এই সরল সহজ বুদ্ধিতেই বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের তত্ত্বটি বুঝে নিয়ে কবি সে সম্পর্কে লণ্ডন থেকে অজিত চক্রবর্তীকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"Bergson সম্বন্ধে একটা চটি বই তোমাকে শীঘ্র পাঠাব। সেটা ভারি চমৎকার সহজে ওঁর মতটা ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। উনি যে দিকটা দেখিয়েছেন সেটা খুব চমৎকার—কিন্তু অন্য দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করবার কোনো মানেই নেই। গতিতত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্বও তেমনি সত্য—এবং সেইজন্যই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারিনে—সেটা কেবল মাত্র আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মায়া নয়—সেটা সত্য বলেই তার হাত আমরা এড়াতে পারিনে।"[১৬]

এই উদ্ধৃতিতে বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের ঐক্য ও পার্থক্যের কথা কবির নিজের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই পরিষ্কার বোঝা যায়, যদিও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আমরা আগেই করেছি। আলোচ্য পত্রে বের্গসঁর সঙ্গে কবির অভিমতের ঐক্য অপেক্ষা পার্থক্যটিই স্পষ্ট। গতি বা উদ্দেশ্যহীন ক্রমবিবর্তনকেই কবি একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন নি তিনি তাকে জীবন সত্যের অর্ধেক বলে স্বীকার করেছেন, বাকি অর্ধেক আছে স্থিতিতে। মনীষী বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের কথা পড়ে, ফরাসী

দার্শনিকের সঙ্গে প্যারী নগরে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে সাময়িকভাবে গতির জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেও—'বলাকা', বা 'চঞ্চলা' কবিতার বক্তব্যই কবির দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রকৃত পরিচয় দেয় না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শন প্রভাবিত কবির পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় আছে 'বলাকা'রই ১৯ সংখ্যক কবিতা 'জীবন মরণে'। এই কবিতার ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন,

"জীবনের এক-একটা চক্ররেখা (cycle) আছে, যখন তা সম্পূর্ণ হবে, তখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে মর্মগত সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে।··· পিছনে যা ফেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই—আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্মৃতি-গুলি ঐক্য ধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।"

তত্ত্ব করে কবি এখানে যে কথা বলেছেন কাব্যে আরোও সহজ ভাষায় তা ব্যক্ত হয়েছে—কবি 'জীবন-মরণ' কবিতায় বলেছেন

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল।

কবির সিদ্ধান্ত জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিরোধী নয় তারা পরস্পরে পূর্ণ অর্থাৎ একই সত্যের পূবার্ধ ও অপরার্ধমাত্র। চাওয়া-পাওয়া এবং ছেড়ে যাওয়া এতদুভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যটি কবি খুঁজে পেতে চান, কবির কাছে তারা উভয়েই সমান সত্য।

'বলাকা'র ২৩ সংখ্যক কবিতা "দুই নারী"তে কবি এই সামঞ্জস্যের তত্ত্বই ব্যাখ্যা করেছেন। কবির মতে—

"যে প্রলয়ংকরী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবেই সর্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়, গতি প্রবর্তিত করবার জন্যে সে আছে। গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আর এক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি সঙ্গীত।"

'বলাকা'র গতি কবি কথিত এই নিয়ন্ত্রিত গতি। 'বলাকা'র "দুই নারী" কবিতার কবিকৃত আলোচনা সম্পর্কে আমাদের দু'এক কথা বলার আছে। ঐ কবিতা আলোচনায় অনুলিপির একপৃষ্ঠার প্রতিলিপি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল—

'বলাকা'র ২৩ সংখ্যক কবিতার কবিকৃত আলোচনার মূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। প্রতিলিপি অনুলেখক শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের হস্তাক্ষর বামপার্শ্বে মুদ্রিত হয়েছে—দক্ষিণ পার্শ্বে কবির স্বহস্তে লেখা উক্ত আলোচনাংশের সংশোধিত রূপটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুই নারীতত্ত্বে কবির উপর কালিদাসের প্রভাব যে কতখানি তা কবির এই কবিতা আলোচনা কালেই স্পষ্ট হয়েছে। কবি কালিদাসের দুই বিখ্যাত রচনা 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'য় নারীর মধ্যেকার এই দুই প্রবর্তনা কেমন উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে তার আলোচনা করে বলেছেন—গৌরী ও শকুন্তলা দুজনেই নারী "কিন্তু এঁদের উপলক্ষ করে শক্তির দ্বিবিধ মূর্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস।"

মুদ্রিত ফটোস্টাট-এ বর্জন চিহ্নযুক্ত অংশে দেখা যাচ্ছে কবি কালিদাসের কাব্য আশ্রয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন, পরে তা বর্জন করে 'কুমারসম্ভবে' গৌরীর তপস্যার কথা প্রথমে উল্লেখ করে পরে শকুন্তলার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপিতে আরোও দেখা যায় শুধু এই দুই গ্রন্থই নয় কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' 'ঋতুসংহার' 'মালবাগ্নিমিত্র' প্রভৃতির কথাও একে একে উল্লেখ করেছিলেন। পরে 'দুই নারী' কবিতার আলোচনায় কালিদাসের কাব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে, কবি তাই 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কথা টুকু বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে অন্যান্য কাব্যের আলোচনা পরিবর্জন করেছেন। এইভাবে কাব্য ব্যাখ্যা কালে কবি কথিত আলোচনা পরবর্তীকালে কিভাবে কবি কতৃক সংশোধিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় কবি কথিত আলোচনার মুদ্রিত পাঠ ও অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির পাঠের তুলনামূলক আলোচনায় কিন্তু সেই রকম আলোচনার অবকাশ এখানে অল্প বলে আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

'বলাকা'র দুই নারী তত্ত্বে যেমন কবি কালিদাসের প্রভাব থাকলেও তা কবির স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে তেমনি বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের কাব্যময় কল্পনাটুকুকে রবীন্দ্রনাথ আপনার অধ্যাত্মরসে রাঙিয়ে 'বলাকা' কাব্য মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশ করেছেন তাতে এই গতিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধির ক্রমবিকাশেরই এক বিস্ময়কর চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে বলা চলে। গতিবাদ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কবিপ্রতিভার সঙ্গে সর্বথা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহসা উদিত কোনো তত্ত্ব নয়—একথা আমরা 'শাজাহান' কবিতার আলোচনা কালেই বলেছি।

আবার 'বলাকা'য় গতিবাদ অন্যতম বক্তব্য হলেও 'বলাকা'কে গতিরাগের কাব্য বলে সাধারণতঃ যে সিদ্ধান্ত করা হয়, বলাকা সম্পর্কে কবির নিজের বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করার পর সেই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'বলাকা'য় জগতের পরিবর্তনশীলতা গতিশীলতার যে কথা বলা হয়েছে, 'বলাকা'র কোনও কোনও কবিতা যেমন, 'চঞ্চলা', 'বলাকা', 'যাত্রা' প্রভৃতিতে যাত্রার আনন্দগানে কবিমন যেভাবে পূর্ণ হয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক গতির কথাই 'বলাকা'র মূলকথা, কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের গতিবাদের আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি পাশ্চাত্য গতিতত্ত্বের অথবা প্রাচ্য 'চরৈবেতি'র মন্ত্রে প্রভাবিত হলেও কবির আন্তরিক বিশ্বাস কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্যের সত্যেই বিশ্বাসী। 'গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতে পারিনে' কবির একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য অপর এক উক্তি 'মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল ক'রে চলাই মানুষের চলা।'[১৭]

পাশ্চাত্য দেশসমূহে পরিভ্রমণকালে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অফুরন্ত প্রাণাবেগে লক্ষ্যহীন গতি কবিকে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করেছিল, তাছাড়া কবির সদ্য পঠিত Creative Evolution-এ বের্গসঁর 'এলাঁ ভিতাল-এর প্রেরণাবশে পরিবর্তমান জীবন ও জগতের গতিরূপটি আপাত সত্য হিসাবে প্রতিভাত হলেও পরিশেষে কবিমন যে গতি ও স্থিতির সামঞ্জস্য প্রয়াসী হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাই 'যাত্রী' গ্রন্থে ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ তারিখের ডায়ারিতে। 'বলাকা'য় গতিবাদের জয়গান করলেও 'পূরবী' রচনাকালে কবির গতির প্রতি সেই মোহ যে কেটে গেছে, লক্ষ্যশূন্য চলা কবিকে যে কি পরিমাণে ভীত করে তুলেছে তার পরিচয় পাই এইদিনের ডায়ারির উপসংহারের কবিতায়। 'লক্ষ্যশূন্য' নামে এই কবিতাটি 'পরিশেষ' কাব্যের সংযোজনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি উদ্ধৃতিযোগ্য—

> রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,—
> 'থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
> সম্মুখে আমার গৃহ।' রথী কহে, 'ওই মোর পথ,
> ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।'
> গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
> কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'

'কোনখানে' শুধাইল। রথী বলে, 'কোনোখানে নহে—
শুধু আগে।' 'কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে', গৃহী কহে।
'কোথাও না শুধু আগে।' 'কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।'
'কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।"

লক্ষ্যহীন গতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিচয় আছে এই কবিতায়। 'বলাকা'র নাম-কবিতা যেখানে গতির চরম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, সেখানেও কবির কথা 'হেথা নয় হেথা নয়' বলে শেষ হয়নি, বাক্যের শেষাংশে 'অন্য কোথা অন্য কোনখানে' বলে যে অংশটুকু জুড়ে দিয়েছেন তাতেই ঐ বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিস্ফুট হয়েছে। "গতিই সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সত্য নয়। সৃষ্টি শুধুই কেবল চলিতেছে না—চলার সঙ্গে সঙ্গে সে এই চলা হইতে মুক্তির সন্ধানও পাইতেছে।" এই কথাই কবি অন্যত্র আর একভাবে বলেছেন—

"অশান্তির অন্তরে যে সুমহান শান্তি—তার কামনা আমার আজও মেটেনি এতদিনে বুঝি আমার কাজ সাঙ্গ হল। মন বলে, আমার যিনি প্রভু, এবার তিনি আমাকে একান্তে বসতে দেবেন—তাঁর বাণী নয়, এই অবসরে তাঁর অসীম নীরবতা কান পেতে শুনব বলে।"[১৮]

সুতরাং সৃষ্টি অনন্তকাল ধরে চলেছে কবি নিজেও সেই সৃষ্টি স্রোতে ভেসে চলেছেন একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই চলা লক্ষ্যহীন নয়, ঈপ্সিতের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কবি চলেছেন। কবির 'এই পথ চলাতেই আনন্দ' কারণ পথের শেষ যেখানে, সেখানে 'তুমি আর আমি একা'—পরম প্রিয়তমের সঙ্গে এই চরম মিলনের মুহূর্তে কবির পথ চলা শেষ হবে। তাই দেখি গতির কথা 'বলাকা'র একটি প্রধান কথা হলেও তাই এই কাব্যের শেষ কথা নয়। 'গীতাঞ্জলি'র কবির সাক্ষাৎ 'বলাকা'তেও আমরা পাই, তাঁর ধর্মভাবমূলক তথা ঈশ্বরচিন্তাবিষয়ক কয়েকটি কবিতায়। গীতাঞ্জলি পর্বের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সঙ্গে এই পর্যায়ের কবিতার হয়তো সর্বতোভাবে মিল লক্ষ্য করা যায় না; দেবতা এখানে রুদ্র মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন—'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।' যিনি স্বভাবতই

'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'—তিনিই যে কখনো কখনো রুদ্র বেশে, দ্বৈতরূপে দেখা দিয়েছেন তার পরিচয় আছে বলাকার কোন কোন কবিতায়। কবি 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থে যেন এর কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেছেন—

"রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।"[১৯]

'বলাকা'র তিন-চার-পাঁচ সংখ্যক কবিতায় এই রুদ্রের কথা আছে আর সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতা 'ঝড়ের খেয়া'য় আছে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এর পরিচয়। 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির বিশ্বভারতী রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত পেন্সিলে লেখা যে পাঠ পাওয়া যায় তার সঙ্গে প্রবাসীতে পাঠানোর সময় কবির স্বহস্ত লিখিত পাঠ ও তার পরিমার্জনার তুলনা করলে কবির ঐ 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' এর ধারণার সঙ্গে যেমন পরিচিত হওয়া যায় তেমনি কবির সমালোচক মানসেরও কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কবিতাটি সুদীর্ঘ তাই সমগ্র কবিতার পাঠান্তরের আলোচনা না করে আমরা আপাততঃ ঐ কবিতার উপসংহার ভাগ সম্পর্কেই সামান্য আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো। এ ব্যাপারে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় মুদ্রিত (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪) 'ঝড়ের খেয়া'র বিভিন্ন পাঠ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাবে।

উক্ত পত্রিকায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত প্রবাসী পত্রিকার জন্য লিখিত পাঠের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় কবি 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'—ঔপনিষদিক এই অমর বাণীতেই কবিতাটি শেষ করেছিলেন। মূল পাঠেও কবিতাটি শেষ হয়েছিল এখানেই। প্রবাসীর জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি শেষ করতে বসে কবি স্থানকাল নির্দেশ করে তলায় নিজের নাম পর্যন্ত সই করেছিলেন, তারপর সেগুলো কেটে দিয়ে ছোট হাতের লেখায় আরও পনেরো পঙ্‌ক্তি সংযোজন, করেছেন পুনশ্চ নাম স্বাক্ষর করে আরও চার পঙ্‌ক্তি অন্যত্র লিখে তা ঐ কবিতার পরিসমাপ্তিতে জুড়ে দিয়েছেন। কবিতার শুরুতে কবি যাত্রীদলকে বন্দর ছেড়ে যাত্রা করতে বলেছেন, কিন্তু পরিসমাপ্তিতে নতুন কোনও সমুদ্রতীরে পৌছে দিতে পারেননি—কেবল চিরন্তন সত্য বাক্যটিই উচ্চারণ করে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। 'বলাকা'য় কবির গতি-অভিমুখী মন বারবার পথে বার হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত স্থির হয় নি—লক্ষ্যহীন গতি কবির লক্ষ্য নয়, তাই মৃত্যুকে জয় করে অমৃতের অধিকার লাভ করার মধ্যেই কবিতাটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে কবিমন

তৃপ্ত হয়েছে। প্রবাসীর জন্য লিখিত পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় ঝোঁকে কবিতাটি শেষ করেছিলেন—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?'

এই প্রশ্নবাক্য দিয়ে ; উত্তর যদিও সদর্থক, কিন্তু তাতেও কবিমন অতৃপ্ত ছিল, তাই শেষ চার পঙ্‌ক্তিতে মানবের অমর মহিমার কথা বলে কবিতাটি সুসম্পূর্ণ হয়েছে বলে কবি মনে করেছেন। এখানেও প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেও মানব-দেবতার অমর মহিমা সম্পর্কে কবির অটুট বিশ্বাস কবির কথাতেই ধ্বনিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের বীভৎসতা 'উদাসীন' কবির চিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে কবির চিত্তে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে বলে কোনো সুধী সমালোচক অনুমান করেছেন[২০] কিন্তু এই কবিতাটি গম্ভীরভাবে অনুধাবন করে আমাদের মনে হয়েছে—ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে কবির সচেতন মনে ক্ষণিকের জন্য সংশয় জাগলেও তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস অটুট রয়ে গেছে। বিধাতার মঙ্গলময় বিধান সম্পর্কে কবির নিজের মনেই প্রথমে প্রশ্ন জেগেছে—'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

"এক এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না ? সমস্ত বিশ্ব কেন পাপের বেদনা-কম্পিত হয়ে ওঠে ? কিন্তু, এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয় ; কারণ অতীতে ভবিষ্যতে, দূরে দূরান্তে, হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।"[২১]

পাপের শাস্তি, ঐহিক দুঃখভোগ সম্পর্কে কবি এই যে অভিনব স্বকীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ব্যাখ্যা মনে রাখলে কবির ঈশ্বর বিশ্বাসের অটলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ব্যাখ্যানুসারে কবির উপদেশ—

"তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখ দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে ? প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে ? ওরে তপস্বী

তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে, সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্‌ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।"

কবি বিশ্বাস করেন দুঃখ ও পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ যদি অকম্পিত বুকে বলতে পারে 'তোরে নাহি করি ভয়', যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে সে ঘোষণা করতে পারে—

'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক', তবে সত্য-স্বরূপ অবশ্যই ঝলসে উঠবে। কবিতার শেষ স্তবকে দেবতার অমর মহিমা সম্পর্কে কবির জীবনব্যাপী গভীর বিশ্বাসই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্ত্য সীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

মানুষ যখন তার মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে তখনই সে দেবতার অমর মহিমা লাভের অধিকারী হয়।

আবার অসীম যিনি, তাঁর মহিমাও সীমাতেই প্রকাশ পায়। তাই যিনি লীলাময় তাঁর লীলার পরিপূর্ণতার জন্য এই জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল এইজন্যই কবি 'তুমি-আমি' কবিতায় বলেছেন,—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
... ...
আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।

এই কবিতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এমন যেন কেউ মনে না করেন যে, এতে আমি সৃষ্টির আরম্ভের কোনো বিশেষ সময়কার কথা বলেছি। এতে কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব নেই। এখানে আমি মানে যে 'আমি' ব্যক্ত জগতের প্রতিনিধি স্বরূপ। বিশেষ সময়ে আমি সৃষ্ট হইনি। এমন কোনো এক সময় ছিল যখন আবীঃ যিনি তাঁর প্রকাশ ছিল না—তা বিশ্বাস করা যায় না।"

সর্বাবস্থায় দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবের মতো অদ্বৈতবাদী রবীন্দ্রনাথের মুখে এই দ্বৈত ভাবনামূলক উক্তিটি আপাততঃ বিস্ময়কর হলেও সীমা ও অসীমতত্ত্বে বিশ্বাসী কবির পক্ষে এই উক্তি অভিনব কিছু নয়। 'বলাকা'র "তুমি-আমি" কবিতায়

সৃষ্টিতত্ত্ব না থাকতে পারে কিন্তু এই কবিতার পরিপূর্ণ রসগ্রহণের জন্য সৃষ্টির আগের অবস্থা কল্পনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা কবি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অসীম যখন সীমার মধ্যে ধরা দেন তখনই তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব আর সেইভাবে ধারণা করলে দেখা যাবে—

"অসীম যখন আপনি একা—তখন তিনি অপূর্ণ। সীমার মধ্যেই পূর্ণের গৌরব—তাই তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন। আনন্দের পূর্ণতা রূপে রূপে প্রতিফলিত হতে চায়, কিন্তু সেই ইচ্ছা সফল হয় সৃষ্টি-তপস্যার বেদনায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, অসীম কেন সীমা মেনে আপনাকে প্রকাশ করেন?—আনন্দ কেনই-বা এমন দুঃখের তাপে ভরা? এ বিস্ময়ের কোনো উত্তর নেই। তবে মন যখন জাগে তখন খুশি হই—এই আগুন-ভরা আনন্দেই।"

'বলাকা'র ২০ সংখ্যক কবিতা' 'যাত্রাগানে' এই আগুন-ভরা আনন্দের কথা বলা হয়েছে---

আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র যে সব কবিতার আলোচনা করেছিলেন তা শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত হয়েছিল, পরে 'বলাকা'র গ্রন্থপরিচয়ে তা মুদ্রিতও হয়েছে কিন্তু ২০ ও ২১ সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নি। শ্রদ্ধেয় অনুলেখক মহাশয়ের সৌজন্যে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে, আমরা ঐ দুই কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা দেখার সুযোগ পেয়েছি। তবে ঐ অনুলিপি বক্তা কর্তৃক সংশোধিত নয় বলে তার থেকে দু-চার কথা উদ্ধার করা চলে।

উক্ত অনুলিপিতে দেখা যায় ২০ সংখ্যক কবিতার প্রথম স্তবকের ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন—

"ব্যথার আনন্দ বিশুদ্ধ। ভোগের আনন্দ তা নয়— ··· আপনাতে আপনি যে আনন্দ পূর্ণ যা বাহ্য সম্পদকে অপেক্ষা করে না তাকে দেখতে পাই—যখন বেদনার বাণীতে তা গীত হয়। আনন্দ দুঃখের বিরুদ্ধ নয়—কিন্তু সুখ। আনন্দ সুখ দুঃখকে আত্মসাৎ করে ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। সুখ দুঃখ তার নীচে। যারা আনন্দিত অগ্রাহ্য করে বাইরের ঐশ্বর্যকে তেমনি দুঃখে তলিয়ে যায় না।

আনন্দ দুঃখের বিপরীত নয়—তাকে পরিপাক করে জ্বলে। দুঃখের ইন্ধনে তার জ্যোতি জ্বলে।"

কবি বলেছেন 'দুঃখের দ্বারা আত্মার গৌরব অনুভব সত্য কথা, কবিত্বের কথা নয়।' এই আনন্দ যিনি স্বয়ং আনন্দময় তিনিও অনুভব করতে চান তাইতো কবি 'তুমি-আমি' কবিতার 'আমি এলেম, এল তোমার দুঃখ' এই অংশের আলোচনায় বলেছেন,

"তোমার আপনার মধ্যে দুঃখ নেই, আমিই তাকে এনেছি। কিন্তু তাতেই তো সব শেষ হয়ে যায় নি, আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে। অদ্বৈতের মধ্যে যেটা দ্বৈত সেটাই বড়ো কথা। শুধু monoism তো negative। সীমা সম্পর্কিত দুঃখের বিচিত্র লীলার ভিতরে যে আনন্দ সেটাই সত্যিকারের জিনিস।"

সীমার মধ্যেই অসীমের আত্মোপলব্ধির কথা 'গীতাঞ্জলি'তে কবি গানে গানে বলেছেন—সেই উপলব্ধিই 'বলাকা'তেও সত্য হয়ে উঠেছে। তবে সেখানে অসীমের পদে সসীমের নিরহঙ্কৃত আত্মনিবেদনই প্রাধান্য লাভ করেছিল, 'বলাকা' পর্বে কবি সীমার বিশিষ্টতার উপরে যেন একটু বেশী জোর দিয়েছেন। সীমা-অসীমের যে যুগ্মসত্তা কবি অনুভব করেছেন তার একটি সত্তা ভগবানের স্থানাভিষিক্ত হতে পারে কিন্তু আর এক সত্তা—ভগবানের যেটা প্রকাশ রূপ অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট এই জগৎ—মানুষ যার অন্তর্ভুক্ত মহত্তম উপাদান সেই 'আমি'র গৌরবই অধিক।

এই 'আমি' অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট এই জগৎ আপনার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করে দুঃখেরই মধ্য দিয়ে। 'বলাকা'র "মুক্তি" কবিতার শেষ স্তবকে কবি সেকথা বলেছেন এবং ঐ স্তবকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

"তুমি যখন আদরের মধ্যে সম্মানের দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করো তার হাজার নাড়ীর বাঁধনে যখন আমাকে জড়িত করো, তখন তোমাকে আমি জানতে পারি না—সে আশ্রয়কেই জানি। কিন্তু যখন তুমি সম্মানের আচ্ছাদন থেকে আমাকে দূরে ফেলো তখন সেই বিচ্ছেদের আঘাতে আমার চৈতন্য হয়, আমি তোমার সেই আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে তোমার মুখ দেখতে পাই। যখন সম্মান থেকে মুক্ত হয়ে, তোমার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে, তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তখনই তোমাকে দেখতে পাই।"

২০ সংখ্যক কবিতায় কবি এই দুঃখ থেকে আনন্দকে পাবার আকুলতা

কেমন ভাবে আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায় তার কথা বলেছেন। ঐ কবিতার পঞ্চম স্তবকের ব্যাখ্যায় কবি বলেছিলেন—

"আমাদের হৃদয়ে যে গভীর বিরহ দুঃখ তা জানাকে হারিয়ে নয়—অজানার বিরহ অন্তরে জাগে—কখন জাগে? ঘোর মৃত্যুর ভিতর হয়তো সে অসীম স্পর্শ লাভ করি।...আপনার স্বরূপ জড়ত্বে পায় না—অভ্যাসে আঘাত ছিন্ন হলে আত্মার স্বরূপ হঠাৎ দেখতে পায়।

"বলাকার প্রথম কবিতাতে এই ভাবটি ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্বযুগের গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ করে নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলার কথা।"

'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের নবীনবরণের যে আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে তার কারণও বুঝা যায়। 'বলাকা'র ৩নং কবিতা 'আহ্বান'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন—

"প্রতি যুগে যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এ যুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসান প্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন এ কথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা। মনে হতে পারে বুঝি লাইন মিলিয়ে কতকগুলি কবিতা লেখবার উদ্যোগেই এগুলি লেখা হয়েছে, কিন্তু তা নয়, আমার ভিতরে একটা তাগিদ এসেছিল—তারই প্রেরণায় এগুলি রচিত হয়। অনেক সময়ে কোনো কোনো রচনাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বলে আপাততঃ মনে হয়, পরে দেখা যায় তা ঠিক নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ খোঁজে। নিজের জীবনের যে ঘটনাগুলি নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অঙ্গীভূত, সেগুলোকে উপকরণরূপে ব্যবহার করে মনের কোন্-একটা নিগূঢ় অনুভূতি নিজেকে ব্যক্ত করে।"

কবির এই উক্তির আলোকে বিচার করলে 'বলাকা'র যে চার-পাঁচটি কবিতা বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তাদের কবি কেন যুদ্ধের কবিতা বলতে চাননি তার কারণ বুঝা যায়। 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতা 'সর্বনেশে'র আলোচনা প্রসঙ্গে কবি তাই বল্লেন, "আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত

রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।"

'য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে।' সুতরাং এ কবিতা সম্পর্কে কবির কথা সত্য হতে বাধা নেই কিন্তু চতুর্থ পঞ্চম কবিতা 'শঙ্খ' ও 'পাড়ি' সম্পর্কে এ কথা পুরোপুরি খাটে না। কবি নিজেও ঐ দুই কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের চিন্তা কবিতা রচনাকালে কবির মনে কাজ করেছিল। কিন্তু কবির স্থির বিশ্বাস ছিল—'যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌছবার সিংহদ্বারস্বরূপ।' কবি বলেছেন,

"আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসে নি। একটা ভাবীকাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে।"

'বলাকা' রচনাকালে যে ভাব কবিকে উৎকণ্ঠিত করেছিল, কবি বলেছেন, 'বলাকা'র ব্যাখ্যা ও আলোচনাকালেও সেই ভাব কবির মনে জেগেছিল। সুতরাং কবিতা রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার তিনিই সব চেয়ে বড়ো সাক্ষী তাতে সন্দেহ নেই। সেই সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য ধরলে বলতে হয় বলাকায় মানব সাধারণের কথাই কবির আসল বক্তব্য, কবি মনে বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ খুঁজেছে। সবুজপত্রের তাগিদে নয়, বিশ্ব-যুদ্ধের প্রেরণায়ও নয়, আন্তরিক প্রেরণাবশেই কবি 'বলাকা'র কবিতাগুলি লিখেছেন। 'বলাকা'র নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি যে কথা বলেছেন সেই কথা দিয়ে এই কাব্যের কবিকৃত আলোচনার উপসংহার করা চলে। কবি বলেছিলেন,

"বলাকার পাখা—যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং 'বলাকা' বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে বুনো হাঁসের দল যখন নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তার ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।"

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ-পথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি না। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে! কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের এই বাণী—'এখানে নয়, এখানে নয়।'

[-এই অকারণ চঞ্চলতার যে খুব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে তা নয়, কিন্তু এইটুকু তারা জানে যে তাদের থামবার যো নেই, তাদের চলতেই হবে। বুনো হাঁসের উড়ে যাওয়ার মধ্যেও সেই অস্পষ্ট আবেগের ভাব আছে।]

'বলাকা' নামটির সঙ্গে কবির পরিচয় হয়তো সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রিয় কবি কালিদাসের মেঘদূতের পূর্বমেঘের সেই বিখ্যাত শ্লোক থেকেই—

গর্ভাধানক্ষণ পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ,
সেবিষ্যন্তে নয়ন সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥

বলাকারা যখন আকাশে আবদ্ধমালা হয়ে দুলতে দুলতে শূন্যমার্গে উড়ে চলে তখন তারা শুধু আমাদের চোখকেই জুড়ায় না সেই সঙ্গে আমাদের মনে সর্ব-বাধা-বিঘ্ন-জয়ী একটা অজানার উদ্দেশ্যে অন্তহীন যাত্রার কথাও ধ্বনিত করে তোলে। শ্রীনগরে ঝিলম নদীতে বোটে বসে বলাকার পাখার শব্দে এক সন্ধ্যায় কবির মনে নিখিলের এই যাত্রার বাণীই ধ্বনিত হয়েছে—"এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেমে থাকবার নয়, আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে-ই কবি নাকি নিজের ব্যক্তিগত এই কথাটুকু 'বলাকা' ব্যাখ্যা কালে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছিলেন—

"আমার জীবনও এক একটি বাসা বেঁধে তাতে বেশি দিন বাস করতে পারি নি। ভেঙে চুরে আবার তাকে বের করতে হয়েছে। গান গেয়েছি—

'ঘরের ঠিকানা হোলো না গো,
মন করে তবু যাই যাই—'

সে ঠিকানা কি ভগবানের মধ্যে? কিন্তু তিনি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন 'সে ঠিকানা মানুষেরই মধ্যে।'

তাঁকে খুঁজতে গিয়ে বারবার এই জবাব পেয়েছি—আমাকে পাবে মানুষের মধ্যে। সেখানে আমি কবি হয়ে মানুষের সুখেদুঃখে ভাবে চিন্তায় তাঁরই

সাড়া পেয়েছি। আবার তাঁর অসীম অনন্ত অপার স্বরূপও আমাকে কম ব্যাকুল করে নি। কাজেই আমি যেমন শাশ্বত শান্তির আনন্দ জানি তেমনি প্রকৃতি ও মানবের গতিতেও আমার কম উৎসাহ নেই।"[২২]

'বলাকা' পর্বের কবিতার ফলশ্রুতিরূপে যদি কবির এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা যায় তবে বলতে পারি গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতার সঙ্গে বলাকা পর্বের কবিতার যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও মূলগত বক্তব্যে মিল আছে। 'গীতাঞ্জলি'তে কবি সীমার মাঝে অসীমকে আপন সুর বাজাতে শুনেছেন, 'বলাকা'য় কবি মন সান্তের অভিমুখী হলেও বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত-গতিপ্রবাহকে উপলব্ধি করে অন্তরে অনন্তের স্পর্শলাভ করেছে। আর সেইভাবে এখানেও সীমার মধ্যে থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন-সাধিত হয়েছে বলা চলে।

পলাতকা (১৯১৮)

'বলাকা'র বিস্তারিত আলোচনার পাশে 'পলাতকা' সম্পর্কে কবির সম্পূর্ণ নীরবতার কথা স্বভাবতই আমাদের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলীতে এই কাব্যখানি যেন অবহেলিত। এই অবহেলার কারণ কবিতাগুলির বিশেষ প্রকৃতি—গল্পচ্ছলে কথিত বলেই এই কবিতাগুলির টীকা নিষ্প্রয়োজন মনে হতে পারে। নাম-কবিতা 'পলাতকা'কে কবির শুধু এই কাব্যের নয়, সাধারণভাবে রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকারূপে স্বীকার করে কোনও সমালোচক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। উক্ত সমালোচকের মতে,—

'শান্তিনিকেতন-পল্লীর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের হরিণ নিরুদ্দিষ্ট হইবার পরে কবিতাটি লিখিত।'

হরিণ ও কুকুর ছানার অসম বন্ধুত্বের ও বিষম বিচ্ছেদের ব্যাপারটির উপরে সীমা ও অসীমের তত্ত্ব আরোপ করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

"হরিণ ও কুকুরের বন্ধুত্বকে অসম বলিয়াছি, হরিণ কখনো পোষ মানে না আর কুকুর স্বভাবতই পোষমানা, একজন মানুষ-ঘেঁষা, একজন মানুষ-ছাড়া প্রাণী। একজন ঘরের, একজন দূরের। এমন অসম ক্ষণকালের জন্য মিলিতে পারে কিন্তু স্থায়ী মিলন সম্ভবে না। এ যেন সীমা-অসীম তত্ত্বের কাহিনীময় রূপ। রবীন্দ্রকাব্যে সীমা ও অসীম নিবিড় প্রেমে বারম্বার পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ কখন আকাশে দূরের নিশ্বাস সমীরিত হয়, অমনি সীমা অসীমের ক্ষণিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়।"[২৩]

উক্ত সমালোচক 'বলাকা' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন—"সীমা অসীমের ভারসাম্যে বিধৃত বিশ্বসরোবরের উপরে বলাকার অভিজ্ঞতা প্রচণ্ড অভিঘাত আসিয়া পড়িয়া বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া—সীমা অসীমের জোড় আলগা করিয়া দিল।"[২৪] আমাদের মনে হয় 'পলাতকা' সম্পর্কেই এই মন্তব্য খাটে বেশী, এখানে সত্য সত্যই সীমা অসীমের জোড় আলগা হয়েছে এবং সীমার উপরেই কবি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 'পলাতকা'র দশটি গল্প-কবিতাতে তারই প্রমাণ পাই।

'পলাতকা'র 'শেষ গান' সম্পর্কে কবি প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখেছেন,

"চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেচি। ···এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে—কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে।"[২৫]

এই কবিতাটি কবির 'পলাতকা' 'পরবর্তী' এক কাব্য 'পূরবী'র নাম-কবিতা রূপে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবির শেষ-জীবনের কাব্যের সাধারণ বাণীরূপে এর মর্ম উপলব্ধি সহজ হবে। কবিতাটিই এখানে স্বয়ং-ব্যাখ্যাত।

'পলাতকা'র শেষ কবিতা 'শেষ প্রতিষ্ঠা'য় কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু-বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। বেলার মৃত্যুকালে শান্তিনিকেতন থেকে রথীন্দ্র-নাথকে লেখা এক পত্রে কবি যে-কথা বলেছিলেন এই কবিতাতেও যেন তাই পুনরায় ঘোষণা করেছেন—

"জানি, বেলার যাবার সময় হয়েচে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে (শান্তিনিকেতনে) আমি জীবন-মৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই।"[২৬]

এই পত্রের সুরেই 'শেষ প্রতিষ্ঠা'র উপসংহারের বক্তব্য অনুধাবন-যোগ্য—

মানুষের কাছে
যাওয়া আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

এই হল কবির থাকা-না-থাকা, পাওয়া ও হারানোর মূল তত্ত্বকথা।

শিশু ভোলানাথ (১৯২২)

'পলাতকা'র প্রায় তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয় 'শিশু ভোলানাথ'। নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা তখন প্রায় পলাতকা হয়েছে। কাব্য রচনার কাজ একরকম ছেড়ে দিয়ে কবি এই সময় শান্তিনিকেতনে মাষ্টারিতে ব্যস্ত—কোনো একটা ফাঁকে সবুজপত্রের জন্য কিছু কিছু লিখবার চেষ্টা হয়তো করেন কিন্তু 'মনের বেগটা লেখার দিক থেকে অন্য দিকে সরে গেছে।' স্কুল মাষ্টারির কাজ কিছুকালের জন্য ভালোই লাগে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু মুখ্যতঃ কবি তাই গুরুমশাইগিরি তাঁকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারে না, বিদ্যালয়ের একঘেয়ে কাজের ভার থেকে মন মুক্তি পেতে চায়, তখন হয় 'দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে' আর না হয় শিশুর কল্পনার জগতে মানস প্রয়াণে কবি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

দূরে পালানোর সুযোগও এই সময় জুটে গেছে। আহমদাবাদে গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য গান্ধীজীর আমন্ত্রণে ২৯শে মাচ ১৯২০ কবি বোম্বাই যাত্রা করেছেন। কয়েকমাস পরে অক্টোবরেই আবার তৃতীয়-বারের মতো আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ এসে গেল—এবারে একাদিক্রমে ছ মাস কাল কবির যুরোপ আমেরিকায় অতিবাহিত হল (অক্টোবর থেকে মার্চ ১৯২০-১৯২১)

কিন্তু দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে কবির চিত্ত শান্ত ত হইল না বরং দীর্ঘকাল আমেরিকার বস্তুগ্রাসী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ঘোরতর কার্যপটুতার দুর্গতি—'গতির চরম দুর্গতি' চাক্ষুষ করলেন কবি। ফলে একদিকে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব-ভার অন্যদিকে আমেরিকার বস্তুসঞ্চয়ের গুরুভার থেকে মনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কবি 'শিশুদের মনের ভিতরে বাসা' করে নিজের শৈশবস্মৃতি চারণ শুরু করলেন—আর তারই ফলে সৃষ্টি হল 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলি।

এই কবিতাগুলি রচনার প্রেরণা ও ভাবউৎস সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন,

"কিছুদিন আগে কতকগুলি ছেলেদের কবিতা লিখেছিলুম। লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূল সত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েচে, কিন্তু এই কথাটি কিছুকাল থেকে বার বার আমি ভাবচি এবং শিশুর

কবিতায় ('শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' উভয় কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কেই কবির এই বক্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য) এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায়, সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্তব্য সাধন করচে বলে গৌরববোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই— তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দময়। আজকাল আমার প্রায়ই সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল, যখন আমার কোনো দায় ছিল না।"[২৭]

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যপ্রকাশের অল্প কিছুকাল পরে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই পত্রে কবি যা বলেছেন তাকে ঐ কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতার মর্ম ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

আপনার সমস্ত বৈভব দিয়ে কবি যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সেই বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ২০শে ফাল্গুন ১৩২৮ সালের এক বক্তৃতায় কবি বলেছিলেন -

মনেই কর না কেন যে এ আমার একটা খেলা। আমার হৃদয়, প্রেম, অর্থ সামর্থ্য বয়স সমস্ত দিয়ে সংসার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি যদি এমন খেলাই করতে চাই তবে তাই আমায় করতে দাও।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছিল— গান গাওয়া, গাছে চড়া, ছবি আঁকা—এক কথায় খেলাচ্ছলে বিদ্যালাভের যে সুযোগ তারা পেয়েছিল তার মূলেও আছে শিশু ভোলানাথের ঐ দীক্ষা। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (১৩২৮ সালের ৭ই পৌষ) কবির ভাবনা হয়েছিল 'খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে।' কবির এ ভয় যে অমূলক নয় তার প্রমাণ আজকের বিশ্বভারতীর দশা দেখলেই বুঝা যায়। আজ 'শিশু ভোলানাথে'র কবি বেঁচে থাকলে কি করতেন বলা শক্ত হয়তো "খেলেনা-ভাঙার খেলা" খেলিয়া যাইতেন নিজের সবস্ব দিয়া গড়া এই দামী খেলনাটা লইয়া।"[২৯]

'শিশু ভোলানাথে'র দ্বিতীয় কবিতা 'শিশুর জীবনে' কবি বৈদান্তিকের ন্যায় যে নিরাসক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন—আপন সৃষ্টিকেও আঁকড়ে না-থাকার যে মোহমুক্ত জীবনদর্শনের কথা তত্ত্বাকারে সেখানে বলেছেন বিশ্বভারতী সম্পর্কে

কবির সেই মোহমুক্ত মনের পরিচয় আমরা পাই বছর দশেক পরে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এক পত্রে। বিশ্বভারতীর পরিচালন ভার কবির নিজেরই ব্যবস্থাপনায় যখন তাঁরই জীবদ্দশায় অপরের হাতে চলে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন কবি ঐ পত্রে লিখেছেন—

"বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মমতাবোধ করবে আমার হাসি পাচ্চে—কিছু আসে যায় না এটা কিভাবে টিঁকে যায়। আমার ধ্যানের সামগ্রী আইডিয়ারূপেই থাকবে—যে সোনার তরীতে সেটাকে সংগ্রহ করে নেবে, সে যদি আমাকে বাদ দেয় এবং ডোবে তবুও আমার কাজ আমি করেচি, আরামে নিশ্চিন্তভাবে জীবনটাকে ভোগ করবার উপকরণ আমার হাতে যথেষ্ট ছিল আমি তা গ্রাহ্যই করিনি—এইটেই হল আসল কথা—এই কথাটাই আমার মধ্যে রইল—বাকিটা সরকারী মালের নৌকোয় বোঝাই করে দিয়ে ডিমক্রাসির হাটে তার যে গতি হয় তা হোক।"[৩০]

'সোনার তরী'র চাষীর সেই বিষাদকরুণ শূন্যতাবোধের কি আশ্চর্য রূপান্তর—এই 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতে, যখন তিনি পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন।

'শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার বছর দুই পরে লেখা ডায়ারির পাতায় কবির নিরাসক্ত মনের পরিচয়টি ফুটে উঠতে দেখা যায়। কবি 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলি রচনার কৈফিয়ৎ সেখানে এইভাবে দিয়েছেন—

"শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলি খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম? সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়,—নিতান্ত নিজের গরজে।...

কিছুকাল আমেরিকায় প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে।...পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না।...লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংস শাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয় গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।...

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু-সঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। ··

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসে-ছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে।”৩১

কবিমন গান রচনার সময় যেমন নিবিড় আনন্দ অনুভব করে তেমনি আনন্দ পায় ‘শিশু ভোলানাথে’র কবিতাগুলি রচনাকালে। তখন “এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়। কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।”

ঐ ডায়ারির উপসংহার করেছেন কবি যেন ‘শিশু ভোলানাথে’রই দ্বিতীয় কবিতাটির ভাষায়—

> বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
> আরম্ভ হয় দিন
> বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।

“যে লীলা-লোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, সে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্‌বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে।”

সে হাওয়াতে মনকে ভাসিয়ে দিয়ে ছেলের সঙ্গে নিত্য ছেলেমানুষ হয়ে কবি এই কাব্যে শিশু ভোলানাথের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কি করেছেন কবির নিজের ভাষাতেই সে কথা বলে এই কাব্যের কবিকৃত আলোচনার উপসংহার করা চলে—

সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে।

পূরবী (১৯২৫)

'বলাকা'র পর 'পূরবী'ই রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। এই কাব্যের কবিকৃত বিস্তারিত একটি পটভূমিকা পাওয়া যায় 'পূরবী'র "পথিক" অংশের সমকালীন রচনা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি'তে। 'পূরবী'র বেশির ভাগ কবিতাই পথিক কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাকালে, দক্ষিণ আমেরিকায় ও সেখান থেকে ফেরার পথে লেখা। জাহাজে কবির হাতে সুদীর্ঘ অবসর তাই কবিমন অবাধে কাব্যসৃষ্টি করেছে এবং সেই কাব্যের ভাষা রচনা করে ডায়ারির পাতা ভরিয়েছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর "সাবিত্রী" কবিতাটি রচিত। ঐ দিনকার ডায়ারির পাতায় লেখা আছে—

"সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই উৎসরূপে রয়েছে ওই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান।"

"আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে নিয়ে যাও। ...তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন : 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—আমাদের চিত্তে তিনি ধী শক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করেছেন। ঈশোপনিষদে বলেছেন, "হে পূষন্‌, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি ; আমাদের মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।"

বাদলার অন্ধকারে সূর্যের আলোকবঞ্চিত কবির চিত্তে যে ছায়াছন্ন বিষাদ বিরাজিত ছিল, তা ভারতীয় ঋষিকবিদের ব্যাকুলতারই অনুরূপ। 'সাবিত্রী' কবিতার জন্মলগ্নে কবিচিত্তের ঐ আকৃতিই কবির দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন আবিলতামুক্ত আত্মার সত্যস্বরূপটি আবিষ্কার করাই

মানুষের ধর্ম। জগৎ প্রসবিতা সবিতার সঙ্গে কবি আপনার অন্তরের নিগূঢ় যোগসূত্রটি খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বুঝেছেন সূর্যের মধ্যে যে গুহাতীত সত্য কবির নিজের মধ্যেও সেই সত্যই লুকিয়ে আছে। তাই সূর্যকে তিনি 'বন্ধু' রূপে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্ম খানি
দেখা দিক্ ফুটি।

এই প্রার্থনা শুধুমাত্র কবির একার নয়, এ প্রার্থনা বিশ্বজগতের—যাত্রীর ডায়ারিতে কবি বলেছেন—

"হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে "পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে জয় হোক! বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ।··· আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।"

সূর্যের জ্যোতিঃস্পর্শে ঢাকা খোলাতেই যেমন পৃথিবীর, প্রাণের লীলা তার ফুলফলে বিকাশ, তেমনি সূর্যের জ্যোতিতে আত্মদর্শনের আকুলতা—ঢাকা-খোলার আকৃতি নিয়েই কবির কাব্যের প্রকাশ।

'পূর্ণতা' কবিতাটি লেখা ১লা অক্টোবর, ১৯২৪। আগের দিন ৩০শে সেপ্টেম্বরের ডায়ারিতে কবি মেয়েপুরুষের প্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করে লিখেছেন—

"নারীর প্রেমের মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।··· বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয় তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলেছে—

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
তুমি যে নয়নের তারা—

সেখানে বঙ্গকিনী বামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে।"

'পূর্ণতা' কবিতাতে বিরহ ও মিলন সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে কবি অবশেষে যেন নিজের মন্তব্য সংযোজন করেছেন—

তারপরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখা শুনা হল সারা
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর
তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নি বাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

'পূরবী কাব্য তথা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমকাব্য বিরহের শূন্যতা মন্থন-জাত স্বপ্নের ভুবন।'[৩২] সমালোচকের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। আর এই ভুবনে যার সঙ্গে কবির ভাব সম্মেলনের নিত্যলীলা চলছে তিনি কবিপ্রেয়সী—তাঁর রস-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁর লীলাসঙ্গিনী। ইনিই কবির আশৈশবের লীলাসহচরী—তাঁর মানসসুন্দরী। ইনিই বিচিত্রবেশে কবিকে বার বার দেখা দিয়েছেন—কবির কাব্যপ্রেরণা যখনই স্তিমিত হবার উপক্রম করেছে তখনই তিনি সৃষ্টির আদি উৎস সবিতা মধ্যবর্তিনী জ্যোতি সমুদ্রের সঙ্গে কবিপ্রাণকে যুক্ত করে দিয়ে তাঁকে নবতর সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন—'চিত্রা' পর্বে এঁকেই আমরা জীবনদেবতা বলেছি—কবির অরূপ উপলব্ধির বিস্তৃত অধ্যায়ে 'গীতাঞ্জলি' পর্বে কবিকে বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে ইনি কিছুকাল তাঁরই আড়ালে ছিলেন। 'বলাকা' পর্বে 'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' যৌবনের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাপসের 'তপোভঙ্গ' হল—কবির সাথে কবি-উমা—তাঁর পূর্বজীবনের লীলাসহচরীর পুনর্মিলন ঘটল।

'সাবিত্রী' কবিতায় কবির যে আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আর 'আহ্বান' কবিতায় সেই কাজে লীলা সহচরীর ভূমিকাটি বিশ্লেষিত হয়েছে। বহির্বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে যে একটি পরম ঐক্যসত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে কবি তাকে আপনার অন্তরে অনুভব করে বহুর অন্তরালবর্তী সেই 'একে'র সঙ্গে অন্তরতম 'এক'কে মেলাতে চেয়েছেন কারণ সেই মহামিলনেই ঘটে চরম আত্মোপলব্ধি। কিন্তু এই আত্মোপলব্ধি—তথা আত্মপ্রকাশের মূলে প্রেরণাদাত্রী শক্তিরূপে যিনি কাজ করবেন দীর্ঘকাল কবি তার দর্শন বঞ্চিত ছিলেন। জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কবি সেই অভিসারিকার আবির্ভাবের পরম প্রত্যাশা করছেন—তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রদীপশিখা জ্বলে উঠবে ঐ নারীর প্রেরণা স্পর্শে—তার কাব্যবীণা সংগীতের সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে সেই নারীর অঙ্গুলি স্পর্শে। কবি বলেছেন—

> নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
> চরম আহ্বান!
> মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণতানে
> মোর শেষ গান।

শুভ্র পরিণত বার্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে কবি অনুভব করেছেন পূর্ণতানে শেষ গান আজও সাঙ্গ হয় নি—জীবনের 'শেষ বসন্তে' কবি আরও একবার শেষ কথাটি বলতে চেয়েছেন। কবির কণ্ঠে পূরবী রাগিণীতে বিদায়ের বিষাদ বাণী ধ্বনিত হয়েছে—

> দেখ না কি হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
> শেষ রাগিণীর বীন।

আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় কবি আত্মোপলব্ধির অসম্পূর্ণতার কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেছেন—

> জানি জানি, আপনার অন্তরের গহন বাসীরে
> আজিও না চিনি।
> সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
> শেষ পূজারিণী?…
> অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
> নিতে হল তুলে।

রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে !

কবি আশাবাদী এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী , তাই তিনি আশা করেন জীবনে যে আহ্বান শুনতে পেলেন না মরণের মধ্য দিয়ে সেই আহ্বান তাঁর কানে আসতে পারে—জন্মান্তরে-নবতর জীবনে—রসজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আহ্বান কবির জীবনে শেষ পরিপূর্ণতা নিয়ে আসবে এই বিশ্বাসের বাণী দিয়েই 'আহ্বান' কবিতার পরিসমাপ্তি।

কিন্তু আমরা বলছিলাম 'পূরবী'র কবিতা ও 'যাত্রী'র ডায়ারির নিবিড় ঐক্যের কথা। 'আহ্বান' পরবর্তী কয়েকটি কবিতা—'ছবি', 'লিপি', 'ক্ষণিকা' 'খেলা' ও 'পূরবী'-র নাম কবিতার কবিকৃত গদ্যরূপ আমরা পাই যথাক্রমে যাত্রীর ২রা, ৩রা, ৫ই অক্টোবর ১৯২৪-এর ডায়ারির পাতায়।

'ছবি' কবিতা রচনার তারিখ ২রা অক্টোবর, ঐ দিনের ডায়ারিতে আছে—

"এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিম দিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম।··· আকাশ ও সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসান দিনের শেষ আলোয় যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে—এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।"

অতঃপর কবি জাপানীদের সৌন্দর্যজ্ঞান—গৃহসজ্জার বৈশিষ্ট্য একটি দেয়ালে একখানি মাত্র ছবি টাঙানোর কথা উল্লেখ করে তার কারণ নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

৩রা অক্টোবর তারিখের ডায়ারিকে কবি নিজেই 'লিপি' কবিতার আগমনী বলেছেন—

"সূর্যোদয়ের আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো বারে বারে।

বুঝতে পারলুম আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এই রকমের ধুয়ো অনেক

সময়ে উড়োবীজের মতো মনে এসে পড়ে। কিন্তু সব সময় তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।"

অতঃপর 'লিপি' কবিতার বীজ কবির চিত্তক্ষেত্রে কিভাবে অভিজ্ঞতার খাদ্য পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে বিশেষ আকার ধারণ করেছে ডায়ারিতে কবি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'লিপি' কবিতার পরবর্তী 'ক্ষণিকা' ও 'খেলা' কবিতাদ্বয়ের এবং অংশতঃ পূরবী-র নাম-কবিতার ব্যাখ্যা পাই ৫ই অক্টোবরের ডায়ারিতে। কবি লিখেছেন—

"এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।...মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়ে ছিল, হাসিয়ে ছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে।...তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।" মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল তাদের ভুলেই গেছি। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইলে তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয় তারাই চিরকালের।"

'ক্ষণিকা' ও 'খেলা' কবিতার মধ্যে কবি এই কথাগুলিই বলতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতির প্রথম অংশের সঙ্গে 'পূরবী'র নাম-কবিতার শুধু ভাবগত নয়, ভাষাগত মিল সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—

'যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো' প্রভৃতির সঙ্গে 'কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়ে ছিল, হাসিয়েছিল; আমার কাছ থেকে গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল'—এই অংশ সহজেই তুলনীয় হতে পারে।

এমনি মিল আরোও লক্ষ্য করা যাবে—'পূরবী'র অনেক কবিতার সঙ্গে 'যাত্রী'র ডায়ারির অনেক বর্ণনার হুবহু মিল দেখানো যায় কিন্তু তার আর

প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের উপরের উদ্ধৃতির পাশাপাশি 'পূরবী'র কবিতাংশের তুলনা করলেই দেখা যাবে এই দুই রচনা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে একে অপরকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'পূরবী'র কবিতা ও ডায়ারির ঐ ধারাভাষ্য একেবারে সমকালীন—ফলে কবিতা থেকে নিজের মনকে দূরে সরিয়ে সাধারণ সমালোচকের মতো নিরাসক্তভাবে তার আলোচনা করা কবির পক্ষে সম্ভব হয় নি কবিতার বক্তব্যকেই কবি কখনো ডায়ারির পাতায় বিস্তারিত করেছেন কখনও ডায়ারির লেখাকেই কাব্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কবিকৃত এই স্বকাব্যালোচনাকে প্রকৃত অর্থে সাহিত্য সমালোচনা বলা না গেলেও কবিতার—গদ্য ভাষ্যরূপে এই আলোচনা পাঠ যে কবিতা উপলব্ধির কাজে পাঠককে বিশেষ সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নেই। কবি নিজেও এই কাব্য ও গদ্য রচনাকে পরস্পরের পরিপূরক বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

"সেদিন শুধু কাব্য লিখিনি, গদ্যও লিখেছি; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।"[৩৩]

এই দুই রচনার মধ্যে কালের যথেষ্ট ব্যবধান না থাকায় এরা যে যথার্থ অর্থে সমালোচনা হয়ে উঠতে পারেনি সেকথাও কবি নিজেই 'ঝড়' কবিতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কালিদাস নাগকে এক পত্রে বলেছিলেন। কবি লিখেছেন—

"শরীর মন যখন পীড়িত হয় তখন আমি কবিতা লিখি। জলকে পীড়া দিলে তবে সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারা ছোটে। প্রশান্তকে কিস্তি কিস্তি কবিতা (পূরবী) পাঠিয়েছি, নিশ্চয় দেখেচ, ২৪ অক্টোবর 'ঝড়' বলে যে কবিতা লিখেছিলুম তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারচি যে, সেই সময়ে, হাওয়া বেয়ে একটা নিবিড় ব্যথা আমার মনকে প্রবল ঝাপটা দিয়ে গিয়েছিল। এবারকার কবিতাগুলো যেন স্বপ্নে লেখা—ভালো কি মন্দ তা বুঝতেই পারি নে,—যখন খুসি তখন, যেমন খুসি তেমন করে লিখেই গেছি। আমার কবিত্বশক্তির মাপকাঠি হাতে যারা গম্ভীর হয়ে বসে থাকে তারা যে এই বিশ্বের কোনোখানে আছে তা একেবারেই মনে ছিল না। মাঝখানে দীর্ঘ কিছুকাল ভোলবার সময় না দিলে এ কবিতাগুলো সম্বন্ধে আমি নিজেই বিচার করতে পারবো না।"[৩৪]

তবু 'পূরবী'র কবিতাগুলি ঐ গ্রন্থ প্রকাশের সমকালেই যে কবি বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন তার পরিচয় দিয়ে এই কাব্যের কবিকৃত আলোচনার উপসংহার করা চলে।

'পূরবী, কাব্যখানি কবি উৎসর্গ করেছেন 'বিজয়া'কে। এই মহীয়সী নারী—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উপলক্ষ করেই পূরবীর "অতিথি' কবিতাটি লেখা। স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত কবির কাব্য পাঠে তিনি কবির ভক্ত হয়েছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে তিন সপ্তাহের সমুদ্র পাড়ি কবির পক্ষে কি অসহ্য পীড়াদায়ক হয়েছিল তার পরিচয় যাত্রীর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ তারিখের ডায়াবিতে আছে। আর্জেন্টিনা পৌঁছে অসুস্থ কবি সেখানকার বিখ্যাত কবি লেখিকা ও ললিতকলায় উৎসাহদাত্রী কুমারী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাহচর্য লাভ করলেন। শারীরিক অসুস্থতার ফলে কবির দেহমনে যখন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তখনই মাধুর্য সুধায়, সেবায় যত্নে কবির প্রবাসের দিনগুলি পরিপূর্ণ করে দিলেন এই 'বিদেশিনী' নারী। এঁকে কবি আপন অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে 'অতিথি' কবিতায় বলেছেন—

> প্রবাসের দিন মোরে পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী,
> মাধুর্য সুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
> দূরদেশী পথিকেরে। ··
> জানি না তো ভাষা তব, হে নারী শুনেছি তব গীতি,
> "প্রেমের অতিথি কবি চিরদিন আমারি অতিথি।"

ভিক্টোরিয়ার অতিথিরূপে সান ইসিডোব সুরম্য পরিবেশে বাসকালে কবি যে কবিতাগুলি রচনা করেন, তার অনেকগুলিই আর্জেন্টিনার সুন্দর পরিবেশ এবং বিজয়ার স্মৃতি বিজরিত। কবি নিজেই বিজয়াকে লেখা এক পত্রে সে কথা স্বীকার করেছেন—

The memory of those sunny days and tender care has been encircled by some of my verses the best of their kind , the fugitives are made captive, and they will remain, I am sure, though unvisited by you, seperated by an alien language."[৩৫]

ভাষার এই বাধা থাকা সত্ত্বেও কবি 'পূরবী' কাব্যখানি ঐ বিদেশিনী নারীর সেবামাধুর্যের প্রতিদান হিসাবে নয়, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করেন। সান ইসিডোর সুরম্য পরিবেশে বিজয়ার প্রীতিমাধুর্যে অভিসিঞ্চিত হয়ে এই সময় কবি যে কবিতাগুলি লেখেন সেই 'বিদেশী ফুল', 'অন্তর্হিতা', 'আশঙ্কা',. 'শেষ বসন্ত' 'বিপাশা', 'চাবি,' 'প্রভাতী', 'অদেখা', 'প্রবাহিণী', 'বনস্পতি' প্রভৃতি কবিতাকে কবি 'সোনার তরী'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মতই

best of their kind বলেছেন। সুতরাং শুধু কাব্য ব্যাখ্যাই নয় সমালোচকের মূল্যায়নের ভাবটিও 'পূরবী'র আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়।

লেখন (১৯২৬)

'পূরবী'র পর রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া', মাঝে আছে একখানি স্বল্পায়তন ও একখানি স্বল্পপরিচিত এবং অধুনা লুপ্ত কবিতিকা গ্রন্থ 'লেখন' ও 'বৈকালী'[৩৬]। এই দুই কবিতিকা গ্রন্থ সমসাময়িকই শুধু নয় মুদ্রণ পদ্ধতিতে সগোত্র অর্থাৎ দুখানিই কবির নিজের হাতের লেখা এবং জার্মানিতে ছাপা। 'লেখন' মুদ্রণ প্রসঙ্গে কবি যা লিখেছেন তা 'বৈকালী' এবং আরও পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'স্ফুলিঙ্গ' কবিতিকা গ্রন্থ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এইজন্য এই তিনখানি গ্রন্থের আলোচনাই একত্রে করা হল।

কবি 'লেখন' প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।"[৩৭]

কবিতাকণিকাগুলির জন্মকথা বলতে গিয়ে কবি আরও লিখেছেন—

"এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি ক'রে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়। অন্যমনস্কতায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়ের আভাস রয়ে গেল।"[৩৮]

স্বাক্ষর লিপির দাবি মেটাতে গিয়ে যে কবিতার উৎপত্তি তার রূপবৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তুর পরিচয় ও কবি নিজেই দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"দু-চারিটি বাক্যের মধ্যে এক একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্য বর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। ··

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হইনি।"[৩৯]

'লেখন'-এর লেখাগুলি শুরু চীনে জাপানে—কবির এই উক্তি একটু সংশোধন সাপেক্ষ। চীনে জাপানে যাওয়ার আগেও কবিকে 'স্বাক্ষর লিপির দাবি' মেটাতে হয়েছে আবার সব কবিতাই দাবি মেটাবার জন্য রচিত নয় কতকগুলি কবিতা যে দ্বিপদী নামে প্রবাসীতে ১৩২৯ সালে মুদ্রিত হয়েছিল তারও প্রমাণ আছে।

সে যাই হোক, ছোট লেখাতেও যে কবিতার রস পাওয়া যায় সে কথা প্রমাণ করবার জন্যই তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লেখনগুলি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'লেখন'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"এই রকম ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধ নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্য বিনয় করে বলেছি :

"আমার লিখন ফুটে পথ ধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়ো ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।"[৩৯]

কবির ভোলবার শক্তি অসামান্ত। 'লেখন'এর সগোত্র গুটি পাঁচেক ছোটো কবিতা যখন কবির সামনে উপস্থিত করে তাঁর জনৈক বন্ধু সেগুলোকে রবীন্দ্র কবিতা বলে দাবি করলেন তখন কবি নিজের সেই 'অপরিচিত' লেখাগুলি পড়ে বিশেষ তৃপ্তি প্রকাশ করলেন। কবি লিখেছেন—

"বিস্মরণ শক্তির প্রবলতা বশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্ত-ভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। মনে হল ভালোই লিখেছি।··· নিজের পুরানো লেখা নিয়ে বিস্ময়বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয়ে যায়।"

নিজের লেখার যথার্থ সমালোচনা করার প্রাথমিক সর্ত হল তাকে নিজের লেখা নয় বলে মনে করা নিজের লেখাকে তখন মনে করতে হয় পরের রচনা বলে এবং পরের লেখার যেভাবে নিন্দা প্রশংসা করা হয়ে থাকে তারও সেই রকম সমালোচনা চলে। এক্ষেত্রে কবি যে যথার্থই বিস্মরণ শক্তির প্রবলতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল গ্রন্থপ্রকাশের পরে যখন প্রমাণিত হল কবির স্বহস্ত লিখিত কবিতাকণিকা কয়টির রচয়িত্রী প্রিয়ম্বদা দেবী। কবি অবশ্য নিজের অথচ নিজের নয়, পরের কিন্তু যাকে পরের নয় বলে মনে করেছিলেন সেই কবিতাগুলি সম্পর্কে কিছু প্রশংসা বাক্যই উচ্চারণ করেছেন। কবির নিজের ভাষায় 'অণিমাসিদ্ধি' এই কবিতাগুলির চারিত্র্যগুণ।

বস্তুতঃ 'লেখন' এর লেখাগুলি 'কণিকা'র কবিতা জাতীয় তবে 'কণিকা'-তে নীতিমূলক তত্ত্ব উপদেশ প্রচারের চেষ্টা আছে আর 'লেখনে'র সুগভীর ভাব ও অনুভূতি ক্ষুদ্র সংযত এতটুকু পরিসরের যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও কবিতাগুলি যে সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। 'পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাইবার জন্য ইহাদের এক একটাকে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়াইয়া তোলা যাইত কিন্তু লোভে পড়িয়া ইহাদের বাড়াইতে গেলেই ইহাদের কমানো হইত'—কবির এই অভিমত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

জাপানী কবিতার আয়তন-সংযম যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল কবির নিজের কথাতেই তার প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর একটি মূল্যবান মন্তব্যও উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসের রাত্রিবেলা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন জাপানী কবিতা পড়াবার জন্য। জাপানী 'হাইকাই' নামক লিরিক এপিগ্রাম কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। কবিতাগুলি এক লাইন, দু লাইন, তিন

লাইন বা চার লাইনের।···রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বীজমন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে-ছিলেন ··। তিনি বলেছিলেন এই কবিতার জন্ম নিতান্তই কৌতূহল থেকে, হঠাৎ কৌতূহলে, উদ্দেশ্যমূলক নয়, একটি benevolent curiosity, কিন্তু তারপর তুলিয়া ছোঁয়া (কবিতা তুলিতেই লেখা) পাওয়া মাত্র তা profundity of sympathy-তে, অর্থাৎ সেই কৌতূহল একটি গভীর সংবেদনে রূপান্তরিত।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' গ্রন্থের কবিতাগুলি স্বাক্ষর কবিতার দাবি মেটাতে গিয়ে অবিলম্বে এইরকম অতি গভীর সংবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত হয়েছে —প্রিয়ম্বদা দেবী এগুলিকে সুসংস্কৃত মণির সঙ্গে তুলনা করেছেন। জনৈক সমালোচক এগুলিকে 'সূক্তি কবিতা' বলেছেন—'সূক্তির মধ্যে যে জীবনবোধ আছে এই কবিতাগুলির অধিকাংশেই তা আছে।'[৪১]

'বৈকালী'র অধিকাংশই গান, এবং এর প্রায় সব লেখাই অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষতঃ 'মহুয়া'য় মুদ্রিত আছে সেজন্য 'বৈকালী' সম্পর্কে পৃথক কোন আলোচনা করা হল না। মহুয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বৈকালীর দু একটি গানের কথা বলা হবে। রবীন্দ্র-রচনাবলী সাতাশ খণ্ডে মুদ্রিত 'স্ফুলিঙ্গ' সম্পর্কেও কবির বক্তব্য লেখনেরই সমজাতীয় বলে ঐ কবিতিকা গ্রন্থখানিও আলোচনা-বহির্ভূত রাখা হবে সে কথা এই আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে।

মহুয়া (১৯২৯)

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।

এই বলে 'পূরবী'তে কবি তাঁর কবিজীবনের পরিসমাপ্তির আভাস দিয়ে যে আক্ষেপ করেছেন তা যে কতদূর অমূলক তার পরিচয় আমরা পাই 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থটিতে। সাতষট্টি বৎসর বয়সে কবি লিখলেন অপূর্ব এই প্রেম কাব্যখানি। এই কাব্য রচনার অবশ্য একটু ইতিহাস আছে কবি নিজেই এক পত্রে তা এইভাবে বিবৃত করেছেন—

'ইতিহাসটা হয়তো তোমাদের মনে থাকতে পারে—আমাদের দেশে নববধূর যৌতুকে উপযুক্ত বই দেবার জন্যে বন্ধুবর্গের বিস্তর চিন্তা ও সন্ধান করতে হয়। একদা স্থির করা গেল আমারই পুরাতন কাব্যগুলোর থেকে প্রণয়াত্মক কবিতা সঞ্চয় করে বরণডালা নামে সেটাকে সচিত্র ছাপানো যাবে। তার সঙ্গে দুটো একটা নতুন কবিতা চালানো যেতে পারে। কর্মসচিব

(প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) তার সমস্ত মুনাফা বিশ্বভারতীর খাতায় জমা করবেন বলে শাসালেন। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) চিন্তা করে দেখলেন—মূলত এটা তাঁরই দান (রবীন্দ্র-রচনাবলীর কপি রাইট কবি বিশ্বভারতীকে দান করেন) হলেও বস্তুত এ দানে তার বদান্যতার স্থান রইল না—খাজনা আদায়ের মত এরপরে আইনসঙ্গত দাবী এসে চাপল। তখন আমি···আশ্বাস দিয়ে বললেম—মাভৈঃ, এ বইয়ের সব কবিতাই হবে অপূর্ব। তখন ছিলেম চৌরঙ্গীতে, সময় ছিল প্রচুর—কলম ছুটল চার পা তুলে।'[৪২]

এইভাবে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবের প্রতি জেদ করে কবিতা লিখতে বসে 'মহুয়া'র সৃষ্টি হলেও এই কাব্যগ্রন্থের লেখাগুলি যে ফরমাশি লেখা নয় সেকথাও কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, কবি বলেছেন—

"মহুয়ার কবিতা যখন লিখতে প্রবৃত্ত হলুম তখন তার প্রবর্তনা ছিল কর্ম-সচিবের প্রতি জেদ করে বিবাহে উপহারযোগ্য কবিতা লেখা, কিন্তু যে-মুহূর্তে লিখতে বসা যায় সেই মুহূর্তে অন্য সমস্ত ভুলে লেখা আপন প্রকৃতিতে ভর করেই চলতে থাকে। ওড়বার ফরমাশ গোড়ায় ছিল বলেই পাখি যে ফরমাশি ডানা আমদানি করে, একথা···অশ্রদ্ধেয়।"[৪৩]

আসলে কবির নিজের কবিতা রচনার শক্তির প্রতি এতে অশ্রদ্ধা জানানো হয়। কবি তাই শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এই সময় এক পত্রে লিখেছিলেন—

"আমার কি কবিতা লিখবার ক্ষমতা চলে গিয়েছে যে একখানা নতুন বই বের করবার জন্য পুরানো কবিতা ধার করতে হবে ? আমি সব কটাই নতুন কবিতা দেব।"[৪৪]

কাব্যগ্রন্থ রচনায় বহিরঙ্গ প্রেরণা গৌণ, আসল প্রেরণা অন্তরঙ্গ। সেই অন্তরিক প্রেরণা বশেই 'মহুয়া'র কবিতাগুলির সৃষ্টি, বাইরের ফরমাশ বা তাগিদ সেখানে নিতান্ত উপলক্ষ—এটাই কবির বক্তব্য।

'মহুয়া'র কবিতাকে কবি নিজে আকস্মিক রচনা বলেছেন। এই আকস্মিকতার স্বরূপটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কবি নিজেই তা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

"এ কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পঙ্‌ক্তিতে বসাও তাহলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এখনকার কবিতাগুলি প্রায়ই

তরুলতা এবং ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে। অর্থাৎ এরা বানপ্রস্থের উপযোগী—'ক্ষণিকা'য় যে বানপ্রস্থের উল্লেখ ছিল সেটার কথা বলচিনে। এদের যদি এক-কোঠায় ফেল, তাহলে বাসরঘরের ভিতে অশ্বত্থ গাছ রোপণের মতো হবে।"[৪৫]

কবি হয়তো তাঁর এই সময়কার রচনা 'বনবাণী,' 'নবীন,' 'নটরাজ ঋতুরঙ্গ'-র কথা মনে করেই পত্রে এইরকম মন্তব্য করেছেন। কবির অন্য এক পত্রেও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

"মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, তবে ফরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক।"

আপন কাব্যের ঋতুবদল ব্যাপারটিকে বিস্তারিত করে কবি ঐ পত্রেই বলেছেন—

"আমার মনের মধ্যে বিশেষ এক-একটা ঋতুর মতো আসে সেটা কিছুকাল থাকে—তার হাওয়ার গতিতে উত্তাপে ক্রিয়ায় একটা বিশেষত্ব আছে—তার মেয়াদ ফুরোলে সে চলে যায়। কিন্তু চলে যায় বলেই তাকে মিথ্যা বলা ভুল এই ঋতুগুলি আমারই মনের প্রকৃতিগত।"[৪৬]

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত-শীত-বসন্ত পৃথিবীর বারো মাসে ছয় ঋতু বাঁধা-তাদের পুনরাবর্তন ঘটে, কিন্তু কবির বিশ্বাস, একবার তাঁর মন থেকে যে ঋতু যায় সে আর এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে দিয়ে বিদায় নেয়। তাই কবির কাব্যে এক-একটা সময়ের এক-এক নতুন ঝাঁকের কবিতার আমদানি হয়। কবির স্বভাবেই এই নতুনত্বের স্পর্শ আছে, না হলে লিখতে তাঁর উৎসাহ থাকত না। আমরা জানি, কত অল্প সময়ের মধ্যে 'মহুয়া'র কবিতাগুলি রচিত। 'চিত্রা' পর্ব কিংবা 'কথা-কাহিনী'র পর্বের মতই অতি অল্প সময়ে এত বেশী কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার কারণ কবির অন্তরে 'প্রবর্তনার বেগ সতেজ ছিল'। 'মহুয়া'র কবিতা রচনাকালে কবির মনের মধ্যে রচনার যে বিশেষ ঋতু সমাগম হয়েছে তাকে 'বলাকা' বা 'পূরবী'র ঋতু বলে মনে করতে তিনি নিষেধ করেছেন কিন্তু 'মহুয়া'কেও আমরা 'বলাকা' পর্বের অন্তর্গত কাব্য-গ্রন্থরূপে বিবেচনা করেছি তার কারণ আছে। 'বলাকা'তেই আমরা কবির চিত্তে অকাল বসন্তের আবির্ভাব 'পৌষের পাতা ঝরা তপোবনে বসন্তের মাতাল বাতাসে'র মাতামাতি লক্ষ্য করেছি। 'পূরবী'তে এই প্রৌঢ়-যৌবনের যথেষ্ট পরিচয় পাই। এই কাব্যেই বেশ কিছু প্রেমের লিরিক কবিতা লিখে কবি আমাদের চমৎকৃত করেছেন। 'পূরবী'-তে যে প্রেমানুভূতির উদ্বোধন হয়েছে তারই পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি 'মহুয়া'তে। সুতরাং কবি যাই বলুন

'মহুয়া'র ঋতুকে 'বলাকা'-'পূরবী'র ঋতু থেকে পৃথক একটি ঋতু মনে করার অনিবার্য কারণ নেই। 'মহুয়া' আকস্মিক রচনা তো নয়ই বরং বলাকা পর্বের পরিণত একখানি কাব্য একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। অবশ্য গোড়ার ইতিহাস মনে রাখলে 'মহুয়া'কে আকস্মিক বলে ভুল হতে পারে। তাই কবি নিজেই সে বিষয় আগে ভাগে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—

"রচনার আনুষঙ্গিক বাইরেকার ঘটনাগুলো না জানাই ভালো—কেননা, যারা অরসিক তারা বাইরেকার জিনিষটা স্পষ্টতর দৃশ্যমান বলেই সেইটার দ্বারাই ভিতরকার রসের ব্যাখ্যা ও বিচার করে। মাটির উপরে বীজের পতনটা বাতাসের দ্বারাও হতে পারে, মানুষের দ্বারাও হতে পারে কিন্তু অঙ্কুর যেটা হয় সেটা বীজের আপন স্বভাবের প্রেরণায়।'[৪৭]

সুতরাং 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র-কবিতার যে অমর অঙ্কুর পত্র পুষ্পে সুশোভিত হয়ে বর্ণগন্ধে আমাদের চিত্ত চমৎকৃত করেছে তার প্রেরণার মূল রয়েছে কবির স্বভাবেরই মধ্যে। জীবনের শেষ বসন্তে চেতনার আকাশে যে স্বর্ণ আলোর মধু ছড়িয়ে দিয়েছে, কবিচিত্তে যে অনাসক্ত প্রেমের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে তারই সার্থক প্রকাশ 'মহুয়া'র প্রেম কবিতাগুলিতে। কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ অজস্র প্রেম-কবিতা ও প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছেন, 'মহুয়া'র আগেও করেছেন, 'মহুয়া'র পরেও করেছেন। কিন্তু এমন প্রেম-সর্বস্ব রচনা ইতিপূর্বে বা পরে রবীন্দ্রনাথ আর সৃষ্টি করেননি। এই কাব্যে প্রেমের যে নব মূল্যায়ন ঘটেছে প্রেম সম্পর্কে তাকেই রবীন্দ্রনাথের চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা চলে। "উজ্জীবন" কবিতাটিকে 'মহুয়া' প্রেম কাব্যের কবিকৃত ভূমিকা মনে করে এই কবিতা আশ্রয়ে কবির প্রেমদৃষ্টির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের ভাবস্মৃতির পটভূমিকায় কবি ভারতীয় সৌন্দর্য ও প্রেমসাধনার যে অপূর্ব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন "উজ্জীবন" কবিতায়, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনার পরিচয় তার মধ্যেই পাওয়া যায়। হর-কোপানলে দগ্ধ মদনকে কবি পুনরুজ্জীবিত করেছেন এই কবিতায় —কিন্তু যেরূপে ঐ দেবতাটি প্রজাপতির দালালি করেন সেই রূপে নয়, কুসুমরথে মকরকেতু উড়াবার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়নি তিনি অনঙ্গক প্রেমের বিদেহী সভায় বীর্যদীপ্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। মদনের মধ্যে তথা প্রেমের মধ্যে যা স্থূল যা রূঢ় অংশ আছে—লালসার লোলুপতা কিংবা কামনার কলুষ যা কিছু আছে রুদ্রের ক্রোধাগ্নিতে তা পুড়ে

ছাই হয়ে গিয়ে নির্মল নিত্যরূপে তার আবির্ভাব হোক—কামনা বাসনার মূঢ়তা-মুক্ত নিষ্কলঙ্ক প্রেমের নিত্য জ্যোতির্ময় রূপটি ফুটে উঠুক, কাম নিকষিত হেমে পরিণত হোক—এটাই কবির প্রার্থনা।

প্রেমের এই উচ্চ আদর্শটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কবি 'মহুয়া' কাব্যে এবং সমকালীন উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য় প্রেমের যে চিত্র এঁকেছেন তার কোথাও কালিমালিপ্ত প্রেমের বর্ণনা নেই। মহৎ প্রেমের উচ্চ কল্পনা নিয়েই এই প্রেমকাব্যখানি অথবা ঐ উপন্যাসখানি কবি পরিণতবার্ধক্যে রচনা করেছেন।

গ্রন্থসূচনায় কবি 'মহুয়া'র প্রেমকবিতার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তাতে দেখি কবি এই কাব্যের কবিতাগুলিকে দুই দলে ভাগ করে নিয়েছেন—কবি লিখেছেন,

"আমি নিজে, মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটা হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা; তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন বেগই প্রবল।

'মহুয়া'র "মায়া" নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যেই সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তরে-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃতলোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে; সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-এক দিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য; তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।"

'মহুয়া'র কবিতা সম্পর্কে কবির এই উক্তির সারবত্তা স্বীকার করেও বলা চলে কবি যেভাবে কবিতাগুলিকে 'প্রণয়ের প্রসাধন কলা' ও 'প্রণয়ের সাধনাবেগে'র অন্তর্ভুক্ত করে দুই দলে ভাগ করে নিয়েছেন সেইরকম প্রাচীর-তোলা (water-tight) বিভাগ কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। যে কবিতাগুলিতে প্রণয়ের প্রসাধন কলাকেই মুখ্য বলে কবি বিবেচনা করেছেন সেগুলিতেও যেমন প্রণয়ের সাধনবেগ উপলব্ধি করা যায়, তেমনি প্রণয়ের

সাধনবেগ প্রধান কবিতায় প্রসাধন পারিপাট্যের উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভব। এই রকম সংমিশ্রণ যে ঘটেছে কবি নিজেও সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন— 'মায়া' কবিতার আলোচনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সঙ্গে আমরা আরও কতকগুলি কবিতার নাম উল্লেখ করতে পারি—'সন্ধান', 'শুভযোগ' প্রভৃতি। 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে প্রণয়ের প্রসাধন কলাই বিশেষভাবে উপজীব্য হয়েছে, প্রসাধন পারিপাট্যের মধ্য দিয়ে নারীর বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করাই এ কবিতাগুলির লক্ষ্য।

'মহুয়া'র নামকরণ নিয়েও কবিকে বিশেষ চিন্তিত দেখা যায়। বরণডালা নামটিই প্রথমাবধি কবির মনে ছিল কারণ 'সব কবিতাগুলির ভিতরেই একটা ভাবের সূত্র রয়েছে সেটাকে বলা যেতে পারে যুগলভাবের সূত্র, অতএব বরণডালা নামটাই ওর পক্ষে সার্থক হবে' কবি এইরকম যুক্তি দিলেও তাঁর কবিতার সমজ্‌দারদের প্রস্তাব অনুসারে শেষ পর্যন্ত বরণডালা নাম বদলিয়ে 'মহুয়া' নাম রাখাই স্থির করেন। 'মহুয়া' নামের সপক্ষে ওকালতি করে কবি নিজেই পরে এই নামকরণের যৌক্তিকতা এইভাবে বুঝিয়েছেন—

"কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগে ভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি। নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটু-খানি সংগতি আছে—মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হোক, অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্য-গ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।"

'মহুয়া'র নাম-কবিতায় কবির এই ব্যাখ্যারই রসরূপ লক্ষ্য করি। 'বধূরে যেদিন পাব ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।' শেষ জীবনে বধূর আগমন প্রতীক্ষা এবং তাকে কানে কানে ডাকা নামটিকে কবি যেভাবে অমর করেছেন এই কবিতায়, তাতে মনে হয় সত্যি সত্যি এই নামটি কবির প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবির স্বহস্তাঙ্কিত নাম-পত্রে মহুয়া নামের যে চিত্রখানি মুদ্রিত হয়েছে তাতেও এই নামটির প্রতি কবির প্রীতিরই পরিচয় আছে।

সে যাই হোক, 'মহুয়া'র কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্যও আমরা কবির নানাপত্রে পেয়েছি। দুএকটি কবিতার কথা এখানে আলোচনা করা চলে।

'মহুয়া'র "প্রত্যাগত" কবিতাটি রচনার একটি ইতিহাস গল্পচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে। সে ইতিহাস এইরকম—

"আমি একদিন আমার লিখবার টেবিলে বসে লিখছি হঠাৎ নন্দলাল ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের দেওয়াল জুড়ে ছবিখানা এঁটে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। ওর ঐ রকম কিছু না বলে শুধু ছবিখানা আমার চোখের সামনে ধরে দিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে দেরী হলো না—আর্টিস্ট জানতে চায় আমার মনোভাবটা। চেয়ে চেয়ে ছবিখানা দেখলুম আর তখনি কবিতাটি তৈরি হয়ে গেলো।"[৪৯]

'নির্ঝরিণী', 'শুকতারা, 'অচেনা', 'পথের বাঁধন', 'বাসর ঘর', 'বিদায়', 'প্রণতি', 'নৈবেদ্য', 'অশ্রু', 'অন্তর্ধান'—এই দশটি কবিতা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জন্য লেখা হলেও ভাবানুষঙ্গবশতঃ 'মহুয়া'তেও মুদ্রিত হয়েছে।

"বিচ্ছেদ" ও "বিরহ" 'শেষের কবিতা'র জন্য লিখিত হলেও ঐ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নি।

এই সব কবিতার মধ্যে 'নির্ঝরিণী' কবিতাটির কবিকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি যা বলেছেন সাধারণভাবে তা 'শেষের কবিতা'র দশটি কবিতা সম্পর্কেই সত্য বলে গ্রহণ করা চলে। কবি লিখেছেন,

"শেষের কবিতা গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়।"[৫০]

কবি যদিও সব কবিতার সেইরকম সাধারণ অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি কিন্তু 'নির্ঝরিণী' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তাতেই বোঝা যায় 'বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ' এবং 'সাধারণ অর্থে' কতদূর পার্থক্য হতে পারে।

উক্ত কবিতার বিশেষ অর্থ কবির ভাষায় এই রকম—

"শেষের কবিতায় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক্; তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ, তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো, সত্য করো।

তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।

এক কথায় এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।"

দ্বিতীয় অর্থ, কবির ভাষায়—

"আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে ঝর্নার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে।"

কবিকৃত এই দুই ব্যাখ্যাই সমকালীন মাঝে মাস তিনেকের মাত্র ব্যবধান কিন্তু তাতেই দুই অর্থের মধ্যে কত না পার্থক্য ঘটেছে। এতেই বোঝা যায়—কবির নিজের কাছেই একই কবিতার অর্থ এক এক সময় এক এক পরিপ্রেক্ষিতে এক এক রকম হতে পারে। একই সময়ের কবিতার অর্থের মধ্যে যদি এতটা পার্থক্য হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলা বা লেখা নিজের কবিতার ব্যাখ্যা যে স্বতন্ত্র হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের আরম্ভে বসন্তের আগমনী বিষয়ে পাঁচটি কবিতা ও গ্রন্থশেষে বসন্তের বিদায় বিষয়ক চারটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রেমকাব্যে বসন্তবিষয়ক কবিতাগুলি সন্নিবেশের কারণ কবি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"নব বসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।"[৫১]

কথাটা খুবই সত্য। প্রেমের দেবতাকে স্মরণ করতে বসলে স্বভাবতই তার চিরসহচর বসন্তের কথা মনে আসে। মানবচিত্তে প্রেমের উদ্দীপনা জাগায় ঋতুরাজ বসন্ত—প্রেমের ক্ষেত্রে প্রকৃতি করে উদ্দীপন বিভাবের কাজ। এই জন্যই নরনারীর প্রেমলীলা বর্ণনায় উপযুক্ত ভূমিকা রচিত হয় বসন্তেরই প্রেক্ষাপটে।

আবার রবীন্দ্রনাথ যেহেতু শুধুমাত্র মানবের কবি, প্রেমের কবিই নন, প্রকৃতিরও কবি—তিনি 'পৃথিবীর কবি', তাঁর নটরাজের লীলা যেহেতু যুগপৎ মানবের অন্তর্লোকে এবং প্রকৃতির বহির্লোকে, তাই মানবের প্রেমলীলা আর প্রকৃতির ঋতুরঙ্গ একসাথে পূর্ণ করে নটরাজের নৃত্যলীলা। নিখিল বিশ্বে অদ্বৈত প্রেমলীলার যুক্তবেণী রচনায় প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালার দিকেও কবিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। তাই বসন্তবিষয়ক কবিতাগুলি স্বাধিকারের দাবিতে এই কাব্যে স্থান করে নিয়েছে, মানবচিত্তে প্রেম উদ্বোধনে তারা 'নকিবের কাজ' করেছে একথা বললে ঠিক হবে না। তাছাড়া, কবি ঋতু উৎসব পর্যায়ের কবিতাগুলিকে 'মহুয়া' পর্যায়ের নয় বলে যে মন্তব্য করেছেন তাও যথার্থ হয়েছে বলে মনে হয় না। 'মহুয়া'র বীর্যদীপ্ত ও বন্ধন অসহিষ্ণু প্রেমের উপযোগী করে কবি এই কাব্যে যে বসন্তের পটভূমিকা রচনা করেছেন তা স্বরূপতঃ 'বলাকা'রই বসন্ত। পুষ্পধন্বর নবজন্মলাভের মতোই কবির হাতে বসন্তেরও ঘটেছে পুনরুজ্জীবন—

অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়
… … …
আসে নির্দয় নব যৌবন
ভাঙনের মহারথে।

সবশেষে 'মহুয়া'র উৎসর্গ কবিতাটির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা চলে। কবির স্বহস্তাঙ্কিত উৎসর্গ কবিতাটি যেভাবে গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হয়েছে, মূলে কিন্তু কবিতাটির ঠিক সেই আকার ছিল না, তা আরও দীর্ঘ আকারে রচিত হয়েছিল। সিঙ্গাপুর থেকে ৬ই আগস্ট কবি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে যে পত্র দেন[৫২] তার সঙ্গে সম্পূর্ণ কবিতাটি নিজের হাতে লিখে পাঠান। ঐ কবিতার বর্জিত প্রথমাংশটি এই রকম :

ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায় হাওয়া,
সে পাওয়া তাহার মিথ্যা পাওয়া।
আনমনে একবার
বহিয়া পুষ্পের ভার
ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া॥

যে সেই ধূলায়-পড়া ফুলে
হার গাঁথি লয় তারে তুলে
হেলা হতে নিমেষেই
সে ফুলেরে পায় সেই,
মুকুট করিয়া পরে চুলে॥

এরপর ছিল মুদ্রিত অংশটুকু—

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান॥

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি' ?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমরা ধ্যানের ধনখানি॥

কবি গ্রন্থখানি কাকে উৎসর্গ করেছেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই, কেবল এইটকু বোঝা যায় কবি এ পর্যন্ত অনেক লেখাই লিখেছেন এবং নামী অনামী, পরিচিত স্বল্পপরিচিত অনেককেই তা উৎসর্গ করেছেন কিন্তু শেষ জীবনের এই কাব্যখানি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত না করে দরদী পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন। অজানা সেই পাঠক-পাঠিকা যদি এই কাব্যকে সমাদর করে, হৃদয় পেতে কবির গভীর বাণী শোনে তবে কবির ধ্যানের এই ধনখানি তারই হবে। বিবাহ-উপলক্ষে রচিত এই কাব্যখানি অজানা বর-বধূ, খুব সম্ভব সেই সব নববধূ যাঁরা কাব্য রসিক, তাদের নামের সঙ্গে এইভাবে যুক্ত করে এই কাব্য রচনার উদ্দেশ্যকে কবি আরও নিগূঢ়ভাবে, আরও সার্থকভাবে প্রমাণিত করলেন।

বনবাণী (১৯৩১)

'মহুয়া' অনির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয়ে যেমন সার্থক হয়েছে 'বনবাণী' সুনির্দিষ্টভাবে কবিবন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর করকমলে প্রত্যর্পিত হয়ে তেমনি সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে; 'বনবাণী' উদ্ভিদরাজ্য, নিসর্গ জগতের প্রশস্তি কাব্য। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র আমাদের উদ্ভিদ ও জড়ের প্রাণের লীলার সঙ্গে পরিচিত করেছেন। যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি-বাক্যকেই যেন প্রমাণিত করেছেন—

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'

—এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।

কবি নিজেই বলেছেন ছেলেবেলা থেকেই তিনি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত, পরে কল্পনাবৃত্তির সাহায্যে তিনি প্রকৃতির এই প্রাণের স্পন্দন অন্তঃকর্ণে শুনেছেন, নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে বনের বাণীকে অনুভব করার আনন্দই 'বনবাণী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানী ও কবির মনের মিলনের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় আছে এই কাব্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ইতি পূর্বে 'খেয়া' কাব্যখানিও কবি জগদীশচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছিলেন কিন্তু সেই কাব্যে উৎসর্গকর্তার নিজের মনের তৃপ্তিটাই বড়ো হয়েছিল, আর 'বনবাণী'তে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই মনের কথাগুলি মিলিত হয়েছে, উদ্ভিদ্‌ ও নিসর্গ জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও কবি ও বিজ্ঞানীর এখানে মনের মিল হয়েছে।

'বনবাণী' কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ আলোচনার পরিমাণ কম হলেও, এই কাব্যান্তর্গত ভাববস্তুর ব্যাখ্যা রবীন্দ্রসাহিত্যে নিতান্ত অল্প নয়; এই গ্রন্থখানি রবীন্দ্রকাব্য মালায় একটি অতি সুন্দর এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুষ্প সেকথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এই কাব্য রচিত হওয়ার অনেক আগে রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলসুর বলে যাকে দাবী করেছিলেন একটু লক্ষ্য করলেই এই কাব্যে তার সর্বাতিশায়ী প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। "রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই মূল সুরটি কী? সেটি প্রকৃতির প্রতি একটি অতি নিবিড় অতিগভীর প্রেম।"[৫৩]—বলেছেন অজিত চক্রবর্তী। ছিন্নপত্রাবলীর একাধিক পত্রে কবি নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই অতিনিবিড় অতি গভীর প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। 'সোনার তরী' কাব্যালোচনাকালে আমরা সেই সব পত্র থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করেছি। পুনরায় আরও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া চলে। বলা বাহুল্য আলোচ্য পত্রগুলির রচনাকাল ও 'বনবাণী'র রচনাকালের মধ্যে প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধান। তবুও যৌবনকালে রোমান্টিক কবিমন দিয়ে কবি যে সত্য অনুভব করেছিলেন, পরিণত বার্ধক্যে উপলব্ধির সত্যরূপে তাকেই 'বনবাণী'র কবিতাবলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। এর থেকে এই কথাটাই প্রমাণিত হয় যে সর্বানুভূতি কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের এই ভাবটিকে কবি নিজে বিশ্ববোধ বা সর্বানুভূতি নাম দিয়েছেন, অজিত চক্রবর্তী ঐ কথাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"সমস্ত জলস্থল—আকাশকে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্বানুভূতি।"[৫৪]

এইবারে কবির নিজের ভাষায় ঐ সর্বানুভূতির তথা প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে ২৩ আগস্ট ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে কবি লিখছেন—

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা—তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশ—পূর্ণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী পর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত চলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো—এই ছন্দে যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে; নইলে কখনোই নির্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেইজন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি—নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাবো তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর কোনো যুক্তি নেই।"[৫৫]

অন্যত্র লিখেছেন,

'এই-যে অনাদি অনন্ত আকাশ-পূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অণু পরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা'—আমাদের 'মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যাওয়ায়' আমরা সেটাকে 'প্রত্যক্ষ দীপ্যমান-ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারিনে। তখন ওটাকে কবি-কল্পনা বলে ভ্রম হয়।'[৫৬]

'বনবাণী'তে কবি নিজের মধ্যে নিজে এই সত্যকে অনুভব করেছেন, যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে অপরকে তা উপলব্ধি করানো সম্ভব নয়। নিজেরই ভিতরকার ঐ কথাগুলি শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পটভূমিকায় কবি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শুনতে পেয়েছেন, এত স্পষ্ট যে কবি যখন ভিয়েনায় ইম্‌পীরিয়ল হোটেলে বাস করেছেন তখনও এই ডাক কবির মনের মধ্যে পৌঁছেছে। ভিয়েনা থেকে তেজেশচন্দ্র সেনকে লেখা এক পত্রে ('বনবাণী'র ভূমিকা রূপে ব্যবহৃত) কবি লিখেছেন,

"আমার ঘরের আশে পাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।···

গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন সংগীতে বদ্‌সুর লাগে না।···আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' ; ('যিনি এক তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন') শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌' (এই যা কিছু সমস্তই, প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে)। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না,···সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নব নবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহাযুক্তি আর কোথায় আছে।"[৫৭]

এইজন্য 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষের বন্দনার মধ্য দিয়েই প্রাণের প্রশস্তি করে বলেছেন,

> অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
> প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ,
> ঊর্ধ্ব শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা।

বৃক্ষের মধ্যে প্রথম প্রাণের আগমন বা প্রৈতি বিষয়ে কবির অভিমত আধুনিক জীব-বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ দ্বারাও সমর্থিত। বিজ্ঞান বলে, এই আদিমতম সরল প্রাণই ক্রমশঃ জটিল হতে হতে বিবর্তন ধারায় অগ্রসর হয়ে

আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করে ইনি বাস করতেন, সেই বাসস্থানটির প্রতি কবিরও লোভ ছিল, কিন্তু হায়, 'বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার ভেদ আছে ; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।' ইচ্ছা এবং যোগ্যতা থাকলেও হয়তো কীর্তি ও কর্মজালে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যে শেষ পর্যন্ত ঐ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। কবির নিজের কথাতেই বলা যায়—

'কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি :
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।

'হাসির পাথেয়' কবিতার উৎসমূলে কবির বাল্যকালের যে মধুর স্মৃতিটুকুর কথা এই কবিতার ভূমিকায় বলা হয়েছে তার সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত নিম্নলিখিত বর্ণনাটি মিলিয়ে পড়লে 'বনবাণী'র এই উৎকৃষ্ট কবিতাটির পরিচয় সম্পূর্ণ হবে। কবি লিখেছেন—

"সমস্তদিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে, পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনি-কন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরণার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথর-গুলোর গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুল্ কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম, এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে কেন।"

১৮৭৩ সালে কবির যখন বারো বৎসর বয়স তখন তাঁর উপনয়ন হয়, উপনয়নের পরে মুণ্ডিত মস্তক বালক কবি বোলপুর যান পিতার সঙ্গে, সেখান থেকে ড্যালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যান। এই কবিতায় তখনকার অল্প বয়সের কথাই বলা হয়েছে।

প্রকৃতির বিচিত্ররূপের মাঝে—রূপে রূপে প্রতিরূপে এক পরম সুন্দরের মুক্তরূপকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যেই পরিত্রাণ, আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যের বাণীই বনবাণী। তাই সেই পরমসুন্দরের চরম দান। জগৎকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখা, তাকে ছোট করে দেখা, বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে দেখাই যথার্থ দেখা। ঋতু

বদলের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষলোকে যে পাতা ঝরানোর ও পাতা ধরানোর খেলা শুরু হয় তার থেকে মানুষ এই শিক্ষাই লাভ করতে পারে।

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সুনিপুণ অজস্র বর্ণনা রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে, কিন্তু 'বনবাণী'তে একত্রে প্রকৃতির শুধু রূপের কথাই নয় তার বাণীর কথাও আছে। বৃক্ষ জগতের কোন পরিচয়ে মানুষ আপনাকে পরিচিত করতে আনন্দবোধ করছে অর্থাৎ বৃক্ষজগতের কোন্ বাণীটি মানুষকে তার সত্য পরিচয়টি ধরিয়ে দিতে চেয়েছে তাই যেন কবি এই কাব্যে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার পূর্ণ পরিচয় 'বনবাণী'তেই প্রাপ্তব্য।

পরিশেষ (১৯৩২)

'মহুয়া'র পর 'বনবাণী' তারপর 'পরিশেষ'। কবি তখন সত্তর বৎসর পার হয়ে একাত্তরে পা দিয়েছেন। এই সময় শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন—

'বয়স সত্তর হ'লো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই'—সুতরাং গানের পালা শেষ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কবি মনে মনে অনুভব করেছেন—'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে তাঁর কাব্যসৃষ্টির পালা শেষ হবে এই রকম অনুমান করে কাব্যগ্রন্থের নামকরণে তার আভাস দিয়েছেন। অবশ্য এর আগেও আমরা কবিকে বারবার তাঁর কবি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে শুনেছি 'সোনার তরী', 'কল্পনা', 'গীতালি' প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্যই বাণীর বরপুত্রটি বীণাপাণির কাছ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে শেষের পর আবার শুরু করতে হয়েছে—জীবনদেবতার অমোঘ নির্দেশে কবিকে আবার সাহিত্যসৃষ্টির দুরূহ কর্তব্যভার কাঁধে তুলে নিতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে সাতের দশকে পা দিয়ে কবি যেন সত্য সত্যই অনুভব করেছেন তাঁর কবি জীবনের এইবার যথার্থ পরিসমাপ্তি ঘটবে—হয়তো ব্যক্তি জীবনেরও, তাই পরিশেষ—The End বলে যে কাব্যের শুরু হল তার সূচনাতেই লিখেছেন,

> এই গীতিপথ প্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
> দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
> আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
> বিচিত্রের নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম।

যে বিচিত্রের নর্মবাঁশি একদা জীবনের প্রথম প্রভাতে কবি কুড়িয়ে

পেয়েছিলেন, না ঠিক কুড়িয়ে পাওয়া নয়, তাঁর জীবনদেবতাই ঐ বাঁশি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনিই বাঁশি বাজানো শেখাবেন বলে আরামের, স্বাচ্ছন্দ্যের কোল থেকে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন—সারাদিন বাঁশি বাজিয়ে দিনান্তে গীতিপথপ্রান্তে এসে কবি সেই নর্মবাঁশিখানি তাঁর শেষ প্রণামরূপে জীবনদেবতার পদেই প্রত্যর্পণ করতে চেয়েছেন। কবি তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে জীবনদেবতার নির্দেশে যে বাঁশি বাজিয়েছেন তার সুরে অপরে মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু বংশীবাদককে তার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে 'বিচিত্রা' কবিতায় কবি সেই কথাই বলেছেন—

> বুকের শিরা ছিন্ন করে
> ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
> কখনো পূজা শোভন শতদলে,
> বিচিত্রা হে বিচিত্রা,
> হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
> ফসল যত উঠেছে ফলি
> বক্ষ বিভেদিয়া
> কণাকণায় তোমারি পায়
> দিয়েছি নিবেদিয়া।
> তবুও কেন এনেছ ডালি
> দিনের অবসানে,
> নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
> নিঃস্ব-করা দানে।

এই নিঃস্ব করা দান নিঃশেষে ডালি ভরে দিয়ে 'পরিশেষে'র কবিতাগুলি লেখা হবে কবি তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি যে বৃথাই তাঁর কবিজীবনের পরিশেষ কল্পনা করছিলেন তার প্রমাণ আমরা পরবর্তী দীর্ঘ পর্ব 'পুনশ্চে'র আলোচনাকালেই পাব। আপাততঃ 'বলাকা' পর্বের এই শেষ কাব্য সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

'বনবাণী'র কবিতাগুলি যেমন গদ্য ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, 'পরিশেষে'র কয়েকটি কবিতা যথা, "অবুঝ মন," "আরেক দিন," "তে হি নো দিবসাঃ" তেমনি সাময়িক পত্রের পাতায় গদ্য-ভূমিকা সহ মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় এই ভূমিকাগুলি কবি বর্জন করেন কিন্তু কবি নিজেই বলেছেন 'কবিতা আর গদ্য ছিল ভাই বোন সগোত্র'—সুতরাং কবিতা

উপলব্ধির ক্ষেত্রেই গদ্য ভূমিকাগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞানে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। কবি 'অবুঝ মন'এর ভূমিকারূপে লিখেছিলেন—

"জাহাজ চলেছে, সমুদ্রের জল কেবলি ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোটো শিশু; আমরা আছি আপন আপন কোণে একটি মাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক জুড়ে। আর অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহেতুক আগ্রহে ফ্যালফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্ছে।...

এটা বুঝতে পারছি যে, ওরই ওই মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে মন ওকে দেখছে আর ভাবছে, সেই হল নূতন; অনেক চেষ্টায় শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচার বুদ্ধিমান মন গড়ে উঠেছে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরই অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্ছে, সূর্যের দিকে যার আকৃতি, যা স্বপ্ন চালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ওই পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায়, আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখতে তার এত ভালো লাগে।...

আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুন বুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা নিষ্পত্তি করে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতুম তখন যে আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয়; তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দৃষ্টি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখতে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি (অবুঝ মন) লিখেছি।"[৬০]

কবির স্বরচিত এই ভূমিকাংশ পাঠের পর 'অবুঝ মন' কবিতার অর্থ উপলব্ধিতে এতটকু অসুবিধা হয় না। উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে ঐ কবিতার ভাইবোনের সম্পর্ক সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

'আরেকদিন' কবিতার ভূমিকায় কবি যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার সবটকু উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। এই কবিতা আলোচনায় উক্ত ভূমিকার এইটুকু গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য যে কবির পঁচিশ বৎসর বয়সের সঙ্গে সত্তর বৎসর বয়সের বাইরের দিক থেকে যতই কেন পার্থক্য ঘটুক ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন আছে কোন মিল, তাই কর্তব্যের ফরমাশ আজ যখন তাঁর কাঁধে চেপে বসতে চেয়েছে তখনও মনটাকে মুক্তি দিতে কবিতার রাজ্যে

'আরেক দিন'-এর মতোই কবি পাড়ি জমাতে চান এবং পারেনও। ভূমিকার শেষ দুটি অনুচ্ছেদে কবি সেই কথাই বলেছেন। যৌবনে কবি লিখেছিলেন—'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে'—অল্প বয়সে হাল্কা জীবনের ছুটি আজ হয়তো সম্ভব নয়, আজ 'মন ডানা নাড়তে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্তব্যের ফরমাশ গ্যাট হয়ে চেপে বসে; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ।' তবু এক সময় কবি বলে ওঠেন—

"দূর হোক গে—বোঝাটাকে নিয়ে দেশ দেশান্তরে আর বয়ে বেড়াতে পারিনে। কাল ডেকের উপর কেদারায় বসে মনে-মনে বললুম, বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়ার সঙ্কল্প করে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজো ছুটির পাওনা দাবি করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।"[৬১]

'তে হি নো দিবসাঃ' কবিতার ভূমিকা খুব সংক্ষিপ্ত। কবির বক্তব্য আগের কবিতার ভূমিকারই অনুরূপ তাই কবি খুব সহজে এই কবিতার পরিচয় দিয়েছেন—

'বক্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কি-রকম প্রবল হয় তার এটা প্রমাণ।'

বলা বাহুল্য কাব্য সৃষ্টির কাজকে কবি অকাজের কাজ বলেই বরাবর মনে করেছেন।

ঋতু উৎসব বিষয়ক একটি কবিতা 'বসন্ত-উৎসব' 'বনবাণী'র কবিতার মত ভূমিকা সংবলিত হয়ে 'পরিশেষ' কাব্যের সংযোজনে মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিতার পরিচয়ে কবি বলেছেন,

'এই কবিতাটি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোল পূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যই রচনা করা হয়েছিল।'

শান্তিনিকেতনে ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র পরিচয় সভা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই পরিস্ফুট হয়েছে, কবি বলেছিলেন,

"একটি পরিচয় আমার আছে,···আমি কবি মাত্র।···আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই।···আমি বিচিত্রের দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে বাইরে লীলায়িত করা এই আমার কাজ।"[৬২]

'পরিশেষে'র 'পান্থ' কবিতাটি ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৮ সালে লেখা হয়। ঐ কবিতায় কবি এই কথাগুলিই বলেছেন—

আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

কবি হিসেবে তাঁর কাজ কি সে কথা রবীন্দ্রনাথ বারবারই আমাদের জানিয়েছেন—

"কবির মত করেই দেব এবং নেব, কবির মত করেই দেখব এবং দেখাব।'—একথা খেয়া পর্বেই কবির মুখে আমরা শুনেছি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওপারের খেয়ার জন্য যখন কবি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্চেন তখনও তাঁর মুখে সেই একই কথা শোনা গেল।

'পরিশেষে' নানা উপলক্ষে লেখা নানা কবিতা আছে—'বক্সা দুর্গস্থ রাজ-বন্দীদের প্রতি', 'গান্ধীজির বন্দীদশায় পীড়িত হয়ে কবির 'প্রশ্ন', এ ছাড়া বিবাহ, নামকরণ প্রভৃতিতে আশীর্বাদী কবিতাও আছে, আর আছে সংযোজন অংশে সংকলিত কয়েকটি কবিতা দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে যারা রচিত যথা, 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী', 'সিয়াম', বোরোবুদুর'। এই সব কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের আলোচনা অপেক্ষা কবি জীবনীকার ও রবীন্দ্র-সমালোচকদের তথ্যপুর্ণ আলোচনাই বেশী। এ বিষয়ে তথ্যমূলক বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা না করে আমরা দু-একটি কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের এক-আধটুকরা যা মন্তব্য পাওয়া যায় তাই উদ্ধার করবো। শ্রীমতী রমাদেবীকে লেখা এক পত্রে কবি 'পরিশেষে'র 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"এর মধ্যে যে-কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই,—ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, একে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় একে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তাহলেই এই দান সার্থক হবে—নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য পেয়েও হারানো হবে। 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' এই মন্ত্রের অর্থ এই—'ওঠো জাগো'। জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়।"[৬৩]

সংযোজন অংশের 'নূতন কাল' কবিতার সূচনারূপে রবীন্দ্রনাথের যাত্রী গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করা চলে। রবীন্দ্রকাব্যের পালাবদলের পূর্বাভাস আছে এই লেখায়। কবি লিখেছেন—

"আমরা যারা এখানে (বালীদ্বীপে) বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমান ভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্প সৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে, আমি হার মানলুম; সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।' নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।···

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হ'ক নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি।"[৬৪]

বলা বাহুল্য, কবি এখানে 'নূতন কাল' কবিতার কথাই বলেছেন। এই কবিতার দাদামশায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি আধুনিক কালের নতুন কবির কাছে হার স্বীকার করেছেন। 'শেষের কবিতা'র নিবারণ চক্রবর্তীর মাধ্যমে কবির এই মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করি। আমাদের আরো মনে হয় 'নূতন শ্রোতা' নামক যে যুগ্ম কবিতা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে নন্দগোপাল সিরিজ কবিতায় প্রকাশিত কবি মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় নিতে হলে 'নূতন কাল'-এর সঙ্গে তাদেরও মিলিয়ে পড়া দরকার। এই কবিতার প্রথম অংশে বালক নন্দগোপালকে কবি যেমন তাঁর নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী 'সমঝাইতে' পারেন নি, দ্বিতীয় অংশে তেমনি পরিণত বুদ্ধি নন্দ কর্তৃক উৎসাহিত হলেও কবিতার খাতাখানি তার হাতে তুলে দেন নি; কবি হয়তো ভেবেছেন তাঁর কালের কবিতা একালের পাঠকের কাছে তেমন সমাদর পাবে না। কবি মনে করেছেন উৎসাহের ঝোঁকে নন্দগোপাল শাবাশ দিলেও ঐ কাব্যগ্রন্থখানি পরে হয়তো আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার করতে বসে 'অমিট রে'-র মতো সেও তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করবে। 'নূতন কাল', 'নূতন শ্রোতা' কবিতা লেখার বৎসরকালের মধ্যেই রচিত হয় 'শেষের কবিতা' উপন্যাস-

খানি। সেখানে অমিত রায়-এর মুখে রবি ঠাকুরের কঠোর সমালোচনাকে নিজের কাব্য সম্পর্কে কবির কঠোরতম সমালোচনা বলেই গ্রহণ করা যায়। কবির ভাগ্যে পরজন্ম সত্য হলে তিনি ধূম্রলোচন হবেন বলেছিলেন, কিন্তু পরজন্ম সত্য হওয়ার আগেই এই জন্মেই তিনি যে সে ধূম্রলোচনী অর্থাৎ আত্মবিধ্বংসী সমালোচনার সূচনা করলেন-তারই প্রমাণ পাই 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের বক্তব্যের মধ্যে "রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়-রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা।...

"রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনা রেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মকশো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়।"[৬৫]

সুতরাং সত্তর বছরে পা দেওয়ার কিছু আগে থেকেই কবির মনে বারবার এই কথাই জেগেছে রবিঠাকুর এখন অতীতের কোঠায়, তাঁর কাব্যও প্রাচীনের পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং তাঁকে কাব্য রচনা হয় বন্ধ করতে হবে, নয় আবার এ কালের মতো করে নতুন পালা শুরু করতে হবে। কবি মনের এই কামনা 'পুনশ্চ' কাব্যের "নূতন কাল" কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কবির 'পুনশ্চ' পর্যন্ত কবি-জীবনের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে এই কবিতায় বিবৃত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' পূর্ববর্তী কচি আমের গুটির পর্বের কাঁচা ফল নিয়ে কাব্যরচনার যাত্রা শুরু করে নানা পর্ব অতিক্রম করার পর কবিজীবন আশু বৃন্তচ্যুতির যখন অপেক্ষা করছে তখন পূর্ববর্তী পর্বের উদ্বৃত্ত নিয়ে কাব্যের নতুন কারবার শুরু করার ইচ্ছা কবির ছিল না, কাব্য কবিতার হিসাব চুকিয়ে দিয়ে কারবার বন্ধ করে এই জীবন থেকে বিদায় নিতে কবি যখন ইচ্ছুক তখন 'নতুন কাল'-এর কাছ থেকে নতুনতর আহ্বান শুনে পুনশ্চ গ্রন্থি বেঁধে দিতে হল নতুনকালের সঙ্গে, পুরাতন কালের, কবি বলেছেন—

করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।
তাই ফিরে আসতে হল আর-একবার।

দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারই মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে।

পুনশ্চ পর্বে নতুন কালের নতুন কবিতায় যে পালা শুরু হল আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ই আলোচনা করা হবে।

---

১ গ্রন্থপরিচয়, বলাকা পৃ.১১৭ (১৩৫৭)
২ তদেব পৃ. ১১৩
৩ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী শ্রীমতী মলিনা রায় অনূদিত পৃ. ১-২ (১৯৫৭)
৪ চিঠিপত্র (২য়খণ্ড) পৃ. ২৮
৫ শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্ত অনুলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত
৬ রবিতীর্থে, অসিত হালদার পৃ. ৫৩ (১৩৬৫)
৭ গ্রন্থপরিচয়, বলাকা পৃ. ১৬৭
৮ 'পথে ও পথের প্রান্তে' পত্র ৩০, পৃ. ৬৪
৯ বলাকা-কাব্য পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন পৃ. ১২৬
১০ গ্রন্থপরিচয়, বলাকা, পৃ. ১৭১
১১ "রুদ্ধগৃহ", 'বিচিত্র প্রবন্ধ' রবীন্দ্র-রচনাবলী (৫ম) পৃ. ৪৭৭-৪৭৮
১২ "পথপ্রান্তে" 'বিচিত্র প্রবন্ধ' রবীন্দ্র-রচনাবলী (৫ম) পৃ. ৪৮২
১৩ বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন পৃ. ৭৬-৭৭
১৪ ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি সবই Creative evolution-H. Bergson. A Mitchell কৃত অনুবাদ গ্রন্থ থেকে নেওয়া। উক্ত গ্রন্থের ১, ২, ৬, ৭, ৮, ২৪ ও ২৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য
১৫ "আমার জগৎ" সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (প. ব. সরকার) পৃ. ৫৬১
১৬ অজিত চক্রবর্তীকে লিখিত কবির পত্র, প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত।
১৭ যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৯শ খণ্ড) পৃ. ২৮
১৮ রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী শ্রীমলিনা রায় অনূদিত পৃ. ৭৭
১৯ আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ. ২৩৬.
২০ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, আবু সয়ীদ আইয়ুব।
২১ "পাপের মার্জনা" 'শান্তিনিকেতন' (২য় খণ্ড) পৃ. ৪০৫-৪০৬ এবং পরবর্তী অংশের জন্য ৪০৭ পৃ. ৭৮ দ্রষ্টব্য।
২২ বলাকা কাব্য পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন পৃ. ৮৪-৮৫.
২৩ রবীন্দ্র সরণী, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী পৃ. ২২৯ (পাদটীকা)

২৪ তদেব পৃ. ২০৪

২৫ চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড) পত্র ৫৫ পৃ. ২২১-২২২

২৬ চিঠিপত্র (২য় খণ্ড) পত্র২২

২৭ চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড) পত্র ১০ পৃ. ৪৪

২৮ মুদ্রণকালে বর্জিত এই অংশ বক্তৃতার মূল পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত। পাণ্ডুলিপি শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২৯ অধ্যাপক : শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য 'কিছুক্ষণ' কবিকল্পিত সংলাপ, শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

৩০ 'পত্রাবলী' শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত, 'দেশ' ১৮ই চৈত্র ১৩৬৭

৩১ যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৯খণ্ড) পৃ. ৪০৪-৪০৫

৩২ রবীন্দ্র সরণী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী পৃ. ২৪৮

৩৩ গ্রন্থপরিচয় 'যাত্রী', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) পৃ. ৫৩৭-৫৩৮

৩৪ প্রবাসী ১৩৪৯ চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত।

৩৫ Rabindranath Tagore-A Centenary Volume (Sahitya Akademi) পৃ. ৩৯

৩৬ 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৫৭ 'বৈকালী' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ কবির হাতের লেখায় মুদ্রিত হয়েছে।

৩৭ গ্রন্থপরিচয়, 'লেখন' রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃ. ৫২৯

৩৮ ভূমিকা, 'লেখন' রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃ ১৫৭.

৩৯ গ্রন্থপরিচয়, 'লেখন', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৪শ খণ্ড) পৃ. ৫২৭-৫২৮

৪০ 'স্মৃতিচিত্রণ', পরিমল গোস্বামী পৃ. ১৩৫-১৩৬ (১৩৬৭)

৪১ রবীন্দ্রনাথের সূক্তি-কবিতা—ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ পৃ. ১০৪

৪২ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত, 'দেশ' ৯ই বৈশাখ ১৩৬৮

৪৩ তদেব, 'দেশ' ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৭

৪৪ তদেব, 'দেশ' ১৪ই মাঘ, ১৩৬৭ (পাদটীকা)

৪৫ তদেব, 'দেশ' ৯ই বৈশাখ ১৩৫৭

৪৬ তদেব, 'দেশ' ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৭

৪৭ তদেব

৪৮ সূচনা, মহুয়া পৃ. ১২ (১৩৬০)

৪৯ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত, 'দেশ' ২৫শে চৈত্র ১৩৬৭

৫০ গ্রন্থপরিচয়, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১০ম খণ্ড) পৃ. ৬৫০

৫১ গ্রন্থপরিচয়, 'মহুয়া', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) পৃ. ৫২৮

৫২ পত্রাবলী, শ্রীমতী 'নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত, 'দেশ', ২৩শে পৌষ ১৩৬৭

৫৩ রবীন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্তী পৃ. ২২ (১৩৬৭)

৫৪ তদেব পৃ. ২৩

৫৫ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ. ৪৭০-৪৭১

৫৬ তদেব পৃ. ৪৭২

৫৭ ভূমিকা, 'বনবাণী,' রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) পৃ. ১১৩-১১৪.

৫৮ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) পৃ. ৫৩০.

৫৯ জীবন-স্মৃতি, পৃ. ৫১ (১৩৬৩)

৬০ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫শ খণ্ড) পৃ. ৫৩৫-৫৩৭

৬১ তদেব পৃ. ৫৩৭-৫৩৮

৬২ রবীন্দ্র জীবনী (৩য় খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর পৃ. ৪০১ উদ্ধৃত থেকে।

৬৩ গ্রন্থপরিচয়, "'পরিশেষ' রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৫ শ খণ্ড) পৃ. ৫৪৪

৬৪ তদেব. পৃ. ৫৪৩

৬৫ 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (১০ম খণ্ড) পৃ. ২৭৭-২৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

পুনশ্চ পর্ব

পুনশ্চ (১৯৩২)

আমাদের বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রকাব্যের শেষ অধ্যায়ের সূচনায় রয়েছে যে কাব্যখানি তার নামকরণে কবির ভবিষ্যৎ দৃষ্টির আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে পূর্ববর্তী কাব্যধারার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে কবি 'পুনশ্চ' দিয়ে আবার যে কাব্যরচনার পালাটি শুরু করলেন তা শেষ পর্ব হলেও সামান্য পর্ব নয়—রচনার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায় ও প্রকাশের উৎকর্ষে আধুনিক কাব্যপাঠককে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করে দেওয়ার মত উপকরণ এই পর্বে আছে। উত্তর-সত্তর কবির পক্ষে বয়সের ভার শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে শেষ পর্বে মাত্র দশ বছরে বিশখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা কি করে সম্ভব হল সে রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়—তবে সম্ভব যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। শেষ পর্বের সমস্ত কাব্যকেই একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। তদুত্তরে আগে ভাগেই বলে নেওয়া ভালো যে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমরা দেখছি নিজের কাব্য সম্পর্কে কবির বিশেষ আর কিছু বক্তব্য নেই। এই পর্বের প্রথম কাব্যখানি সম্পর্কে কবি যা কিছু বলেছেন পরবর্তী গদ্যরীতিতে লেখা কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাই খাটে। শেষের কাব্যগুলি সম্পর্কে এক-আধটু মন্তব্য যা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তা চয়ন করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। শেষ জীবনের কাব্য কার্যতঃ কবির আত্মবিশ্লেষণের, আত্মবিচারের কাব্য। রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ কবিজীবনের শেষ দশ বছরের ফসল হলেও এই সব কাব্য সম্পর্কে কবিকৃত আলোচনার পরিমাণ খুব কম বলেই সমস্ত কাব্যকেই একটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বকাব্য সম্পর্কে কবির বক্তব্যের পরিমাণ কম হওয়ার অনেকগুলি কারণ অনুমান করা চলে। প্রথমতঃ কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌছল সুতরাং তাঁর কবি-জীবনের সমাপ্তি দশায় লেখা কাব্যকে গ্রহণ করার দ্বারা উত্তরকাল যদি নিজেকে লাভবান মনে করে ত করুক, না করলে তাকে কাব্যের অর্থ বোঝাতে অর্থহীন চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে নিরর্থক। দ্বিতীয়তঃ, শেষের দশকে কবি যে

বিপুল সংখ্যক কাব্য লিখেছেন তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সময়সাধ্য ব্যাপার কিন্তু সে সময় কবির হাতে আর নেই বলেই 'আশু বৃন্তচ্যুতির' অপেক্ষমান কবি মনে করেছেন। তাছাড়া পূর্ব পূর্ব পর্বের মতো এই শেষ পর্বেও কবি শুধু কাব্যই লেখেন নি সেই সঙ্গে যথারীতি উপন্যাস, গল্প, বিপুল সংখ্যক গদ্যপ্রবন্ধ রচনা করেছেন, আর এই সময় অজস্র চিত্রাঙ্কনও তাঁকে করতে দেখা যায়। সুতরাং কবির হাতে যে সময় অত্যন্ত কম ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশ্য গদ্য রচনায় কবির সমালোচক মনের যে আশ্চর্য বুদ্ধিদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেই প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভা আদিতে যেমন অতি প্রখর অনুভূতির সঙ্গে মানস ক্রিয়ার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তেমনি অন্তেও তা ভাবুকতার সঙ্গে অতি প্রখর মানসধর্মের সহযোগিতা রক্ষা করেই চলেছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ সেই সব বিরল সাহিত্যস্রষ্টার সঙ্গে একাসনে বসতে পেরেছেন যাঁরা একাধারে কবি ও সমালোচক।

তবুও যে কেন কবি তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতার সম্যক্ আলোচনা করেন নি তার আরও একটি বড়ো কারণ তাঁর শেষের কবিতার অর্থাৎ শেষ পর্বের কবিতার সমালোচনার তীব্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। 'রবীন্দ্র-নাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই'—একথা রবীন্দ্রবিরোধী আধুনিক কবির দল প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কবি নিজেই সুচতুর শ্লেষের মধ্য দিয়ে 'শেষের কবিতা'য় নিবারণ চক্রবর্তী মারফৎ তা প্রমাণিত করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বী এই অত্যাধুনিক কবির কবিতাও যে অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি সেকথা নিবারণ চক্রবর্তীর নামে প্রচারিত অমিট রে-র কবিতা পাঠকালেই বুঝা যায়। শুধু তাই নয়, এই দুর্দান্ত রবীন্দ্র-সমালোচক অমিত রায় নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে রবীন্দ্রনাথের যতই সমালোচনা করুক শেষ পর্যন্ত নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে হালধারিণী কেটিকে রবীন্দ্রনাথেরই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পড়ে শুনিয়েছে, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দোসর রবীন্দ্রনাথ নিজে একথা যখন প্রমাণিত হল তখন আর কাব্য ব্যাখ্যা করে পাঠক জুটাবার কি প্রয়োজন? শেষ পর্যায়ের কাব্য রচনাকালে কবি বুঝেছিলেন—

"কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।[১]"

আর দীর্ঘকাল কাব্যচর্চার ফলে কবি এটাও বুঝেছিলেন সাহিত্যের ঐ বাজারদর চিরকাল এক থাকে না, 'কালে কালে সাহিত্য বিচারের রায় একবার উল্টিয়ে আবার পাল্টিয়েও থাকে।' সুতরাং এই উল্টাপাল্টা কথায় কান দেওয়ার মত ইচ্ছা তাঁর ছিল না, হয় তো প্রয়োজনও ছিল না। সাহিত্যের সত্য মূল্যের উপরেই তিনি আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

তবুও যে শেষ পর্যায়ের গোড়ার কয়েকখানি কাব্য সম্পর্কে কবিকে কিছু কথা বলতে হয়েছে তার কারণ উত্তর কাব্যের গোড়াতেই কবি নতুন একটি আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন—গদ্যকবিতার। এই গদ্যকবিতা প্রসঙ্গে কবির বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত বহু বিক্ষিপ্ত আলোচনা পাওয়া যায়। সেই সব আলোচনার আলোকে রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' পর্বের কাব্য বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি নিজেই তাঁর গদ্য ছন্দ চর্চার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস দিয়ে গদ্যরীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য ও এই রীতিতে কাব্য রচনায় সিদ্ধিলাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কবি-লিখিত গদ্য-রীতি চর্চার ইতিহাসটুকু এই রকম—

"গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্য, ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।...আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি 'লিপিকার' অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।"[২]

বাংলা ছন্দের মুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে মহাকবি মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, মাঝখানে রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু কবিতার ছন্দোমুক্তির ইতিহাসে তাঁদের দান তেমন কিছু স্মরণীয় নয়। সেই রকম কৃতিত্বের অধিকারী দুই কবি—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কবি স্বয়ং তাঁর গদ্যছন্দ চর্চার যে ইতিহাস 'পুনশ্চে'র ভূমিকায় দিয়েছেন, আমাদের মতে তা সম্পূর্ণ নয়। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ ১৯১১-১২ সালের কথা। 'লিপিকা'র রচনাকাল

১৯২২। মাঝে প্রায় ১১ বছর ছন্দোমুক্তির কোনও চেষ্টাই কবি করেন নি এমন কথা বলা চলে না, বিশেষ করে এদের মাঝখানে সমিল মুক্তক ছন্দে রচিত 'বলাকা' কাব্যখানি যখন বর্তমান। ছন্দের বন্ধন মোচনের যে আকাঙ্ক্ষা কবির বহুদিনের, 'বলাকা'য় সার্থকভাবে যেন সেই বন্ধন মুক্তির আনন্দই কবি অনুভব করেছেন। পরবর্তীকালে 'লিপিকা'য় ছন্দোমুক্তি সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে 'পুনশ্চে'র গদ্য কবিতায় ছন্দের চরম মুক্তি সাধনায় কবি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'পুনশ্চে'র ভূমিকাতেই কবি গদ্যছন্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গদ্যছন্দের স্বরূপ, পদ্যছন্দের সঙ্গে এর মৌল পার্থক্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য প্রবন্ধ ও পত্রাকারে অন্যত্র বিন্যস্ত হয়েছে। ভূমিকার মন্তব্যের সঙ্গে তা একত্র আলোচনা করলে গদ্য রীতির কবিতা সম্পর্কে কবির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য মেলে।

কবির মতে, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতায় রস দেওয়া যায় কিনা' এইটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যই তিনি গদ্য কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কবির এই অভিমত সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায় শক্তিশালী কবি কবিতার স্বরূপ সন্ধানে কৌতূহলী হয়ে কবিতার সঙ্গে ছন্দের যে নিত্য সম্পর্ক তাকে কিছুটা বিশ্লিষ্ট করে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকারকে বাদ দিয়েই কাব্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করেন, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্বার্থ এক সময় এই চেষ্টা করেছিলেন। শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ নন, উনিশ শতকের প্রথম দিকে কোলরীজ, শেলী, কীট্স্ প্রমুখ রোম্যান্টিক কবিগণও আঠারো শতকের 'পোয়েটিক ডিক্শন' থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে 'the language of a large portion of every good poem must necessarily in no respect differ from that of good prose."[৩]

রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর পরিণত বয়সে কাব্যের রসকে রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে? তবে লক্ষণীয় এই যে গদ্য কবিতায় পদ্য কবিতার 'সুস্পষ্ট ঝংকার' না থাকলেও অস্পষ্ট ঝংকার, ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ থাকতে বাধা নেই, হয়তো তা থাকা উচিত বলেই কবি বিবেচনা করেছেন, তাই 'সুস্পষ্ট' কথার উপর জোর দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা সম্পর্কে কবির পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যটিও লক্ষ্য করার মত। তাঁর গদ্য কবিতাতে 'ভাষাবাহুল্য' দোষরূপে পরিগণিত হয়েছে, সুতরাং গদ্য কবিতাতে

ভাষা ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কবির এই মন্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে কবির নিজের কবিতা সম্পর্কেও ঐ একই অভিযোগ আনা চলে। যে ভাষাবাহুল্যকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার দোষ বলে কবি মনে করেছেন, কবির নিজের কবিতা, বিশেষ করে 'পুনশ্চ' পর্বের কবিতাই কি সম্পূর্ণ সেই দোষ মুক্ত? তাঁর গদ্যকবিতার ভাষায় শব্দাতিরেক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় আর তারই ফলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় ভাষা ও ভঙ্গী পরবর্তী গদ্য কবিতা লেখকদের কতকটা অননুকরণীয় হয়ে উঠেছে।

সে যাই হোক, গদ্য কবিতা সম্পর্কে কবির বলার কথা এই 'গদ্য কাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে-পারে।'[৪]

অর্থাৎ শুধু ছন্দের বন্ধন ভাঙাই গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, গদ্য কবিতার যে একটা পোষাকি রূপ রয়েছে, ভাষা, প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করতে হবে। ভাষা বাহুল্য তো নয়ই, এমনকি ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে পদ্য কবিতায় কবিকর্মের যে অলিখিত বিধি বলবৎ আছে তাকেও ভাঙতে হবে. কবি নিজেই সে চেষ্টা করেছেন। 'পুনশ্চে'র ভূমিকায় কবির নিজস্ব স্বীকৃতিতেই তার প্রমাণ আছে। কবি লিখেছেন, "পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন তরে, সনে, মোর, প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।"

শুধু গদ্যে অব্যবহৃত শব্দকে বাদ দেওয়াই নয়, কবি পদ্য কবিতায় স্বল্প ব্যবহৃত 'কখনও' 'জন্যে' 'সঙ্গে' 'এবং' 'হঠাৎ' 'অতএব' 'মধ্যে' প্রভৃতি শব্দকে গদ্য কবিতায় বহুল ব্যবহার করেছেন, কারণ গদ্য কবিতায় এই জাতীয় শব্দ গদ্য ভঙ্গীর পক্ষপাতী বলে বিষয়ের সঙ্গে সহজেই হাত মেলাতে পারে, বক্তব্য বিষয়ের যে নিরাবরণ নিরাভরণ পৌরুষ তাকে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ করে।

দেশী-বিদেশী সংস্কৃত প্রাকৃত শব্দ ব্যবহারেও কবি গদ্য কবিতাতে যথেচ্ছ স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছেন। উপমা অলঙ্কারাদি ব্যবহারেও কবি এই সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা কিভাবে দূর করেছেন রবীন্দ্র-রচিত গদ্য কবিতা থেকে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে—

> পেঁপে গাছগুলোর যেন **আতঙ্ক** লেগেছে
> উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে **বিদ্রোহ**
> তালগাছগুলোর মাথায় **বিস্তর বকুনি** ("সুন্দর", 'পুনশ্চ')

এছাড়া সমাস বা সন্ধির পরিবর্তে দেশী-বিদেশী গ্রাম্য নানা শব্দের সংমিশ্রণে যৌগিক শব্দগঠনের দ্বারাও কবি ঐ গুণ্ঠন প্রথা লঙ্ঘন করে গিয়েছেন—যেমন

রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো ("দেখা" 'পুনশ্চ')

মাথায় **ভিজে চাদর-জড়ানো-গা-খোলা মোটা** মানুষটি

("পুকুর ধারে"-ঐ)

কিন্তু গদ্যকবিতায় 'পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার' ত্যাগ করে 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন' ভেঙে, ভাষা ও প্রকাশরীতিতে সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক করাব দিকে যথেষ্ট নজর দিলেও কবি বুঝেছিলেন গদ্য কবিতা রচনায় সাফল্য নির্ভর করে না কেবলমাত্র শব্দ ছন্দ চিত্রকল্পের অভিনবত্বের উপর, গদ্যেও কবিতার রস দেওয়ার দিকেই কবিকে নজর রাখতে হয় তাই গদ্যকেও কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করার উপরেই যে গদ্য কবিতা রচনার সার্থকতা সে কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি—

"গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়, তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভেতরে অতি-মাধুর্য, অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা আপনি উদ্ভব হয়।"[৫]

কবির এই মন্তব্যকে তাঁরই অন্যান্য উক্তির সাহায্যে যদি একটু বিশ্লেষণ করা যায় তবে গদ্য-কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি সুস্পষ্ট হবে। 'কাব্য ও ছন্দ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।"[৬]

ঐ প্রবন্ধেই কবি আরও বলেছেন,—

"গদ্যই হোক, পদ্যই হোক রস রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য ছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।"

কবির এই উক্তি থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, গদ্য কবিতাতেও একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে সেই ছন্দ পাঠকের কানে হয়তো ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে মনে এবং মনের ছন্দকে সৃষ্টি করতে কবির মনের মধ্যেও একটা

পরিমাণ বোধ থাকা চাই। গদ্য আর গদ্য ছন্দ এক নয়। গদ্যছন্দ 'গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করার পরেই পাঠকের মনে জাগে আর এই গদ্যছন্দ প্রাত্যহিক ব্যবহারের গদ্য থেকে আলাদা, 'এর ভেতরে অতিমাধুর্য, অতিলালিত্যের মাদকতা যেমন থাকে না তেমনি প্রাত্যহিক ব্যবহারের তাগিদও এই জাতীয় ছন্দ সৃষ্টির মূল প্রবর্তনা নয়, কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির উদ্ভব না করা পর্যন্ত গদ্য কবিতা সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করা সম্ভব নয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে, কবি তাকে বলেছেন 'ভাবের ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যে গদ্যের সীমানায় পদ্য এসে বাসা বেঁধেছে এই ভাবের ছন্দ দিয়ে। এই ভাবছন্দের অধিকারী ভেদ আছে। কবির নিজের কথাতেই বলা চলে—

> একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
> পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
> এর নানারকম গতি অবগতি ।
> বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
> অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
> গুরু লঘু নানা ভঙ্গীতে। ("নাটক", 'পুনশ্চ')

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার অন্তরে এই যে ছন্দের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত তাকে আয়ত্তে আনতে 'রাজপ্রতাপ' অর্থাৎ ক্ষমতার দরকার। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যে গদ্যকবিতার বহুল চর্চা লক্ষ্য করা গেলেও রবীন্দ্র সমতুল্য ক্ষমতার অধিকার কোন্ কবির? বরং গদ্যকাব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবির আশঙ্কাই কিছুটা সত্য হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন—'অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে।'

গদ্যকাব্য রচনায় পরবর্তী কবিদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ তাঁদের 'স্বাভাবিক' 'নিগূঢ়' ছন্দবোধের অভাবই নয়, স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই এমন একটা বিশেষ ঐশ্বর্য আছে যা সমস্ত বাঙালী কবিদের মধ্যেই দুর্লভ—আবার শুধু ভাষার জাদুই নয় অলঙ্কারের অতুল বৈভবেরও তিনি অধিকারী। এই দুই গুণের সঙ্গে কবি-কল্পনার বিশাল ব্যাপ্তি তো ছিলই। ফলে গদ্যই হোক পদ্যই হোক রবীন্দ্র-রচনা অনায়াসেই রসরচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখা কবিতারও আবেদন তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতারই মত আমাদের রসবোধের কাছে. কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যকবিতার অধিকাংশেরই বোঝাপড়া হয় আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে।

গদ্যকাব্যের 'প্রযুক্তি' সম্পর্কে কবির আলোচনা এই পর্যন্ত, এবারে গদ্য-কাব্যের 'প্রসঙ্গ' নির্দেশ করতে গিয়ে কবি যে মন্তব্য করেছেন তার আলোচনায় আসা যাক। কারণ প্রসঙ্গের প্রয়োজনেই প্রযুক্তির উদ্ভাবনা, কবি নিজেই সে কথা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

"অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।"

কবির এই অভিমতের সমান্তরাল অভিমত অন্যত্রও পাওয়া যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে কবি বলেছেন—

"কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্যসংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়।"[৭]

ঐ একই পত্রে কবি আরও বলেছেন,

"প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্যে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভাব অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে।"

গদ্যকবিতার প্রসঙ্গ-বিষয়ক কবির এইসব অভিমত থেকে একটি মূল সূত্রের সন্ধান অনায়াসেই পাওয়া যায় তা হল—কাব্যের অধিকার বাড়ানোই গদ্য-কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তবে গদ্য-কবিতার ভাষা চলতি গদ্যের ন্যায় অসংকুচিত বা নিছক আটপৌরে গদ্যরীতি সম্মত নয়, যদিও তা সংগীতের আবেশ মুক্ত। গদ্যের দৃঢ়কাঠিন্য এবং চিন্তাধারার প্রবাহানুগামী সরল প্রবহমান গতির মধ্যে কাব্যের ধ্বনি ও রস সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন কবি এবং বিষয় গৌরবের উপরেই আপন বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কাব্যকে শেষ জীবনে আরও বেশী পরিমাণে জীবননিষ্ঠ করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে কবির মনে। শুধু গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুই নয়, তুচ্ছ বিষয়কেও কাব্যগত সত্য করার প্রয়োজনে কবি গদ্য-কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। কাব্যে দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিন বাস্তবতার ছবি—জীবনের ভাঙাচোরা দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠুক—এই কামনায় সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার শেষ দিকে যুগোপযোগী একটি কাব্যরীতি ও একটি যুগছন্দ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কবির মনে। আমরা জানি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের কাব্যে বারবার তাঁর কাব্যের অসম্পূর্ণতার কথা স্মরণ করে অনাগত এক গণকবির আগমনী গেয়েছেন—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

সমকালীন বাংলাকাব্যে উপেক্ষিত বিষয় কাব্যে 'সত্য হোক' এবং যে গণ-কবির কাব্যে তা সত্য হবে বলে কবি আশা করেছেন, অনাগত সেই কবির অগ্রপথিক হিসাবে একটা পথনির্দেশক 'বাণী' কবি রেখে যেতে চেয়েছেন, আর এই কারণেই গদ্য কবিতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষের অবহেলিত জীবনের সুখ দুঃখের কথা এতদিন ছন্দোবদ্ধ-গীতে তিনি যে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি সে আক্ষেপ শেষ জীবনে কবি বারবার করেছেন। তুচ্ছ অনাদৃত বিষয়াবলম্বনে ছন্দকাব্য লেখা চলে না এবং লেখা হলে ছন্দ কাব্যের আভিজাতিক সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় বলে কবি মনে করেছেন। তুচ্ছ ও অতুচ্ছ সকল রকমের বিষয়বস্তু প্রকাশের প্রয়োজনে কবি গদ্যরীতির অভিনব আঙ্গিকটির আশ্রয় নিয়েছেন। গদ্য কবিতার ভাষা 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা' যে ভাষায় 'ভাষার গান' আর 'ভাষার গৃহস্থালী' সেতুবন্ধ রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যের কাব্যশ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ উপমার সাহায্যে—

"গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা করো, তাহলে জানবে, তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির হিসেব রাখেন, তার কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উচ্ছলিয়ে ওঠে পাথর ডিঙিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীর। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া।"[৮]

এইভাবেই গদ্য কবিতা হয়ে উঠে। কবির মতে, 'গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য এবং গদ্য-কবিতার মধ্যে এই ভাইবোনের সম্পর্ক অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের একাধিক গদ্যকবিতার গদ্যরূপ পাওয়া যায় কবি-লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত বেশী

যে উভয় রচনাকে যমজ ভাইবোন বলেই মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৩৬ সংখ্যক রচনার অংশ বিশেষের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'সুন্দর' কবিতার অংশ বিশেষের তুলনা করা চলে। ৩২ শে আষাঢ় ১৩৩৯ তারিখে লেখা পত্রে কবি লিখেছেন—

"প্লাটিনামের আঙ্‌টির মাঝখানে যেন হীরে—আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে। তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্‌দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই—হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরো দূরে উত্তরের মাঠে আমার পঞ্চবটীর নিম গাছের ডালে ডালে চলেছে আন্দোলন, আর তার মাথায় বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে।"

৭ই ভাদ্র ১৩৩৯ তারিখে লেখা 'সুন্দর' কবিতার সূচনাংশ এইরকম—

প্ল্যাটিনামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্‌দুর আসছে মাঠের উপর।
হু হু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিম গাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তাল গাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।

এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া চলে যেমন 'বাসা' কবিতার সঙ্গে প্রতিমা দেবীকে লেখা পত্র ('পুনশ্চ' গ্রন্থ পরিচয়ে উদ্ধৃত), 'বিচ্ছেদ' কবিতার সঙ্গে তুলনা করা চলে 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যক রচনাটি, 'নাটক' কবিতার পাশাপাশি তিন বছর আগে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সালের পত্রটি পাঠ করলেই আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা বুঝতে পারা যাবে। শেষোক্ত পত্রটিকে অনায়াসেই নাটক কবিতার প্রাক্‌রূপ বলা চলে। উভয় রচনার সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের শেষপর্বে গদ্যপদ্যের মধ্যে একটা রফা নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা যায়—

"সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন কিন্তু কৃতকার্য হন নি। এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে বিরোধ ঘুচলো।"[১০]

তবে কবি যখন গদ্যকাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—

"আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনোরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না।"

তখন মনে হয় কবি নিজেই যেন গদ্য ও পদ্যের মধ্যে জাতের পার্থক্য স্বীকার করে গদ্যকবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব করেছেন। কারণ সাহিত্য সৃষ্টিতে যিনি সব্যসাচী—সাধু ও চলিত, পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দ সৃষ্টিতে যাঁর দক্ষতা তুল্যরূপ তাঁর পক্ষে এই ধরনের উক্তি গদ্যছন্দের সপক্ষে ওকালতি ভিন্ন আর কি বলা চলে। বরং কবির অপর এক উক্তিকে এ ব্যাপারে অনেক বেশী যথাযথ বলে স্বীকার করা যায়। গদ্যছন্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্য পদ্যে রফা নিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এককালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।"

পুরাতন কালের খাতিরে কবি যে নতুন কালকে অবহেলা করেন নি তার প্রমাণ আমরা 'পুনশ্চ' পর্বের কাব্যালোচনার সূচনাতেই পেয়েছি—নতুন কালের নতুন রীতির নতুন কাব্য রচনা করে কবি কাব্যের অধিকার প্রশস্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার শ্রেণী নির্ণয় ব্যাপারে কবির স্বীকৃতি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"'পুনশ্চ' কবিতাগুলোকে কোন সংজ্ঞা দেবে। পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে অতি ব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে না ঘোড়া বলবে?...খনিজ বলতে দোষ আছে কি। সোনা বলতে পারি এমন অহংকার যদি বা মনে থাকে মুখে বলবার সাহস নেই। না হয় তাঁরাই হল। অর্থাৎ এমন কোন ধাতু যাতে মূর্তি গড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে, তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ রূপ রসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।"

গদ্যকবিতাকে রবীন্দ্রনাথ কবিতারই সগোত্র বিবেচনা করেছেন এবং এই জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেছেন—

"কেবলমাত্র কাব্যের অধিকার বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ এই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এরপর আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে।"[১১]

কবির হাতে সময় কম থাকায় কাব্যের অধিকার বিস্তারের কাজে গদ্যছন্দের উপযোগিতা কতদূর তা নিঃশেষে প্রমাণ করার অবকাশ তাঁর হয়নি। তাছাড়া কবির খেয়ালী মনে কখন কোন খেয়াল আসে তারও কিছু স্থিরতা ছিল না। 'পুনশ্চ' কাব্য প্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তীকালে 'বিচিত্রিতা' কাব্য প্রকাশ করে কবি তাঁর ঐ খেয়ালী স্বভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন।

গদ্যকবিতার ছন্দ নিয়ে দীর্ঘকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অবসর হয়নি তার আরও একটা কারণ কবির কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছেন—

"আমার মধ্যে একটা প্রবল অযৌক্তিক পাগলা আছে—সে যখন কোমর বেঁধে দাঁড়ায় তখন অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে ভুলিয়ে দেয়। এই পাগল, এই ভোলানাথ, আমার কবি-জীবনে অনেক কাজ করেচে—তাই একে একেবারে জবাব দিতে পারিনে—তাছাড়া আমিই তো এর সম্পূর্ণ মনিব নই।"[১২]

এই পাগল ভোলানাথ একসময় কবিকে দিয়ে কতকগুলি গদ্যকবিতা লিখিয়ে নিয়েছেন—'পুনশ্চ-শেষ সপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী'—এই চারখানি গদ্যকাব্য রচনা শেষ করিয়েই বা তারও আগেই কবিকে ছন্দের জগতে ফিরিয়ে এনেছেন। ১৯৩৬ সালের পরে এক-আধটি ব্যতিক্রম ভিন্ন কবি আর গদ্য কবিতা লেখেন নি। তবে ১৯৩২-৩৬ এই চার বছর গদ্যকবিতা চর্চার মাধ্যমে কাব্যের সীমানায় গদ্যছন্দের যে গেট বসালেন কবি সেই খোলা দরজার কাছে ভিড় জমতে দেরি হল না। গদ্যের ছন্দে কাব্য রচনা সহজ মনে করে অনেক কবি এবং বহু সংখ্যক অ-কবিই গদ্যকবিতা রচনায় উৎসাহিত হলেন। যাঁরা কবি তাঁদের হাতে গদ্যকবিতা কিছুটা রসোত্তীর্ণ হলেও যাঁরা অ-কবি তাঁরা যখন কবিকে দলে টেনে নিজেদের সকল অকীর্তির দায় তাঁর ঘাড়ে চাপাতে চাইলেন তখন কবিকে কাজে কাজেই নিরুদ্দেশ হতে হল। 'শ্যামলী'র পর হয়তো সেই কারণেই তিনি এই রীতির কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন। কবি নিজেই গদ্যছন্দ চর্চার বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

"অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অনতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে।"[১৩]

অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান কি পরিমাণে স্তূপাকার করে তুলবে তার কিছু নমুনা কবি জীবদ্দশাতেই হয়তো

প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবির সাবধান-বাণীকেই যেন আর একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন—

'তপস্যা-কঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।'[১৪]

সে যাই হোক, বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্যকবিতা কাজে লাগবে বলে কবি একদা যে আশা করেছিলেন তা রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যে অনেকখানিই অপূর্ণ রয়ে গেছে বলা চলে। গদ্য-কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথের মহা-উত্তরাধিকার আধুনিক গদ্যকবিতা রচয়িতা কবিরা কতদূর গ্রহণ করতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গদ্যছন্দ আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নতুন কাল ও জনগণের কাছে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কবির স্বর্গচারী কল্পনা মাটির কাছাকাছি এসেও যুধিষ্ঠিরের রথের মতোই মর্ত থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রক্ষা করে চলেছে। রবীন্দ্রানুজ কবিদের গদ্য-কবিতায় বাস্তবতা অতি-প্রত্যক্ষ সত্য হলেও বুদ্ধির দীপ্তি সেখানে এত প্রখর যে মনে হয় রচনারীতি, চিন্তাপ্রণালী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার দিক থেকে তা সাধারণ মানুষের খুব কাছে নেমে আসতে পারেনি। আধুনিক গদ্যকবিতা রবীন্দ্র-প্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অনুসরণ করে তা রচিত হয়নি—তা রবীন্দ্রনাথে শুরু হলেও স্বতন্ত্র পথে বিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট রবীন্দ্র-কবি-মানসের আত্মপ্রকাশের বহু বাহনের অন্যতম বাহন, কারও কারও মতে 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা গদ্যেরই এক বিশেষ ঢঙ্‌, তাঁহার বিচিত্র গদ্যরীতির ইহা একটি অভিনব নিদর্শন।'[১৫] রবীন্দ্রনাথেই এর সূচনা, রবীন্দ্রনাথেই এর পরিসমাপ্তি। কাব্যের অধিকার বাড়ানোর যে মহৎ উদ্দেশ্যে কবি এই বাহনটির পরীক্ষা করেছিলেন তা কবির নিজের ক্ষেত্রে কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গেলেও গদ্যকবিতার এই ছন্দ পরীক্ষা কবির কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একভাবে আশ্চর্য সফলতার সন্ধান দিয়েছে। পরবর্তীকালে 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া' প্রভৃতির মধ্যে ছড়ার ছন্দে, প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দের পরীক্ষা শেষ করে কবি অবশেষে একেবারে অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে যে অপরূপ কবিভাষায় এসে পৌঁছেছেন গদ্যকবিতার ছন্দচর্চা তাঁকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে বলা চলে।

অবশ্য গদ্যকাব্য সম্পর্কে কবির সকল উক্তিই যে সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণীয় নয় তা আমরা আগেই বলেছি। পুনশ্চ বলা চলে এই ছন্দ রীতিকে কবি যখন তাঁর খেয়ালি মনের সৃষ্টি বলে ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁর সঙ্গে আমরা

একমত হতে পারি না। সত্য বটে রবীন্দ্র রচিত গদ্য কবিতার মধ্যে এমন দু-চারটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া শক্ত নয় যেখানে কবিতা সৃষ্টির পিছনে অন্তরের তাগিদ বা মহৎ কোন প্রেরণার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই জাতীয় কবিতার পরিমাণ খুবই কম। বরং গদ্যছন্দ আশ্রয়ে কবি এমন কিছু আশ্চর্য সৃষ্টি রেখে গেছেন যার কাব্যোৎকর্ষ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই অভিনব আঙ্গিকটি আশ্রয়ে কবি কখনো আত্ম-বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও করেছেন অতীতের স্মৃতিচারণ, কখনও মানবজীবন ও মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন কখনও আবার তাঁর পরিণত দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ করেছেন। কবিতায় গদ্যছন্দের উপযোগিতা সম্পর্কে 'পুনশ্চ' কাব্যে কবি যে পরীক্ষা শুরু করেছেন তার সার্থক এবং বোধ করি শ্রেষ্ঠ ফসল "শিশুতীর্থ" কবিতাটি। এই কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের কিছু আলোচনাও পাওয়া যায়। এই কবিতাটি কবির একমাত্র কবিতা যা মূলে ইংরেজীতে লেখা—১৯৩০ সালে জার্মানীতে বসে 'দি চাইল্ড' নামে কবি যে কবিতাটি লেখেন ১৯৩১ সালে 'শিশুতীর্থ' নামে কবি নিজেই তার রূপান্তর সাধন করেন।

'শিশুতীর্থ' কবিতার বিষয়বস্তুর কবিকৃত একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ১৩৩৮ আশ্বিন মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তীর্থযাত্রী' প্রবন্ধে। আগের মাসে ঐ পত্রিকাতেই 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি যে শিরোনামে মুদ্রিত হয় কবি যেন অথর্ববেদোক্ত সেই শ্লোকটিরই ভাষ্য রচনা করেছেন তীর্থযাত্রী প্রবন্ধে—

> সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ
> —ইনি সনাতন। ইনিই অদ্য পুনর্নব।

সনাতন মানবের দিব্য সম্ভাবনাই সৃষ্টির মর্ম সত্য—'মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী'—এই আশ্বাসের একটি সার্থক রূপ 'শিশুতীর্থ' কবিতা। কবি এই কবিতার মর্মবাণী এইভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন—

"পশু যখন আপন পশুত্বে সম্পূর্ণ বিরাজ করে তখন তাতে তার কোনো ক্ষতিই হয় না। কিন্তু মানুষের সংসারে পশুপ্রভাব সর্বনাশ আনে; হয় জড়ত্বের তামসিকতায় সে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, নয় বন্যায় গিরিগাত্রের শিলা-স্খলনের মতো দুর্নিবার আঘাতে প্রতিঘাতে পরস্পরের মধ্যে প্রলয় ঘটিয়ে তোলে। তখন ভাঙন ধরে তার সমস্ত রচনায়; দেবতার সিংহাসন দখল করে দানবে, পরস্পরের মধ্যে অকারণ ঈর্ষা কলহ আলোড়িত হয়ে ওঠে, উদ্দাম রিপুর বল্‌গা খসিয়ে ফেলাকে মানুষ মনে করে পৌরুষ।...

তখনি অমৃতের জন্যে প্রার্থনার সময়। সেই অমৃত যন্ত্রে তৈরি হয় না। দূত জন্মলাভ করেন সেই অমৃত আপন পান পাত্রে বহন ক'রে। বিশ্বাসী ভক্ত অপেক্ষা করে থাকেন নবজন্মের অরুণোদয়ের জন্যে, কেননা তিনি এই দৈববাণী শুনেছেন: সম্ভবামি যুগে যুগে। সনাতন মানব নূতন জীবনে জন্মলাভ করে বারে বারে।···মৃত্যোর্মামৃতংগময় এই মন্ত্রকে মানবের মাঝে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্র-দ্রষ্টা উচ্চারণ করলেন অবিশ্বাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, অন্ধ তাঁকে মেরেছে। কিন্তু মৃত্যুর দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। দুঃখের দ্বারা তিনি সত্যকে প্রমাণ করেছেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয় যাঁরা কোন্ দিকে তাঁরা মানুষকে পথ দেখালেন? পুরাতন পদ্ধতির দিকে নয়, নূতন ব্যবস্থার দিকে নয়—নবজন্মের দিকে।

আদিকাল থেকে মানবসংসারে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে। নানা দেশে নানা কালে। সে তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে তীর্থ সেইখানে, পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন—যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েছেন —সম্ভবামি যুগে যুগে: ক্লান্ত আসছে, পীড়িত আসছে, ক্ষুধাতুর আসছে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, 'তুমি এসেছ?' মাতা বললেন, 'তুমি আমার ধন।' সকলে বললে, 'জয় হোক নবজাতকের।'[১৬]

মাতৃঅঙ্কলীন শিশুর জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির পরি-সমাপ্তি। ইংরেজীতে 'দি চাইল্ড' কবিতায় এর পরেও আর দুই ছত্র আছে—

The old man from the East murmurs to himself
'I have seen'.

নবীন আগন্তুক মহামানবের আবির্ভাব পূর্বদেশীয় জ্ঞানী বৃদ্ধটি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের জ্ঞানী বৃদ্ধ মহাকবি ও সিদ্ধসাধকের দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন নবজাতকের এই নিত্য আবির্ভাব শিশুরূপে মানুষের পবিত্র পর্ণ-কুটীরে। মানবসংসারে মহামানবের চিরন্তন আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ মানবের যে আশার শাশ্বতবাণী রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' কবিতায় রেখে গেছেন তাই ঐ কবিতার মর্মবাণী।

গদ্যছন্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা যেখানে আশাবাদী কবির মহত্তম বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে, তা এক সময় যথাযথভাবে সমাদৃত হয়নি বলে কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন গ্রন্থে এই কবিতাটি সন্নিবেশিত

হলে কবি সন্তোষ প্রকাশ করে সম্পাদকদ্বয়কে লেখেন—"দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ বলে একটা গদ্যছন্দের রচনা বানিয়ে ছিলাম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাইনি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছো এতে খুশি হয়েছি।"[১৭]

যীশুখ্রীষ্টের জীবন অবলম্বনে রচিত কবির একটি মৌলিক কবিতা 'মানবপুত্র' ১৯৩২ সালের শ্রাবণ মাসে রচিত হয়। 'তীর্থযাত্রী' অনুবাদ কবিতা হলেও বাইবেলের সেই বিখ্যাত ঘটনা যীশুর জন্মস্থলে নক্ষত্র চালিত পূর্বদেশীয় জ্ঞানীদের আবির্ভাব আশ্রয়ে রচিত টি. এস. এলিয়টের Journey of the Magi-র এই অনুবাদ কবির নিজের ভাষাতে বলা যায় 'যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা শিল্পকার্য নহে, সৃষ্টি কার্য।'[১৮]

যীশুর জন্ম ও মৃত্যু অবলম্বনে খ্রীষ্টীয় জগতে যে বিপুল সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের যীশুবিষয়ক ঐ কবিতাত্রয়ী সগৌরবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কবি রচিত কবিতার ব্যাখ্যারূপে বিশেষ করে 'মানবপুত্র' কবিতাটির আলোচনারূপে উল্লিখিত হতে পারে যীশুর জন্মদিনে প্রদত্ত কবির ভাষণগুলি। 'মানবপুত্র' যে বছর রচিত হয় সেই বৎসরেই বড়োদিনে কবি ঐ মানবপুত্র যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন—

'আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর জয়ধ্বনি উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে, আর সেই গির্জার বাহিরে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যু বর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। ...লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ? ·· আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।"[১৯]

'মানবপুত্র' কবিতায় কবি খ্রীষ্টের এই আত্মোৎসর্গের কথা বলেছেন এবং দেখিয়েছেন তাঁর ধর্মমতাবলম্বীরা কিভাবে তাঁর আত্মোৎসর্গকে ব্যর্থ করেছে। 'খৃষ্ট' গ্রন্থে "বড়োদিন" নামক কবিতায় কবি ঐ একই কথা বলেছেন।

কবি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন নীতুর উদ্দেশে। নীতু অর্থাৎ নীতীন্দ্রনাথ ছিল কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র, জার্মানীতে ছাপার কাজ শিখতে গিয়ে ১৯৩২ সালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 'পুনশ্চ'র মৃত্যুবিষয়ক 'বিশ্বশোক' কবিতাটিতে নীতুর মৃত্যুশোকের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত শোকের বিমূঢ় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কবির যে আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে বুঝা যায় দুঃখ, আঘাত, মৃত্যুশোক কি অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে কবি সহ্য করতেন। মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে আঘাত দিলেও খুব বেশী বিচলিত করতে কোনো দিনই পারেনি সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। পরিণত বার্ধক্যে মৃত্যুকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় পাই এই কবিতায়। কবিতাটির ভাষ্যরূপে লেখা না হলেও এই কবিতা রচনার পরদিনই কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে কবি যে পত্র লিখেছিলেন এই কবিতার মর্মগ্রহণে তার সহায়তা নেওয়া চলে। কবি লিখেছিলেন—

'এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কাজের টানে সরে যেতে হয়েচে. এমন কত বার বার হোলো, বার বার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্বসংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে। আর সেই জগৎজোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোক দুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক. প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্। নীতুকে খুব ভাল বাসতুম তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চলচে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চলব।...নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই. কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার

কল্যাণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন।”[২০]

বাস্তবিকই দুঃখ শোকের উপরে ওঠার অপরিসীম শক্তি ছিল কবির, সেই দুঃখোত্তীর্ণ মনোভাবই এই কবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যদিও কবির আহত কণ্ঠস্বরের করুণ স্পর্শও আছে এই কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর্টিস্ট-সত্তা যে দুঃখ-শোককাতর ব্যক্তিসত্তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কাব্যসৃষ্টি অব্যাহত রাখতে পারতো তার পরিচয় পাই ‘বিশ্বশোক’ কবিতা রচনাকালে ‘দুইবোন’ উপন্যাস রচনার মধ্যে। ‘বিশ্বশোকে’র মানসিকতা থেকে ‘দুইবোনে’র মানসিকতায় কতই না পার্থক্য অথচ এই দুইই এক কালে রচিত। এছাড়া কবির স্বাভাবিক কাজকর্ম, পত্র প্রবন্ধাদি রচনা, ভাষণাদি প্রস্তুত করার কাজ তো ছিলই।

‘পুনশ্চ’র “শাপমোচন” কবিতাটি কবির ঐ একই নামে প্রকাশিত একটি নৃত্য নাট্য-এর কথারূপ। এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে ‘রাজা’ নাটকের বিষয়বস্তুর। কবি নিজেই বলেছেন—“যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে ‘রাজা’ নাটক রচিত তারই আভাসে ‘শাপমোচন’ রচিত হয়েছে।’ বাউলের একটি গানে আছে ‘ভিতরে রস না জমিলে, বাইরে কি গো রূপ ধরে।’—‘রাজা’ ও ‘শাপমোচনে’র মর্মকথা আছে এই পঙ্‌ক্তি দুটিতে। রানীর অন্তরে যথার্থ রসের সঞ্চার হলেই রাজার স্বরূপটি তার হৃদয়গত হয়। রাজা নাটকে যে অরূপ তত্ত্ব ঈশ্বরানুভূতির মধ্য দিয়ে চালিত হয়েছে এখানে সেই তত্ত্বটি অনুসৃত হয়েছে মানবীয় প্রেমতত্ত্বের পথে।

‘পুনশ্চ’ কাব্যের কতকগুলি কবিতার গদ্যরূপ পাওয়া যায় কবির কোনও কোনও লেখায়—সেইরূপ যুগ্ম রচনার দৃষ্টান্ত আমরা গদ্য কবিতার আঙ্গিক আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছি। পুনশ্চ ঐ ধরনের উদ্ধৃতি চয়ন থেকে বিরত হওয়া গেল। কবির ঐ জাতীয় গদ্যরচনাকে কবিতার ঠিক ঠিক সমালোচনা বলা চলে না, গদ্যলেখাকে কবিতার প্রাক্‌রূপ অথবা কবিতার আলোচনা মাত্র বলা চলতে পারে। কবিতার মর্ম গ্রহণে তারা অবশ্যই কিছু সাহায্য করে তবে গদ্যের সহজ ভাষাকে কবি কল্পনার সাহায্যে নতুন করে সৃষ্টি করে এই কাব্যের যে সব কবিতা রচনা করেছেন তা অনেকখানি সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে বলা চলে। কবি নিজেও হয়তো তা বুঝেছিলেন তাই ‘পুনশ্চে’ যে অভিনব কাব্যাঙ্গিক প্রবর্তন করেছেন সেই গদ্যরীতি—ভাষা ও ছন্দ নিয়েই কবি অধিক আলোচনা করেছেন কবিতার কথা কমই বলেছেন। আমরা যে কয়েকটি কবিতার বিষয়ে কবির আলোচনা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা উপরে

উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেই সব আলোচনা সম্পর্কে আমাদের মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করেছি।

বিচিত্রিতা (১৯৩৩)

'বিচিত্রিতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। এর একত্রিশটি কবিতা বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা বিচিত্র ধরনের ছবিকে উপলক্ষ করে রচিত এবং অনেকগুলি কবিতাই 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে সকৌতুক মন্তব্য করে কবি লিখেছিলেন—

"এর পরে ('পুনশ্চ' কাব্যের পরে) মদ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোক এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।"[২১]

'বিচিত্রিতা' ছন্দোবদ্ধ কবিতা সমষ্টি। সুতরাং কবির অভিমত 'পুনশ্চে'র গদ্য কবিতায় যদি তাঁর কোনও অপ্রকৃতিস্থতা প্রকাশ পেয়ে থাকে (?) তবে ছন্দে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছেন—এই কথাটি জেনে ছন্দ কবিতার অন্ধভক্তেরা আশ্বস্ত হবেন।

'বিচিত্রিতা' কবির ৭২ বছর বয়সের রচনা। বয়সের অঙ্কের কথাটা মনে করেই কবি হয়তো কৌতুকচ্ছলে অপ্রকৃতিস্থতার কথা বলেছেন ; না হলে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবির অপ্রকৃতিস্থ মনের যে কোনও পরিচয় নেই তা আমাদের আগের আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়েছে। 'বিচিত্রিতা'কে কবির প্রতিভা-দীপ্ত রচনা বলে দাবি করা না গেলেও এই কাব্যখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থে নিজের ও অপরের আঁকা ছবির ভাব নিয়ে যে কবিতাগুলি লিখেছেন তার মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে ছবিগুলি পাশে রেখে কবিতাগুলি পড়া দরকার আর সেই কারণেই কবি গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চিত্রিত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। গ্রন্থখানি শিল্পী নন্দলাল বসুর পঞ্চাশতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণে' কবি শিল্পীর গুণাবলীর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতেই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের কিছু আভাস মিলবে। কবি লিখেছেন—

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।

বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে।

কবিরও বিশ্বভুবনের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে আলাপ চলে কিন্তু শিল্পী নন্দলাল যে পথে সেই আলাপের পরিচয়কে ধরে রেখেছেন কবি এতদিন সেই পথের পুরোপুরি পথিক হননি। সত্তর বছর পার হয়ে প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের মনে চিত্ররচনার সাধ জেগেছে তাই কবি বলেছেন—

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

কবির নিজের আঁকা কয়েকখানি ছবি ও গগণেন্দ্র-অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীর আঁকা ছবিগুলি এই কাব্যগ্রন্থটিকে উজ্জ্বলতা দান করেছে।

শেষ সপ্তক (১৯৩৫)

'শেষ সপ্তক' কবির চুয়াত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে ১৩৪২ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়। 'পুনশ্চে'র মতো 'শেষ সপ্তকে'র কবিতাগুলিও গদ্যছন্দে লেখা। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"আমি কাব্যের পসারি, আমি শুধোই—লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইশারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাস টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও তুলকির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি ?"[২২]

'শেষ সপ্তক' গদ্যছন্দে রচিত রবীন্দ্রকাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "পুনশ্চে" 'শিশুতীর্থ', 'শাপমোচন', 'মানবপুত্র' প্রভৃতি কবিতায় যেমন কবির চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে 'শেষ সপ্তকে'র বহু রচনায় চিন্তাগর্ভ কথার মুখে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কবি তাঁর শেষ জীবনে ক্রমশঃ যে দার্শনিক হয়ে উঠেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থ কবির প্রৌঢ়ঋতুর ফসল—মননজাত অভিজ্ঞতা এদের মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

বস্তুতঃ জীবনের শেষ অধ্যায়ে কবি একটি কাজকে তাঁর অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করেছেন—কবি নিজেই বলেছেন,

"এই পরিশিষ্ট ভাগে সমস্ত জীবনের তাৎপর্যকে যদি সংহত করে সুস্পষ্ট করে না তুলতে পারি তাহলে অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিদায় নিতে হবে।

আমি বিধাতার কাছ থেকে অনেক বেশি দান পেয়েছি, সেই দানগুলিকে একের সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলিয়ে নিতে না পারাতে সেই বিক্ষিপ্ত দানগুলিই আঘাত করতে থাকে।"[২৩]

অস্তিত্বের নানা বিভাগেই কবিকে জবাবদিহি করতে হয়েছে আবার সেই সঙ্গে জীবনের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে জীবনের তাৎপর্য পরিস্ফুট করতেও চেষ্টা করেছেন—কবি আত্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়েছেন, সমালোচকেরা এই কারণেই 'শেষ সপ্তক'কে বলেছেন কবির 'আত্মজৈবনিক' অর্থাৎ "এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে।" 'শেষ সপ্তকে'র অনেকগুলি কবিতা বিশেষ করে শেষ দিকের কবিতাগুলিতে কবির আত্মজীবনের নিবিড় ও নিগূঢ় পরিচয় আছে। জীবনের শেষ পর্বে কবি তাঁর কবিজীবনের বিচিত্র সুরকে একটি সমন্বিত রূপের মাধ্যমে ধরে দিতে চেয়েছেন—কবি হয়তো ভেবেছেন এই তাঁর শেষ সপ্তক।

এই কাব্যগ্রন্থে মোট ছেচল্লিশটি কবিতা আছে, তার মধ্যে বারোটি কবিতা কবির পুরানো কবিতার পুনর্লিখিত রূপ, সাতটি কবিতা তাঁর পত্রের গদ্যছন্দে রূপান্তর। কবিতাগুলির পূর্ব পূর্ব রূপের সঙ্গে পরবর্তী রূপসমূহ পাশাপাশি তুলনা করলে কবিতাগুলি বুঝবার কিছুটা সুবিধা হতে পারে। রবীন্দ্র-জীবনীকার আমাদের সুবিধার্থে 'রবীন্দ্র-জীবনীর' ৪র্থ খণ্ডে (১৩৬৩ সংস্করণ) 'শেষ সপ্তকে'র আলোচনায় পাদটীকায় একটি বিস্তারিত তালিকা উদ্ধার করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই রকম তুলনামূলক আলোচনায় কবিতা সম্পর্কে কবির মনোভাবটি ঠিক ধরা যায় না, তাই 'শেষ সপ্তক' সম্পর্কে কবির মন্তব্য অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। আর সে চেষ্টা করলে আমরা দেখবো এই সব গদ্য কবিতার গদ্যরীতির সম্পর্কেই কবি নানাপ্রসঙ্গে নানা কথা বলেছেন কবিতার সম্পর্কে কদাচিৎ কিছু আলোচনা করেছেন। গদ্য কবিতার গদ্যকে কবি যে সাধারণ গদ্য বলে বিবেচনা করতেন না তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'শেষ সপ্তকে'র সমকালীন 'আমার কাব্যের গতি' বিষয়ক এক ভাষণে। কবি বলেছেন—

"অধুনা 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে

বলে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্য কাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হতে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি, আমি জানি তা অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতুম না।···অনেকে মনে করেন কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।”[২৪]

উপরের উদ্ধৃতিতে কবি বলেছেন—গদ্য কবিতার ভঙ্গিতে তিনি যা লিখেছেন তা তিনি অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতেন না—কিন্তু পুরানো কবিতা ও পত্র ভেঙে গদ্য কবিতায় নতুন রূপ দেওয়ার যে পরীক্ষা তিনি এই কাব্যে করেছেন তা থেকেই কবির ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করা চলে। ছন্দের বাঁধা পথে কিংবা গদ্যের আবাঁধা পথে কাব্যের কলম রবীন্দ্রনাথের হাতে যে কত সচ্ছন্দে চলেছে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি; এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বলেই, অন্যের পক্ষে তা কখনও সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে।

কাব্যখানিকে রবীন্দ্রনাথ কেন 'আত্মজৈবনিক' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তার পরিচয় পাই সমকালীন একখানি পত্র থেকে। কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন—

“জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে—এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রা পথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই—নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ—এই প্রান্তটি সঙ্কীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।”[২৫]

১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিল 'উত্তরায়ণ' গৃহে বসে লেখা এই চিঠিতে কবি তাঁর জীবনের উত্তরতর অয়ন—অন্তরের নতুন পালায় যে আভাস দিয়েছিলেন সেই পালা খুব সম্ভব আত্মপরিচয়ের পালা। শেষ পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাই

যুগপৎ কবি এবং আত্মরহস্যসন্ধানী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই আত্মপরিচয়ের রসভাষ্য কবির শেষ জীবনের কবিতাতেই প্রাপ্তব্য—কবির নিজের ব্যাখ্যায় তা খুব কমই ধরা পড়েছে।

'শেষ সপ্তকে'র উনচল্লিশ ও চল্লিশ সংখ্যক কবিতায় যথাক্রমে মৃত্যু ও অমৃত সম্পর্কে কবির চিন্তার কথা আছে। মৃত্যু সম্পর্কে কবির ধারণার স্পষ্ট ও গভীর পরিচয় পরবর্তী 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি' প্রভৃতি কাব্যে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে মৃত্যু সম্পর্কে কবির আত্মিক উপলব্ধির পরিচয় পাই উনচল্লিশ সংখ্যক কবিতায়। জীবনের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। ছিন্ন পত্রাবলীর এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"...মৃত্যু যদি না থাকত তাহলে বস্তুজগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত, জগতের মধ্যে অনন্তের suggestion থাকত না। বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality—তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে।"[২৬]

মৃত্যুই মানুষকে দেয় অমৃতের অধিকার; সেই অমৃত 'প্রথমজাত অমৃত'। চল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি সেই প্রথমজাত অমৃতের কথা অথর্ব বেদের একটি উক্তি আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন। উক্তিটি উক্ত কবিতার শিরোভাগে কবি উদ্ধৃতও করেছেন:

'পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম উপতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।'

মানবের নিত্য সত্তাই সেই প্রথমজাত অমৃত—মৃত্যু অনিত্য সত্তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিত্যসত্তার দিকেই জীবনের গতিকে চালনা করছে। কবি স্বয়ং সেই নিত্যসত্তা—প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে উপনীত হয়েছেন এমনই একটা উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতার শেষে—

আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

বীথিকা (১৯৩৫)

'পুনশ্চে'র গদ্য কবিতার পরে যেমন সমিল ছন্দে লেখা 'বিচিত্রিতা', 'শেষ-সপ্তকে'র পরে তেমনি 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থখানি। সত্তরোত্তর কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুবৃহৎ এই কাব্য কবির কাছে কতদূর সমাদর লাভ করেছিল তার কোনও পরিচয় কবির নিজের লেখায় পাওয়া যায় না, অন্ততঃ এমন কোনও তথ্য আমাদের হাতে আসে নি, অথচ এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের প্রায় সব কটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়—কবির সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসা, ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতি রোমন্থন, বিশ্বসত্তার সুনিবিড় স্পর্শানুভূতি, মনন কল্পনায় স্বকীয়তা, সব শেষে কবির মৃত্যুদর্শন যা তাঁর 'প্রান্তিকো'ত্তর কাব্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ তাও এই কাব্যে উপস্থিত। এই সব লক্ষণ কাব্যে কিভাবে ফুটেছে তার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। কবির নিজের আলোচনা বলতে 'বীথিকা'র 'নিঃস্ব" কবিতা সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা যায়।

শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা'র হাতে লেখা পত্রিকার জন্য ঐ পত্রিকা সম্পাদক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কবির কাছে একটি কবিতা চাইলে কবি প্রথমে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন, তার কবিত্ব শক্তি 'নিঃস্ব' হয়ে গেছে এই রকম একটা মনোভাব প্রকাশ করেন। পরে সম্পাদকের ফরমাশ মত ঐ কবিতাটি লিখে দেন। ফরমাশি লেখা হলেও অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনায় লেখাটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে কবির আত্মকথা সহজভাবে বলা আছে। কবিতাটির ভাবধারা উক্ত হস্তলিখিত পত্রিকায় এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

"আনন্দোৎসবের উদ্বোধন সঙ্গীত রচনায় আবার ডাক পড়েছে কবির। কিন্তু হায়! কবি আজ নিঃস্ব। বিমুখ বাণীর প্রসাদলাভের ব্যাকুল প্রত্যাশা রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে বারে বারে গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ, স্নেহচ্ছায়াহীন শুষ্ক অশোক তরুতলের মত কবি আজ রিক্ত হৃতগৌরব। আনন্দের কোলাহল নিয়ে উৎসবের দল এসেছে, কিন্তু কোথায় রচিত হবে উৎসবের মণ্ডপ? শূন্য শাখায় শাখায় হাহাকার নিয়ে ঊর্দ্ধ মুখে দাঁড়িয়ে আছে কুণ্ঠিত অশোকতরু, কোথায় সেই সুরসভার অপ্সরার বহুবাঞ্ছিত চরণাঘাত, যার স্পর্শে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে উঠবে ফুল, আতিথ্যের আয়োজনে নবোদ্গত পাতার ছায়ায় ছড়িয়ে দেবে শ্যাম শোভা? কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোকতরুতল
অতিথি লাগি রাখেনি আয়োজন।

হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি ;
সুরসভার অপ্সরার চরণাঘাত মাগি
রয়েছে বৃথা জাগি।

কিন্তু তার এই দৈন্য চিরদিন ছিল না। ঐশ্বর্যের দিনও দেখা দিয়েছিল অতীতে, তার স্মৃতি আজ মনে জাগছে—

আরেকদিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি ;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

সেদিন অভাব ছিল না, আতিথ্যের আয়োজনে উজাড় করে দিয়েছিল নিজের সর্বস্ব। সেই পুরানো দিনের কথা স্মরণ ক'রে আজ আবার আনন্দ লাভের আশায় নিভৃত প্রাঙ্গণে এসেছ যদি, তবে একেবারে হতাশ হয়ে ফিরে যেয়ো না—

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু রোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো।

তোমাদের সেই চিরপরিচিত অশোক তরুতলের উৎসব প্রাঙ্গণ আজ স্তব্ধ, ফুলে ফুলে যৌবনের তুফান আজ হিল্লোলিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু তোমাদের প্রীতি দেওয়ার জন্য আজও সে তেমনি ব্যাকুল। তার এই নীরব আবেদন পুরানো দিনের বিস্মৃত প্রায় আনন্দদানের স্মৃতিকে তোমাদের মনে যেন জাগিয়ে তোলে—

ব্যাকুলতার নীরব আবেদনে
যে-দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে-দান মৃদু হেসে
কিশোর করে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণ রাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।"[২৭]

'বীথিকা'র নামকরণ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কবি প্রত্যক্ষভাবে নিরসন না করলেও 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে ডায়ারি লেখার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি যে কথা বলেছেন তাতেই 'বীথিকা' শব্দের একাধিকবার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। কবি লিখেছেন—

"বিশেষ কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তা হলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জ্বেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম।"

নিতান্ত অকারণেই মনে পড়ছে 'বনবাণী'র "শাল" কবিতাটির কথা—আর পাতাঝরা বীথিকায় পদচারণরত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিখানি যা 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে—ডায়ারি লেখা কিংবা স্মৃতিরোমন্থনমূলক কবিতালেখা অনেকটা যেন মনে মনে স্মৃতির বনে পায়চারি করা।

পত্রপুট (১৯৩৬)

'পত্রপুটে'র কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত কোনও প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই কবির কাছ থেকে আমরা পাইনি, রবীন্দ্রজীবনীর ৪র্থ খণ্ডে এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংকলিত হয়েছে মাত্র। সেই সব তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায় এই কাব্য রচনাকালে কবির 'বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও দুর্বলতা ক্রমশ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। শ্রবণ ও দর্শনশক্তি ক্ষীণতর হইতেছে, কোমরে ব্যথা, নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ হয়।'[২৮] কবির সমকালীন দুখানি পত্রে তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩ই ভাদ্র ১৩৪২ সালের পত্রখানি কিংবা ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—পত্র দুখানিই চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে সুতরাং উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের বক্তব্য—শারীরিক ঐ অসুস্থতার কথা 'পত্রপুটে'র কোনও কোনও কবিতায় বিশেষ করে ২ সংখ্যক কবিতাতে প্রচ্ছন্ন আছে মনে হয়। সেখানে ছুটিতে কবির হাওয়া-বদলের যে তত্ত্ব বিবৃত আছে তা প্রথমে পত্রাকারে কালিদাস নাগকে লেখা হয়, পরে তা গদ্য কবিতার আকারে বিন্যস্ত হয়।

শুধু শারীরিক অসুস্থতাই নয়—মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কবিকে এই সময় 'দেহাতীত' ভাবনার কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই জন্যই 'ছুটি' কবিতার উপসংহারে বাস্তবজীবন থেকে ছুটি নেবার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। 'পত্রপুটে'র 'দশ' সংখ্যক কবিতাটি যেদিন রচিত হয় সেইদিনই কবি তাঁর

অধ্যাপকবন্ধু সিলভ্যাঁ লেভির প্যারিসে পরলোকগমনের সংবাদ পান। এই দুঃসংবাদে কবি খুবই বেদনাতুর হয়েছিলেন কিন্তু সেই বেদনাকে যুক্তিতর্কের বাঁধনে বেঁধে গদ্যের চালে পদ্যের বিষয়কে পাঠকের গোচরীভূত করেছেন। বলা বাহুল্য উপনিষদের বাণী কবিকে দেহ হতে দেহাতীত লোকে যাত্রার ভাবনায় অনুপ্রেরিত করেছে তাই এই কবিতায় ঋষিকবিদের সাবিত্রী মন্ত্রের ধ্যানরূপটি উল্লিখিত হয়েছে :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষণ্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

কবির জীবনে এই ঋষি বাক্যের প্রভাব আমরা ইতিপূর্বেও লক্ষ্য করেছি, আমরা দেখেছি 'পূরবী'র "সাবিত্রী" কবিতায় কিভাবে এই সাবিত্রীমন্ত্র কবি উচ্চারণ করেছেন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে লেখা 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে এই প্রার্থনা মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে কবিকণ্ঠে—সেকথা 'পূরবী'র "সাবিত্রী" কবিতা আলোচনায় আমরা আগেই বলেছি। 'পুত্রপুটে'র "দেহাতীত" কবিতায় ঐ অমৃতমন্ত্র পুনবায় উচ্চারণ করার পরেই কবি এই কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতায় ঐ আত্মোপলব্ধির আলোকে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন।'

বাস্তবিকই কবির অন্তরতম আত্মপরিচয় আছে এই একটি কবিতায় আর সেই আত্মপরিচয় এতই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত যে কবিতাটির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নিষ্প্রোজন মনে হয়, অথবা সমগ্র কবিতাটিকে কবির তথ্য যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ বলা চলে। কবির পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনের ধর্মচেতনা, সৌন্দর্যচেতনা, প্রেমচেতনা এবং জীবনদেবতাচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ আছে এই কবিতায়—গদ্যকবিতার সুস্পষ্ট ভাষায় কবির কথা এত স্পষ্টভাবে এখানে পরিস্ফুট হয়েছে যে কবিতাটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেই এর মর্ম উপলব্ধি করা যায় বাইরের কোন সাহায্যের এক্ষেত্রে প্রয়োজনই হয় না। কবি নিজেও হয়তো এই কারণেই তাঁর শেষ জীবনের বহু কাব্য-কবিতার ব্যাখ্যা আলোচনা করেন নি।

পনেরো সংখ্যক কবিতাই শুধু নয় এই কাব্যের একাধিক কবিতার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি যারা সূর্যের মতোই স্বয়ম্প্রকাশ। তেরো সংখ্যক কবিতাটিতে উপমা-অলঙ্কারের আড়ালে রূপকের আবরণে রেখে কবি যে কথা বলেছেন তাতেও কবির আত্মপরিচয় সহজেই ধরা যাবে। আপন হৃদয়ের অসংখ্য অনুভব পুঞ্জকে কবি 'পত্রপুট'রূপে কল্পনা করেছেন, 'আমি বনস্পতির

এরা কিরণ পিপাসু পল্লবস্তবক'। এই পত্র সম্ভারের সাহায্যেই বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে কবির যোগ সাধিত হয়েছে—

এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে বস্তুর অতীতকে ,
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।

কিন্তু আজ কবি উপলব্ধি করেছেন পত্রপুঞ্জ ঝরবার দিন এল, কবি জানতে চান এই পত্র দূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয় যে সঞ্চয় অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে তার আত্মরূপে, যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে, তাকে রেখে দিয়ে যাবেন কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে। 'পত্রপুট' সত্যিই সার্থকনামা কাব্যগ্রন্থ।

শ্যামলী (১৯৩৬)

১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিল উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রের উপসংহারে কবি জানিয়েছেন—

"একটি মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তারপরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়।"[২৯]

এই মাটির ঘর সম্পর্কে 'শেষসপ্তকে'র চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন—

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।

'শ্যামলী'র অধিকাংশ কবিতা এই মাটির বাসা, কবির শেষ বেলাকার ঘরখানিতে বসে লেখা। ২৫শে বৈশাখ ১৩৪২ শ্যামলী গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশ্যে লেখা এক কবিতায় কবি ঐ ঘরের স্থপতিকে স্নেহাশিস জানিয়ে এই ঘরে বাসা বাঁধার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন—

ধরণী বিদায় বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, "একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,
আমার বক্ষের স্নেহ ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে কদিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।

ধরণীর এই আমন্ত্রণখানি সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কীর্তিতে বাঁধা পড়েছে। শিল্পীকে উপলক্ষ করে কবি তাই জানালেন—

পঁচিশে বৈশাখ আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

'শ্যামলী'র কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের কোনও লেখাই আমাদের হাতে আসে নি। এই গ্রন্থের সব কবিতাই (উৎসর্গ কবিতা বাদে) গদ্য ছন্দে লেখা এবং এই কাব্যগ্রন্থই রবীন্দ্রনাথের শেষ গদ্য ছন্দে লেখা কবিতাপুস্তক, এরপর দু'একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা ছাড়া কবি আর গদ্যছন্দের চর্চা করেন নি। 'পুনশ্চ'-'শেষ সপ্তক'-'পত্রপুটে'র সমজাতীয় ভাবধারা আশ্রয়ে একই রীতিতে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাব্য-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে এই কাব্যের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য গোচর হবে। কতকগুলি কবিতা যেমন 'কনি', 'দুর্বোধ', 'পাত্রপাত্রী', 'অমৃত'—কথিকাধর্মী রচনা। 'পলাতকা'র কথিকাজাতীয় রচনার মতো পূর্ণাঙ্গ কোন আখ্যান এদের বর্ণিতব্য নয়। এমনকি পূর্ণ চরিত্রচিত্রণও কবির উদ্দেশ্য নয়, জীবনের এক একটি খণ্ডাংশের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রই কবি এই সব কবিতায় ছোট গল্পকারের কলমে চিত্রিত করেছেন। তবুও এই কবিতাগুলির সাক্ষ্যে গদ্য কবিতা সম্পর্কে কবির সেই বিখ্যাত উক্তি—'আমি অনেক গদ্য কাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না'—তার প্রতিবাদ করা চলে। অন্ততঃ কথিকাধর্মী কবিতার ক্ষেত্রে গদ্য কাব্যের আঙ্গিক যে অপরিহার্য ছিল না সেকথা বিনাদ্বিধায় বলা যায়। গদ্য ছন্দের প্রতি পক্ষপাতবশে এক সময় কবি তার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে যে সব কথা পত্রে প্রবন্ধে বলেছেন তার উপর কবির নিজেরই যে পূর্ণ আস্থা নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'শ্যামলী'র পর গদ্য ছন্দের প্রতি কবির আগ্রহ সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হওয়ায় ঘটনায়—এরপর আবার কবি মিল মিলিয়ে কবিতা লিখেছেন, তানপ্রধান ছন্দের জগতে ফিরে এসেছেন। 'শ্যামলী' পরবর্তী 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' প্রভৃতিতেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

খাপছাড়া (১৯৩৬)

'শ্যামলী'র নাম-কবিতার আগের যুগ্ম কবিতা "পাত্রপাত্রী"র প্রেমিকা বঞ্চিত চন্দ্রমল্লিকা যেমন হাওড়া স্টেশনে এসে আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে

একটিমাত্র খাপছাড়া বলে মনে করেছিল, 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থটিও তেমনি রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে পূর্বাপর সঙ্গতিহীন খাপছাড়া রচনারূপেই বিবেচিত হতে পারে। এই জাতীয় কবিতা রচনার কৈফিয়ৎস্বরূপ উৎসর্গপত্রে কবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার চারিটি মুখের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কবি-প্রজাপতির 'বাজে কথা' রচনার সপক্ষে ওকালতি করেছেন। গাম্ভীর্যের খোলস খসিয়ে বৃদ্ধ বয়সে কবি প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন তার কারণ,

চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

গল্পসাহিত্যের এই খাপছাড়া অনাসৃষ্টির স্রষ্টা কবির বন্ধুবর রাজশেখর বসুকে 'খাপছাড়া' উৎসর্গ করে কবি এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আরও সহজেই ব্যক্ত করেছেন। তবে সাধারণের জন্য কবি গ্রন্থের মুখবন্ধেই যে কবিতা কণিকাটি লিখে দিয়েছেন তা এই গ্রন্থভুক্ত কবিতা রচনায় দুরূহতার কথা সহজেই ব্যক্ত করেছে। তিনি লিখেছেন—

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

খাপছাড়ার যা-তা লেখার সম্পর্কে কবির এই কৈফিয়ৎ যতই সংক্ষিপ্ত হোক অভ্রান্ত তাতে সন্দেহ নেই। ছড়ার ছবির ভূমিকাতেও কবি এই কথাই বলেছেন—'যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।' এর সমজাতীয় গদ্যরচনা সমকালীন 'সে' গ্রন্থটি।

ছড়ার ছবি (১৯৩৭) ছড়া (১৯৪১)

ভাবানুষঙ্গের দিক থেকে 'ছড়ার ছবি' ও 'ছড়া' কতকটা এক গোত্রের রচনা বলে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ঐতিহাসিক ক্রমের একটু ব্যতিক্রম করে এই দুই কাব্যগ্রন্থের কবিকৃত আলোচনা একত্রে সেরে নিতে চাই।

'খাপছাড়া'র কবিতাগুলি কবি কর্তৃক অঙ্কিত কখানি চিত্র শোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, 'ছড়ার ছবি'তে কবি কথা দিয়েই ছবি এঁকেছেন। 'ছড়ার'ও প্রধান আকর্ষণ এই ছবি। 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা।" আর ছেলেদের মনস্তত্ত্ব কবির ভাল করেই জানা আছে। দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর আগে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সংগ্রহ করতে বসে কবি ছড়া জাতীয় রচনা নিয়ে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে যে দীর্ঘ আলোচনা[৩০] করেছিলেন তাতেই ছড়ার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যটি কবি অভ্রান্তভাবে ধরে দিয়েছেন। ঐ প্রবন্ধে কবি লিখেছেন—

"বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তার নিজের কল্পনাগুলি তাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানসজগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে।"

এইজন্যই ছড়াতে সংলগ্নতা না থাকলে ক্ষতি নেই, ছবি থাকলেই হল, আর "বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়।···ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না।···

দেশলাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়।···

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত-গোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই; কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই।"

এইজন্যই 'ছড়ার ছবি' লেখার অর্ধশতাব্দীকাল আগেই কবির মনে বাসনা জেগেছিল ছেলেদের জন্য—'বাংলায় যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম।'[৩১]

'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনায় কবি সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, "ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

'ছেলেবেলা' গ্রন্থের ভূমিকাতেও কবি বাল্যস্মৃতির সঙ্গে 'ছড়ার ছবি'র যোগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

"কিছুকাল হোলো একটা কবিতার বইয়ে এর (ছেলেবেলার) কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটা ছেলেমানুষি খেয়ালের।" ৩২

বহুকাল পরে কবি স্বয়ং যখন ছড়ায় ছবি আঁকতে বসেছেন তখনও দেখি কতকগুলি কবিতা 'স্মৃতি দিয়ে আঁকা' যেমন, 'কাঠের সিঙ্গি', 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'আতার বিচি'। আর কতকগুলি কবিতা আছে যা 'অপেক্ষাকৃত জটিল এবং তাদের অর্থ কিছু দুরূহ।' সেগুলো বড়োদের জন্য বলে মনে হতে পারে কিন্তু কবি তাদেরও ছেলেদের জন্য লেখা বলেছেন এবং তার সপক্ষে ওকালতি করেছেন—

"সবগুলো মাথায় এক নয়, রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবেধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।" ৩৩

শুধু অর্থ নয় ছড়ার মধ্য থেকে ছেলেমেয়েরা সত্য পর্যন্ত অনুসন্ধান করে না তারা চায় চিত্র ও ধ্বনি—ছবি ও গান। কবির ছড়াগুলি যদি কল্পনা-প্রবণ শিশুর মনশ্চক্ষের সমক্ষে ছবি ধরে দিতে পারে এবং তার অন্তঃকর্ণে সংগীতের সুর ধ্বনিত করে তুলতে পারে তবেই এই 'ছড়ার ছবি' কিংবা 'ছড়া' রচনা সার্থক হয়েছে বুঝতে হবে।

ছড়ার বিষয়কে ছেলেদের উপযোগী করার প্রয়োজনে কবি যে ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায় এবং 'ছড়া' গ্রন্থভুক্ত তাঁর 'নূতন কবিতা পাঠের ভূমিকা' স্বরূপ এক ভাষণ দান কালে তার পরিচয় কবি নিজেই দিয়েছেন। কবি লিখেছেন—

"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্রসমাজে সভা-যোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্য-

সৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না।" ৩৪

যে ছন্দ দিয়ে ছড়ার ছবি আঁকা তা 'চলতি ভাষার ছন্দ'। চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে এই সহজ বাংলা ছন্দে কবিতা লিখতে হয়েছে বলে ছড়ার কবিতার ভাবকেও সাধু-ভাষী সাহিত্য মহলের বাইরে বসতি নিতে হয়েছে।

কবি 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায় লিখেছেন—

"ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা।...সাধু ভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা—শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাঁপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।" ৩৫

কবি 'ছন্দ' গ্রন্থে চলতি ভাষায় ছন্দের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন—

"চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পরে জুড়ে যায়, তাতে যুক্ত বর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্ত বর্ণের ছন্দ। · সাধু ভাষার কবিতায় বাংলাশব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয়নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষা-ঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না।" ৩৬

"ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে—চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে লোপ পেয়ে যায়।"৩৭

'ছড়ার ছবি'র ভাব, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে কবি যে সব কথা বলেছেন 'ছড়া'র কবিতা সম্পর্কে তা সমভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। 'ছড়া' যদিচ ১৩৪৮ সালে কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, কিন্তু গ্রন্থটির মুদ্রণ শুরু হয় কবির জীবদ্দশায় এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক পাঠসভায় এরূপ নতুন কবিতা পাঠের ভূমিকারূপে কবি যে কথা বলেছিলেন তার অনুলিপি (শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী অনুলিখিত) ১৩৪৭ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়। ঐ ভাষণে কবি বলেন—

"এতদিন আমার কাব্যের যে পরিচিত পথে তোমরা চলে এসেছ এদের পথ

তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমে শুনে এইটেই মনে লাগবে যে এ জিনিস অদ্ভুত। কবি কেন যে হঠাৎ লিখতে বসল ভেবেই পাবে না। পরের সুপারিশ নিয়ে এ-সব জিনিস মেনে যাওয়ার বিপদ হচ্ছে এই যে, কী যে মানছ তা নিজেই সুস্পষ্ট বুঝতে পারবে না। ··

আজ আমি যদি ছড়াগুলি তোমাদের পড়ে শোনাই, আমার কণ্ঠস্বরের মোহে এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যে হয়তো সেগুলি তোমাদের মনে কিছু রস সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু সে রসসঞ্চার হবে সম্পূর্ণ সাময়িক—তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

এ সম্পর্কে তোমাদের দিক থেকেই প্রস্তুত হতে হবে রসাস্বাদনের জন্যে, এবং সত্যিকারের কাব্যরস উপভোগের সহায়তা তাতেই করবে।..

···কবিতাকে তার স্বকীয় বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে দেখা, পাঠকের এটি একটি বিশেষ শক্তি। এই শক্তি সুলভ নয় কাব্য পাঠকদের মধ্যে, তাই খাঁটি রসগ্রাহীর সংখ্যাও জগতে অধিক নয়। স্বকীয় পরিবেষ্টনের মধ্যে কাব্যের সত্যতা। এই সত্যতা উপলব্ধিতেই আনন্দ। এর দ্বারাই কবিতার রসগ্রহণের স্বীকৃতি। ছবির উদাহরণ দিয়েই বলা যাক্। নন্দলাল এঁকেছিলেন একটি গাধার ছবি। সে-ছবি আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল। এ-কথা নিঃসংকোচেই স্বীকার করতে হয়, জীব গাধাটির ধ্বনির মোহ নেই, আকৃতিগত সৌন্দর্যেও কোনো গৌরব নেই। কিন্তু নন্দলালের গাধার ছবি দেখে বিনা দ্বিধায় বলতে হয়, হ্যাঁ, কিছু একটা হয়েছে। এইভাবেই কবির সৃষ্টি রসপিপাসুদের মনের স্বীকৃতি আদায় করে নেয় সুনিশ্চিত দাবিতে।

একদিন চলেছিলেম বাঁধা পথ বেয়ে। আচমকা চোখে পড়ল অজানা একটা ফুল। ওকে সেই মুহূর্তেই অভিনন্দন জানালেম কল্পনার রাজ্যে, নাম দিলেম রক্তমুখী; স্বীকার করে নিলেম সৃষ্টি কৌশলের একটি নূতন রূপ বলে। মনের সেই সহজ স্বীকৃতি আদায়ের মূলে ঠিক ছিল না ফুলটির সৌন্দর্যের মোহে ভোলাবার জাদু। ওর সঙ্গে পরিচয়ে হঠাৎ পেয়েছি বাস্তবের নূতন ও যথার্থ আবিষ্কারে। সৃষ্টির নিশ্চিত স্বাক্ষর আছে বলেই তাকে স্বীকার করে নিয়েছি সহজে। নব নব রসবিকাশে কবিদের সৃষ্টি এইভাবেই নব নব রূপে আত্মনিবেদন করে। সেই নূতন সৃষ্টিকে স্বীকার করে নিতে হয় অভ্যাসের দ্বারা নয়, সর্বসাধারণের সমর্থনের দ্বারা নয়, অলংকারশাস্ত্রের প্রচলিত বিধানের দ্বারা নয়, আপনার মধ্যে সৃষ্টিবোধের সত্যতায়।···

তাই তোমাদের বলি, আমার কাব্যের একটি বিশেষ পথ ধরে চলতেই তোমরা অভ্যস্ত। তোমরাই আবার একদিন নূতন পথে চলতেও অভ্যস্ত হবে

তোমাদেরই নূতন আবিষ্কারে, আমি সে-পথ দেখাতে পারিনে—তোমরা নিজেরাই সেই পথ আবিষ্কার করো।"

বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্দেশে কথিত এই ভাষণটি প্রদত্ত হয় ১৩৪৬ সালের শেষভাগে তখনও 'ছড়া' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়নি কিন্তু 'এই আলোচনাটি যে অপ্রকাশিত "ছড়া"র উপরেই হয়' রবীন্দ্রজীবনীকার সে কথা সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন।[৩৮] ভূমিকাটি এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীভুক্ত হয়নি বলেই ১৩৪৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীর পাতা থেকে প্রায় সমগ্রভাবেই তা উদ্ধার করা হয়েছে। কবির বক্তব্য অতঃপর একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের সূচনা থেকেই ক্রমাগত এক পথ থেকে অন্য পথে চলে নতুন নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেছেন। ছড়ার ছন্দে কবি যে নতুন কবিতা লিখেছেন তাকে পাঠক অদ্ভুত মনে করতে পারে কিন্তু কবি এই কবিতার সপক্ষে ওকালতি করতে প্রস্তুত নন। কবিতাগুলিকে অদ্ভুত মনে করলেও তাঁর ক্ষতি নেই বরং সেইরূপ মনে করলেই কবি তাঁর রচনা সার্থক হয়েছে বলে বিবেচনা করবেন। 'ছড়া'র সপ্তম কবিতাটি একটি কৌতুকচিত্র সহ 'অবচেতনার অবদান' নামে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধস্বরূপ এই কটি কথা কবিতার শিরোভাগে কবি লিখে দিয়েছিলেন—

"অবচেতন মনের কাব্য রচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে রচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।"

বলাবাহুল্য শেষ জীবনে কবি যে অজস্র ছবি এঁকেছেন তাদের অনেকগুলিই তাঁর বাতিল রচনার কাটাকুটিকে 'চিত্তির বিচিত্তির' করতে গিয়ে উদ্ভূত এবং কতকগুলি অবচেতন-গুহাশায়িত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। ছবি আঁকার সচেতন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি অঙ্কিত হয়নি, তারা যেন কবির মনে আপনা-আপনি জন্মেছে। কবির শিল্পীমনের মধ্যে যে এক মহাশিশু—চিরনবীন শিশুর বাস ছিল সে-ই অন্যমনস্কভাবে বিচিত্র রূপসৃষ্টি করেছে আর প্রবীণ কবিকে দিয়ে ছড়ার ছন্দে নতুন কবিতা—ঐ শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়ে নিয়েছে। আমাদের মনে হয় চিত্রশিল্পী প্রবীণ কবির সঙ্গে ছড়ার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় কোনও যোগ আছে এবং পুপুদিদির 'সে'-ও এই বই দুখানির সমগোত্রীয়।

কবি আমাদের আলোচ্য ভাষণে আরও বলেছেন—ছড়াগুলি পাঠকের কণ্ঠস্বরের মোহে এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যে কিছু রসসৃষ্টি করতে পারে, যদিও সে রসসঞ্চার সম্পূর্ণ সাময়িক, তার কোন স্থায়িত্ব নেই।

কবির সুললিত কণ্ঠস্বরের মাধুর্য এবং পাঠভঙ্গীর অপূর্বতা এবং সেই সঙ্গে শ্রোতাদের রবীন্দ্র-ভক্তির কথা স্মরণ রাখলে তাঁর এই কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই কিন্তু 'ছড়া'র কবিতার একটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথাই এখানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে আর এক শ্রেণীর শিশু-সাহিত্য 'রূপকথা' পাঠের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই যে কথা বলেছেন প্রাসঙ্গিক বলে এখানে তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। তিনি লিখেছেন—

"ইহার (রূপকথার) সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণ মুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ, আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত সরস, তরল কণ্ঠস্বর; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐকতান সৃষ্টি করে"[৩৯] তা রূপকথা জাতীয় রচনার রসোপলব্ধির পক্ষে অপরিহার্য। আর রূপকথা সৃষ্টির এই রহস্যময় আবেষ্টনের প্রভাব সাময়িক হতে বাধ্য। রূপকথা সম্পর্কে যা সত্য ছড়ার সম্পর্কে তার সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। রবীন্দ্রকণ্ঠে ছড়াপাঠের মাধুর্য ও তার পাঠভঙ্গীর অপূর্বতা ছড়ার রসোপলব্ধিতে অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। সে রসসঞ্চার সাময়িক হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। তা ছাড়া ছড়া জাতীয় রচনাকে সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে বিচার করে তার রসের স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে একথা 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনায় কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। শিশুচিত্তের উপর ছড়ার ক্ষণস্থায়ী অথচ অনুপম প্রভাবই এদের রসবিচারের প্রকৃত মানদণ্ড আর সেই প্রভাব সৃষ্টির জন্য পাঠকের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য ও বাচনভঙ্গীর অপূর্বতা যে কি পরিমাণ সাহায্যকারী তা ছড়ার রসে মুগ্ধ কবি নিজেই উপলব্ধি করেছেন। তাই আমাদের মনে হয় রূপকথার মতোই ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাইরে, শিশু মনোরঞ্জনই এর উদ্দেশ্য। শিশু মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র আলোচনায় লিখেছেন—

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছু নাই। দেশ,

কাল, শিক্ষা, প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন, সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজিও ঠিক তেমনি আছে। এর নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনই ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য ; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।"

ছড়া সম্পর্কে কবির এই উক্তি ভাবুকের ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নয়, এ রসজ্ঞের বিচার। ছড়া সম্পর্কে এই আলোচনায় কবির যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—'ছড়া' রচনাকালে কবির নিজের সে দৃষ্টিভঙ্গীটি অনুপস্থিত ছিল এমন মনে হয় না। তাই কবি যখন বলেন—ছড়াগুলি 'শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই'—তখন ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে কবির উক্তির সত্যতা—স্বীকার করা গেলেও কবির নিজের রচনা সম্পর্কে কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং মনে হয় পাশ্চাত্ত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণ মানবমনের যে চেতনপ্রবাহ অর্থাৎ Stream of Consciousnessএর কথা বলেছেন রবীন্দ্র-মানসে ছড়া রচনাকালে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কবি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর রচিত ছড়াগুলিও 'নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র'।

কবি তাঁর রচিত ছড়াগুলির সত্যতার বিচারের জন্য তাদের স্বকীয় পরিবেষ্টনের মধ্যে রেখে এদের রসোপলব্ধি করতে বলেছেন এবং তুলনা দিতে গিয়ে শিল্পী নন্দলালের ছবির কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার অনুমান করেছেন—'নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই।'

সবশেষে কবি ঐ ভাষণে বলেছেন তাঁর নতুন কবিতা বুঝতে পাঠককেও প্রস্তুত হতে হবে—রবীন্দ্র-কাব্যের বাঁধা পথ ছেড়ে প্রয়োজনে আবাঁধা মেঠো পথে চলতে শিখতে হবে, কবি নিজে সে পথ দেখাবার চেষ্টা করবেন না কারণ ঐ পথ কেউ কাউকে দেখাতে চেষ্টা করলে সার্থক নাও হতে পারে—ঐ পথ নিজের শক্তিতে আবিষ্কার করে নিতে হয়। ছড়ার রচনাগুলি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত—আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে, তার রসোপলব্ধির পথটিও আপনা-আপনি আবিষ্কৃত হবে।

কবির এই উক্তির তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারা যায় এবং কবির অভিমত গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়।

প্রান্তিক (১৯৩৮)

'কড়ি ও কোমলে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন··· মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"[৪০]

মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা কবি মাত্রেরই কাব্যের একটি মূল ভাবগ্রন্থি। জীবনকে যিনি ভালোবাসেন মৃত্যুর চিন্তা থেকে তাঁর মুক্তি নেই—মৃত্যুচিন্তা জীবনচিন্তারই পরিণতি বলা যায়। রবীন্দ্রকাব্যেও মৃত্যুবিষয়ক উপলব্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে অর্থাৎ কবি-প্রতিভার উন্মেষক্ষণেই যখন জীবনের মমতা কবিকণ্ঠে সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে, তখন থেকেই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যায়। অতঃপর বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে তা গভীরতা লাভ করে 'প্রান্তিকে' এসে মৃত্যুবিষয়ে কবির বক্তব্য পূর্ণ রূপ লাভ করেছে। তার কারণ আছে।

১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে কবি অকস্মাৎ হতচৈতন্য হন। দুদিন সেইভাবে কাটার পর ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় কবি সপ্তাহকাল মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। 'কল্পনা'র "বর্ষশেষ" কবিতায় একদা মহাজীবনের কাছে ক্ষণিক জীবনের যে আকূতি কবিকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল—

> শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
> পঙ্ককুণ্ড হতে,
> মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
> বজ্রের আলোতে।

পূর্বদিগন্তের রবির সেই প্রার্থনাই যেন অস্তসিন্ধুকূলের কবির জীবনে পূর্ণ হল। অকস্মাৎ ব্যাধির নির্দয় আঘাতের বজ্রালোকে মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় লাভ করে কবি মৃত্যুর যে রহস্য ও মহিমা উপলব্ধি করলেন বলা যায় মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সেই পরম অভিজ্ঞতাই 'প্রান্তিক' কাব্যখানিতে অখণ্ড এক ভাবমূর্তি লাভ করেছে।

মৃত্যুদূতের অকস্মাৎ আবির্ভাবে অবসন্ন চেতনায় গোধূলিবেলায় মৃত্যু

যবনিকার তোরণ থেকে অজানার যেটুকু আভাস পেয়েছেন বলে কবি অনুভব করেছেন তাই ভাষার মধ্যে ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন 'প্রান্তিকে'র কবিতায়। মৃত্যুর নিদারুণ অভিজ্ঞতা ও তাকে কাব্যে প্রকাশ করার মধ্যে কালের ব্যবধান খুব অল্প। কবির রোগমুক্তির দশ-বারোদিন পর থেকেই 'প্রান্তিকে'র কবিতাগুলি রচনার সূচনা হয়। ফলে, "এখানে যেন অভিজ্ঞতার গভীর খনি হইতে উত্তোলিত মূর্তিটা দেখিতে পাই—এ যেন অভিজ্ঞতার কাঁচামাল, শিল্পকলা ইহার উপরে রাজকীয় মুদ্রা অঙ্কিত করিবার সুযোগ পায় নাই।"[৪১] মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অন্ধকার খনিগর্ভ থেকে সদ্য উত্তোলিত এই কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির বিস্তারিত বক্তব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও 'প্রান্তিকে'র কবিতা রচনার আট মাস পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে কবি তাঁর ঐ অভাবনীয় অনুভূতির বিশ্লেষণ করে যা বলেছেন তা এই কাব্যোপলব্ধির সহায়ক হবে বিবেচনায় নিচে উদ্ধৃত হল.

"কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতল স্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই-যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে-জীবনকে নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র করে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে একথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।

জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই, পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নবপর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।"[৪২]

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, মৃত্যু এড়াবার পথ নেই তবুও তাকে ভুলে থাকতে চায় মানুষ, কারণ মৃত্যুকে তারা শেষ মনে করে। কবি রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকে সুপরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত মৃত্যু সম্পর্কে এত চিন্তা এত কল্পনা করেছেন যে মৃত্যুভীতি তো তাঁর ছিলই না বরং মৃত্যুকে জীবনের পরিপূর্ণতা—নবতর জীবনের সিংহদ্বার বলেই তিনি উপলব্ধি করেছেন। কৈশোরে যে কবি মর্তমমতা নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' সেই কবিই কৈশোর পর্বেই কতকটা অজ্ঞানিতভাবে মৃত্যুকে শ্যাম-সমান জ্ঞান করে বলেছেন 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।'

কবির এই উক্তি রাধিকার জবানীতে বলা হলেও তরুণ কবির এই মৃত্যু চিন্তা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে আরও পরিণত, আরও গভীর হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মৃত্যুর দয়িতরূপের কথা কবি বারবার কল্পনা করেছেন দেখা যায়। জীবন ও মৃত্যুর নিবিড় সম্পর্কের কথা বুঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন,

মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হ'লো তাই।

বলেছেন— ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।

কবিতা ও গানে বারবার মৃত্যুর এই তত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন বলে কারও কারও ধারণা হয়েছিল যে কবি হয়তো মৃত্যুকে ভয় করতেন, কিন্তু কবি স্বয়ং সেই রকম ধারণার প্রতিবাদ করে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন,

"দেখ,...নাকি বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে, যে উনি মৃত্যুকে ভয় করেন বড় বেশি, সেই জন্যই সর্বত্র লেখেন ভয় করিনে, ভয় করিনে। কিন্তু একথা সত্য নয়, একেবারেই সত্য নয়।"[৪৩]

কবির এই উক্তি যে কতদূর যথার্থ তার প্রমাণ কবির জীবন ও কাব্যালোচনাতেই স্পষ্ট হয়। কাব্যে মৃত্যু সম্পর্কে যে তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন জীবনে তাকে সত্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন—মৃত্যুকে প্রেমাস্পদ-রূপে, নবজীবনের ভূমিকারূপেই স্বীকার করে তিনি মৃত্যুভয় জয় করেছিলেন। মৃত্যু যে তাঁর কাছে কখনোই বিভীষিকার আকার ধারণ করতে পারেনি তার প্রমাণ আমাদের কবির শেষ জীবনের কাব্যের আলোচনাতেই স্পষ্ট হবে আপততঃ 'প্রান্তিকে'র কবিতার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক।

'প্রান্তিকে'র প্রথম তিনটি কবিতা সম্পর্কে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এক পত্রে কিছু তথ্যের উল্লেখ দেখতে পাই। ২৯.৯.১৯৩৭ তারিখের উক্ত পত্রে কবি লিখেছেন—

"শরীরের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে কুয়াসা ছড়িয়ে পড়ে। সেই রকমের একটা দুর্বল ঝাপসা মুহূর্তে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম সেটা মুছে ফেলবার যোগ্য। মনে পড়ছে তাতে আমার চেহারার বিকার নিয়ে আক্ষেপ করেছিলুম, ওটা একটা প্রলাপ। বাস্তবিক পদ্য ছাড়া খাঁটি সত্য লেখা যায় না—গদ্যে আমরা বানিয়ে বানিয়ে বকি, রাবিশ জমা হয়। ২৫শে তারিখে একটা অপেক্ষাকৃত বড়ো কবিতা (প্রান্তিক—১) লিখেছি তার কথাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে। কপি করতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয় তাই সেটা আজ খাতায় অবগুণ্ঠিত রইল। দুটো ছোটো ছোটো কবিতা (প্রান্তিক—২.৩) পাঠাই কাব্য হিসাবে খুব দামী না হতে পারে কিন্তু চিঠি হিসাবে চলবে।"[৪৪]

এই চিঠিতে পূর্ববর্তী যে চিঠির উল্লেখ রয়েছে তাতে কবি নিজের চেহারার বিকৃতি নিয়ে যে আক্ষেপ করেছিলেন তা উদ্ধার করা চলে। তিনি লিখেছিলেন—

"এখন উদ্বেগের কোনো কারণ নেই কিন্তু মৃত্যুর ধাক্কা খেয়ে দেহের কলকব্জা নড়নড়ে হয়ে রয়েছে। এত কাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে ক্ষোভ বোধ করিনি, এখন নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ করে অবারিত কুশ্রীতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি—নরসমাজে এরকম রূপ বিকৃতি অভদ্রতা।"[৪৫]

কবির এই রূপবিকৃতির বিষয় রবীন্দ্রজীবনী বা অন্য কোথাও সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ আজ পর্যন্ত আমাদের নজরে আসে নি, আমরা কবির প্রত্যক্ষদর্শী এক ভক্তের[৪৬] কাছে শুনেছি এই সময় ইরিসিপ্লাস রোগে অসুস্থ কবির চিকিৎসার প্রয়োজনে কেশ কর্তনের ফলে কবির চেহারায় যে পরিবর্তন দেখা যায় রোগমুক্তির পর নরসুন্দরকৃত সেই রূপ বিকৃতি দেখেই কবি মনে মনে আহত হন এবং পত্রে প্রিয়জনের কাছে সে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। সৌন্দর্যরসরসিক কবিমনে নিজের চেহারার রূপান্তর নিশ্চয়ই খুব আঘাত দিয়েছিল।

পূর্বোদ্ধৃত পত্রের শেষাংশে গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে কবির ধারণার পুনশ্চ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। দেখা যাচ্ছে আজীবন ছন্দের ঐন্দ্রজালিক কবি গদ্য কবিতার প্রতি খুব আস্থাশীল ছিলেন না এবং পদ্য অর্থাৎ ছন্দই যে খাঁটি সত্যের তথা কাব্যের বাহন তাও কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'প্রান্তিকে'র কবিতার বক্তব্য যে বিশ্বাসযোগ্য সে বিষয়ে কবির সঙ্গে আমরাও একমত।

মৃত্যু সম্পর্কে কবির আধ্যাত্মিক প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনে মৃত্যুর পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, কবিকে ধৈর্য ধারণে কি পরিমাণ শক্তি দান করেছে তার পরিচয় আমরা এর আগেই পেয়েছি। এবারে মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ক্ষেত্রে কবির সেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কতদূর কার্যকরী হয়েছিল তা যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ হল। আমরা দেখলাম মৃত্যু এখনও তাঁকে ভয় দেখাতে পারেনি। ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয়ে শক্তিমান কবি আত্মার অবিনশ্বরতায় আস্থাশীল থাকতে পেরেছেন। তাই কবি মানবজীবনে মৃত্যুর সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করেছেন এইভাবে—'রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে', এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই 'প্রান্তিক' কাব্যের সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়। মৃত্যুস্নানে শুচি হয়ে কবি-আত্মা যেন দেহমুক্ত আত্মার জয়ের কথাই ঘোষণা করেছে 'প্রান্তিকে'র কবিতায়—

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

উপনিষদের বাণীতে বিশ্বাসী কবি প্রান্তিকের উপনিষদ-তুল্য কবিতাতে আত্মার মহিমার কথাই বার বার উচ্চারণ করেছেন দেখা যায়। অবশ্য কবির বাস্তব-সচেতন রুদ্ররূপের পরিচয়—তাঁর দীপ্ত বাণীও দেখা যাবে এই কাব্যের কোন কোন কবিতায়—বিশেষ করে শেষ কবিতাদুটি এই প্রসঙ্গে সহজেই আমাদের মনে পড়বে।

সেঁজুতি (১৯৩৮)

'প্রান্তিক' কাব্য প্রকাশের কয়েক মাস পরে ঐ একই ইংরেজি বছরে 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'সেঁজুতি' সম্পর্কে কালিম্পং থেকে সুধীরচন্দ্র করকে লেখা এক পত্রে কবি এর অর্থ করে বলেছেন, 'সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।'[৪৭] এই কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে বন্ধুবর ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারকে উপলক্ষ করে কবি যে কথাগুলি বলেন তাতে বুঝা যায় 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'প্রান্তিকে'র অভিজ্ঞতার বিশেষ

করে মৃত্যুর সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রে লব্ধ অনুভূতির ঘনিষ্ঠ মিল আছে। হতচেতনার অন্ধতামস গহ্বর থেকে জীবনের সূর্যালোকে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে কবি বিস্মিত হয়ে আপনার পানে এবং মর্ত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন—

অন্ধ তামস গহ্বর হতে ফিরিনু সূর্যালোকে
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে হেরিনু নূতন চোখে।

'মানসী'র "অহল্যার প্রতি" কবিতায় পাষাণী অহল্যা প্রাণচেতনায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা হওয়ার পর অহল্যার প্রতি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্য তীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

অপার রহস্য-সমুদ্রতীরে চিরপরিচিত এই পৃথিবীর সঙ্গে নব পরিচয়ে অহল্যার বিস্ময়বোধের কথা অহল্যা সেদিন বলতে পারে নি, মৃত্যুর রহস্য পার হয়ে কবি নিজেও আজ 'আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা অজানা তীরের বাসার অভিজ্ঞতার' কথা বুঝিয়ে বলতে পারছেন না কারণ কবি নিজেই বলেছেন—

সে-ভাষার আমি চরম অর্থ জানি কিবা নাহি জানি।

আসলে মানুষের অর্থ দিয়ে বদ্ধ ভাষাটুকু তার ভাবকে প্রকাশ করে সত্য কিন্তু 'মানুষ এখনো সে ভাষা ও সে শব্দসম্পদ খুঁজিয়া পায় নাই যাহার সাহায্যে সে তাহার সকল অনুভবকে মুক্তি দিতে পারে।'[৪৮]

'সেঁজুতি'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা "জন্মদিন"। কবিতাটি ১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় কালিম্পং-এ গৌরীপুর ভবন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁরা জন্মবাসর উপলক্ষে রেডিয়োতে পাঠ করেছিলেন। 'প্রান্তিকে'র মৃত্যু অভিজ্ঞতার আলোচনা প্রসঙ্গে নববর্ষের ভাষণ বলে 'রবীন্দ্রজীবনী' থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এই কবিতার বক্তব্যের কিছু মিল আছে। বিশেষ করে মৃত্যুদূত অকস্মাৎ বিশ্বস্রষ্টার সভাগৃহ হতে এসে কবির অন্তরে যে সাড়া জাগিয়ে গেছে এই কবিতায় তার কথা সহজেই অনুভব করা যায়। কবিতাটির বক্তব্য সুস্পষ্ট, কাব্য ও তত্ত্বের দিক থেকে মূল্যবান এবং আলোচনার উপযুক্ত কবিতা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন তাই সেইরূপ কাব্যালোচনা থেকে বিরত হতে হল।

'সেঁজুতি'র দ্বিতীয় কবিতা "পত্রোত্তর" কবির দার্শনিক বন্ধু ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "নারদ" নামক কবিতাপত্রের উত্তর। সুরেন্দ্রকন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই কবিতা সম্পর্কে কবি-কথিত ভাষ্য মুদ্রিত আছে। এই কবিতা রচনায় প্রেরণা সম্পর্কে কবি বলেছেন দার্শনিকের কবিত্ব দর্শনেই তিনি এই কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছেন; আমাদের মনে হয়, কবির মধ্যেও এই সময় দর্শন-স্পৃহা জাগ্রত হওয়ায় কবিতাটিতে কবিত্বের সঙ্গে দার্শনিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—

"একবার সমস্ত কবিতাটি পড়া হ'য়ে গেলে, থেমে থেমে বলে যেতে লাগলেন, 'ধরা সে কিছুতেই দেবে না, এই এতটুকু দেখা যাবে ক্ষণিকের জন্যে। যতই চাও তার বেশি নয়।

মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা
আলোক ধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা,
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

সেই পরশাতীতের স্পর্শ পায় ব'লেই—সকল কুশ্রীতাকে ম্লান ক'রে জেগে ওঠে সুন্দর—তাই লিখেছি:

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে;
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চির.দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

কিন্তু তাই ব'লে প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, চির প্রশ্নের সামনে চিরনির্বাক হয়েই আছে বিরাট নিরুত্তর। জানা যাবে না, জানা যাবে না।"[৪৯]

কবিতার সূচনাতে কবি জীবনের অসীমতা বিষয়ে এই বিস্ময়-গভীর প্রশ্নেরই অবতারণা করেছেন—

চির প্রশ্নের বেদী সম্মুখে চির নির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর।

জীবন সম্পর্কে জানার সীমা আছে, তবু তার সীমা নেই, এই কারণেই অসীম প্রশ্নই কবিতাটির গৌরব। বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন দার্শনিকের শুষ্ক প্রশ্ন নয়, এতে যদি কোনো দর্শন থাকে তবে তা জীবনেরই দর্শন। চির প্রশ্নের বেদী সম্মুখে কবির অনন্ত জিজ্ঞাসা ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর প্রত্যয় কবি-দার্শনিকের মননশীলতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। পরিণত বয়সের কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে দার্শনিকতার এই সংমিশ্রণ লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রহাসিনী (১৯৩৮)

'প্রান্তিক' ও 'সেঁজুতি'র মননঋদ্ধ রচনার পাশেই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের অন্য সুরের কবিতা পাই 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থে। রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্যই হল তার অনন্ত বৈচিত্র্য—গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে লঘু রঙ্গব্যঙ্গের বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি অনায়াসেই অবলীলাক্রমে অজস্র কবিতা লিখতে পারতেন। 'সেঁজুতি' ও 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থ দুখানির মাঝখানে এই হাস্যরসাত্মক রচনাটিকে হঠাৎ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই কাব্য-গ্রন্থের উদ্ভব সম্পর্কে গ্রন্থভূমিকায় কবি নিজেই সার্থক ইঙ্গিত রেখে গেছেন—

> আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু
> মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু
> তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
> ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
> নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।…
> দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
> ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গণা,
> প্রহর কয়েকে যায় ঘুচে।

"জীবনের ভার যখন গুরু—দেহ যখন জরাগ্রস্ত, মন যখন প্রকাশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ হয়, তখন কবিচিত্ত আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্যে-উপহাস্যে।"[৫০]

প্রলাপ-কৌতুকে, ব্যঙ্গকটাক্ষে 'প্রহাসিনী'র কবিতাগুলি খ্যাপা ধূমকেতুর পুচ্ছের ঝাঁটার মতই তীক্ষ্ণ। এগুলি গভীর গম্ভীর রচনারাজীর পাশে রসের

প্রলাপ। ছন্দকলাকুতূহল এদের অধিকাংশ কবিতার কাব্যস্ফূর্তির প্রধান প্রেরণা হয়েছে। ইংরেজিতে কবিমানসের যে বৃত্তিকে Fancy বলে সেই খেয়ালী কল্পনার লীলাবিলাসই এই কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়। তবে মহাকবির হাতের রচনা বলেই খেয়ালী কল্পনার কবিত্বও প্রায় সৃষ্টি কল্পনার সমান হয়ে উঠেছে। কবি নিজেই আলাপচারিতায় বলেছেন—

"আজকাল আমার এই ছড়াগুলোতে কিন্তু কম মিল ছড়াইনি...মিল একেবারে দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছি, আর একেবারে নিখুঁত মিল তা মানতে হবে। আর একটা মিল আছে, সেই যে কবিতাটা লাহোর থেকে লিখেছিলুম—আধুনিকা—ওটাতেও মিলের খুব ঘটা, আর ওটা ভালো কবিতা।"[৫১]

নিজের কবিতার আলোচনাই নয় এখানে মূল্যায়নের কথাও কবি বলেছেন দেখা যায়—'আধুনিকা' কবিতাটি ভালো কবিতা'—নিজের লেখার এই জাতীয় সমালোচনা খুব বেশী একটা চোখে পড়ে না। কবিতাটির উৎস নির্দেশ করে বলা হয়েছে এটি কোনও মহিলা—অপরাজিতা দেবীর—পত্র কাব্যের প্রত্যুত্তরে লিখিত হয়। কবিতাটির স্থানে স্থানে আধুনিকাদের স্তব লক্ষণীয়।

'প্রহাসিনী'র দ্বিতীয় কবিতা "নারী প্রগতি" শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে পত্রকবিতারূপে লেখা, শান্তিনিকেতনে বসে কবি এটি লেখেন ৭ই বৈশাখ ১৩৪১। 'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি মুদ্রিত এই কবিতা পত্রটি কবির হস্তাক্ষরে ছাপা হয়েছে, দেখা যাবে কবিতাটির স্তবকবিন্যাস গ্রন্থভুক্ত পাঠের অনুরূপ নয় এবং পত্রিকায় পাদটীকায় শ্রীমতী মহলানবিশ জানিয়েছেন—

"সেবার ১লা বৈশাখের উৎসবের শেষে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরবার সময় ষ্টেশনের মুখে মাঝপথে এসে মোটরের তেল ফুরিয়ে যায়। তখন সময় আর বেশী বাকি নেই, কাজেই হুড়োহুড়ি করে খানিকটা হেঁটে অন্য একটা ট্যাক্সি ধরে কোনোমতে সেদিনকার ট্রেন ধরা হয়। সেই কথা লক্ষ্য করেই এই চিঠি।"[৫২]

'অপাক-বিপাক' কবিতাটিও শ্রীমতী মহলানবিশকেই লেখা পত্রকাব্য, রচনার তারিখ ৫ই বৈশাখ ১৩৪১, উপলক্ষ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আমাশয় রোগ।

'রঙ্গ' কবিতাটি যে প্রাচীন ছড়ার অনুকরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের "ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধে তা উদ্ধৃত হয়েছে। কবির লেখা ছড়ার রচনাকাল ৩০. ৯. ১৯৩৪, স্থান বরাহনগর; শ্রীমতী মহলানবিশ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পত্রাবলী'র পাদটীকায় জানিয়েছেন—

"১৯৩৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে কবি যখন আমাদের বাড়ী ছিলেন, সেই সময় একটি বিখ্যাত মিষ্টান্ন দোকান (জলযোগ ?) থেকে তার স্বত্বাধিকারী কবির জন্য এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি রাবড়ি, এক থালা সন্দেশ, এক থালা শোন-পাঁপড়ি ইত্যাদি মিষ্টান্ন উপহার পাঠান। কবি দেখেই হেসে বললেন বুঝেছি, সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে। তা এতগুলো মিষ্টি যদি কেউ খাওয়ায়, তাহলে দেব না হয় একটা কবিতা লিখে। বলে অমনি হাসতে হাসতে মুখে মুখে এই রকম ছড়া কাটতে লাগলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে একটা কাগজ কলম নিয়ে এলাম এবং এই ছড়া তখনি কাগজে লেখা হয়ে গেল। তারপর সে কী হাসি।"[৫৩]

'কাপুরুষ' কবিতাটিও শ্রীমতী মহলানবিশকে লেখা—পত্রেই কবি এই কবিতার বক্তব্যের আভাস দিয়েছেন।

"বিধাতার ইঙ্গিত দুঃখযোগে। পুরুষের দাড়ি গোঁফ তার শাশ্বত বিধান, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অহঙ্কারে যারা লঙ্ঘন করতে চায় সেই কাপুরুষ দল প্রতিদিন সময় জরিমানা দেয়, আর মাঝে মাঝে দেয় রক্ত—সাংখ্যিক যদি গণনা করেন তবে খুব লম্বা বছরের অঙ্ক বেরিয়ে পড়বে।"[৫৪]

১১. ১১. ১৯৩৭ তারিখের এই পত্রের সঙ্গে ১৮. ১১. '৩৭ তারিখের রচনা ঐ কবিতাটি কবি সম্রাট এই স্বাক্ষরে মহলানবিশ গৃহিণীর নিকট প্রেরিত হয়। শ্রীমতী মহলানবিশ এই পত্র ও কবিতার মূল উৎস সম্পর্কে লিখেছেন—

"দিল্লীতে আমার স্বামীর ক্ষৌরকার্যের সময় গাল কেটে গিয়ে পরে তাই বিষিয়ে উঠে কিছু ভোগ ভুগতে হয়েছিলো। সেই সংবাদে কবির এই পরিহাস-জনক চিঠি।"

'প্রহাসিনী'র অনেকগুলি কবিতার উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্র-রচনাবলীর তেইশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে নানা তথ্য উল্লেখিত আছে, বাহুল্য বোধে আমরা সেই সকল তথ্য এখানে উদ্ধৃত করিনি। উপরে যে সব কবিতার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হল তা এখনও পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকাভুক্ত হয়ে আছে, গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এই সঙ্গে রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে উদ্ধৃত কবির নিজের কবিতার সম্পর্কে মূল্যবান কিছু মন্তব্য পুনরুদ্ধৃত হল।

'গৌড়ী রীতি' কবিতাটির আরম্ভের দুই স্তবক সম্পর্কে ১৯২৬ সালে য়ুরোপ প্রবাসকালে বেলগ্রেড থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের ভুল ধারণার উল্লেখ করে বলেছেন—

"যাঁর কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে

কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছেই দাবির ষোলো আনা পূরণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।"[৫৫]

'মিলের কাব্য' নিম্নোদ্ধৃত গদ্যভূমিকাসহ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"১৯. ১. ৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণ রাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত; দ্বিতীয় পালা এই কেদার রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে। সুধাকান্ত বসে আছে পাশে চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, বসে গেলুম; যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখ-দুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি, সাদা হয়ে গেছে; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে-অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নেই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহুলোকের বহুকালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ'-য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে—একের উপাদানে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি জোড় মিলনের কাব্য।

গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরে ও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদল সন্ধ্যায় হাজরে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই··· ।"[৫৬]

'মিলের কাব্য' কবিতার উদ্ভব সম্পর্কে কবি লিখিত ভূমিকার উপসংহারে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে। ছড়ার আকারে মুখে মুখে লেখা এই কবিতাটিকে কোনও ক্রমেই কবির অসুস্থ শরীরের অপ্রকৃতিস্থতার ফসল বলা চলে না যদিও 'প্রহাসিনী'র অনেক কবিতার মধ্যেই হাল্কা সুর ও

লঘু-চাপল্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। এই কবিতাটিও হাল্কা চালে লেখা কিন্তু খুব লঘু সুরের রচনা নয়। এই কবিতা যেদিন লেখা হয় সেইদিনই সকালে কবি 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের বারো সংখ্যক কবিতাটি লেখেন। ঐ কবিতার সূচনায় কবি বলেছেন—

করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।

আমাদের মনে হয় কবি 'মিলের কাব্য' কবিতায় নিজের লেখাকে উপহাস পরিহাস করে লঘু করেছেন। লেখাটির মধ্যে একটু বকুনি থাকলেও কবিতাটির বক্তব্যের গুরুত্ব কম নয়। জায়গায় জায়গায় কবির বিজ্ঞান-চেতনার যে পরিচয় আছে তা রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ের কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কবিতাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে—

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাকার।
প্রোটন এবং ইলেকট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাগদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জ্ঞানে
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।
সৃষ্টি কার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্তকাল ধুয়ো ধবায় মিলের ছন্দ বাঁধার।

আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯)

'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন—

"বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয় বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ

করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।"

এই উৎসর্গপত্র পাঠ করে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

"গ্রন্থটির উৎসর্গপত্র পড়িলেই বুঝা যাইবে, বক্তব্যের মধ্যে কোথাও একটি দ্বিধা আছে। মনের মধ্যে এই শঙ্কা আছে, এই কবিতাগুলির বিষয় ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো নূতন কালের হৃদয় মন স্পর্শ না-ও করিতে পারে।"[৫৭]

সমালোচকের এই অনুমান অহেতুক নয়। কথাগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মনের সংশয়ের ছাপ আছে। 'পুনশ্চ' পর্বের কাব্যসূচনাতেই আমরা লক্ষ্য করেছি সত্তর বছর পার হয়ে কবি কেবলই মনে করেছেন নতুন কালের সঙ্গে তাঁর কালের অনেক ব্যবধান—দিনের শেষে নতুন পালা আবার শুরু করেছেন কবি কিন্তু তাঁর নিজেরই মনে সন্দেহ রয়ে গেছে এই পালা আগের মতো জমবে কি না। পুরানো কালের কবি নতুন কালে এসে নতুনের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছেন এই রকম একটা স্বীকৃতিও কবি 'পুনশ্চে'র "নূতন কাল" কবিতায় করেছেন দেখা যায়। 'প্রান্তিকে'র ব্যঞ্জনাময় ক্ষুদ্র ভূমিকাতেও কবির একটি সকরুণ-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে পাওয়া যায়—

অস্ত সিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্ত পানে পাঠাইল অন্তিম পূরবী।

অস্তগামী সূর্য পশ্চিম দিগন্ত হতে পূর্ব দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন অর্থাৎ অস্তগামী রবীন্দ্রপ্রতিভা পূর্ববর্তী কবি জীবনের লীলাক্ষেত্রটির দিকে তাকিয়ে বর্তমানের অস্তমহিমার কথা চিন্তা করছে। সেই চিন্তাই কবিকে আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে তাঁর নবীন কবিতার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। ভরসার কথা রবীন্দ্রভক্ত আধুনিক কবিদের কারও কারও কাছে কবি আধুনিকোত্তম কবিরূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আর সেই স্বীকৃতিরই স্বীকৃতিস্বরূপ শেষ বয়সের এই রচনাটিকে আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শেষ পর্যায়ের কবিতায় কাব্যভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আধুনিক কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা কবির মনে জেগেছিল। তাঁর শেষ জীবনের রচনা দিয়ে আধুনিক কালকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। কবির আশা ও আশঙ্কার পরিচয় আছে উৎসর্গ পত্রের ঐ কটি কথায়। আর কবির আশা ও আশঙ্কা শুধু 'আকাশ প্রদীপ' কাব্য সম্পর্কেই সত্য নয়, তাঁর শেষ পর্যায়ের সকল কাব্য সম্পর্কেই সত্য বরং 'আকাশ প্রদীপ' সম্পর্কে কবির উক্তি একটু কম খাটে। এই কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের

সুচিন্তিত অভিমত উল্লেখযোগ্য "আকাশ প্রদীপের অধিকাংশ লেখাই সেই লুপ্তপ্রায় যোগের (আধুনিক কালের সঙ্গে যে যোগের কথা কবি গ্রন্থ-উৎসর্গ পত্রে বলেছেন) সাক্ষ্য দেবে। বাচনভঙ্গী বা বিষয়বস্তু উভয় দিক দিয়েই কবির স্মৃতি অবগাহনের সঙ্গে আধুনিক কাল বা মনের বিশেষ কোন যোগ নেই।"[৫৮]

রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় অপরাহ্ণের অনেক রচনাই আধুনিককালের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটিকে আধুনিক মননজাত ফসল বলে গ্রহণ করা যায় না, কবি নিজেও হয়তো সে দাবি করেন নি। 'আকাশ-প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা কবিতায় তিনি নিজেই এই কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।

কবি তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের স্মৃতির পটে 'আকাশ প্রদীপে'র কবিতাগুলির রেখা টানা যে ছবি এঁকে গেছেন, কবির স্মৃতি-অনুধ্যানের কাব্য হিসাবে তার একটা মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের মনন কল্পনায় এমন কোন সম্পদ এতে নেই যাতে করে বইখানি বিনা দ্বিধায় একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির হাতে তুলে দেওয়া যায়। স্বপ্নেতে বোঝাই কাব্যের এই মন্থর তরীটি অনাগত কালের উদ্দেশ্যে চালনা করার পূর্বে কবি সসংকোচে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে সব সময় হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।

'মেয়াদ' কথার তাৎপর্য কবির নিজের কথাতেই পরিস্ফুট করা চলে, কবি লিখেছেন,

"পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেছেন। মনু যে মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধরে খাটানো প্রায় অসাধ্য।...তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না দিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারছি আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে।"[৫৯]

'আকাশ প্রদীপ' রচনাকালে কবি সত্তর পেরিয়ে আটাত্তরের ঘরে পা দিয়েছেন সুতরাং মেয়াদ অনেকদিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাই স্মৃতির জগতেই সান্ত্বনা লাভ করতে চেয়েছেন কবি। 'আকাশ প্রদীপে'র স্বপ্নময়, স্মৃতিবহ কবিতা সম্পর্কে কবি তাই বলেছেন—

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে।
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

কবি যাকে অকারণ বলেছেন আমরা তাকেই সবচেয়ে বড়ো কারণ মনে করি। প্রৌঢ় বয়সে বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিচারণ কবি বা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। কবির শেষ বয়সের কাব্যেরও এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য-রূপেই দেখা দিয়েছে—'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'ছড়ার ছবি' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে স্মৃতিচারণ একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু 'আকাশ প্রদীপে'র মতো স্মৃতি-চারণায় সমৃদ্ধ কাব্য রবীন্দ্রনাথের বোধ করি আর একটিও নেই। স্মৃতির আকাশে স্বপ্নের প্রদীপ জ্বালিয়ে কবি যে কবিতাগুলি লিখেছেন, বৃদ্ধ বয়সে কৈশোর স্মৃতি রোমন্থনে ভাবপ্রবণতা সত্ত্বেও কবিপ্রতিভার পাবনী স্পর্শে তারা আশ্চর্য কাব্যরূপ লাভ করতে পেরেছে।

'আকাশ প্রদীপে'র অধিকাংশ কবিতাই স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা-'যাত্রাপথ', 'স্কুল পালানো', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'শ্যামা'. 'জানা-অজানা', 'যাত্রা', 'কাঁচা আম' এই সব কবিতার সঙ্গে ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত কবির আত্মকথার তুলনা করা চলে। কবির কৈশোরস্মৃতি ও কৈশোর জীবনের স্মৃতিকথা দিয়ে আঁকা কবিতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলে কবিজীবন ও কাব্যকে একসঙ্গে দেখাতে পারলে কাব্যের অর্থ বুঝতে সুবিধা হবে এই মনে করে রবীন্দ্র-রচনাবলী গ্রন্থ-পরিচয় থেকে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করছি, কৌতূহলী পাঠক মূলগ্রন্থ ও উক্ত গ্রন্থপরিচয় পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে উপকৃত হবেন। উদ্ধৃতি বাহুল্য গ্রন্থের কলেবরকে অযথা বৃদ্ধি করবে আশঙ্কায় আমরা মাত্র দু একটি দৃষ্টান্ত চয়ন করছি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর তেইশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে—

"বধূ কবিতার প্রথম ছত্রটির পূর্ববর্তী কোনো এক পাঠে পাণ্ডুলিপিতে ঠাকুরমা স্থলে মুখুজ্জে পাওয়া যায়। জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জ্যের ছড়া বলার বিবরণটুকুর এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

'সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়ার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা

পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণ বয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।"

কৈশোরের যে সুখস্মৃতি পঞ্চাশোর্ধ্ব কবির মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছিল 'আকাশ প্রদীপে'র "বধূ" কবিতায় আটাত্তর বছর বয়সেও তাই কবিকে স্মৃতিচর্বণে রসাবিষ্ট করেছে।

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম'—এই জুড়ি কবিতায় যে বধূর কথা বলা আছে 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে সেই নতুন বৌঠানের কথা কবি বিস্তারিতভাবেই বলেছেন। বধূটির কাছ থেকে প্রীতি-অভিজ্ঞানরূপে একটি সোনার আঙ্‌টি পাওয়ার কথা কবি 'কাঁচা আমে'র উপসংহারে বলেছেন—

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাইনি।

এই সোনার আংটি পাওয়া ও হারানোর কথা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবি-মুখেই পুনশ্চ বর্ণিত হয়েছে—

"একবার মাত্র জীবনে গয়না পরেছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।"৬০

'যাত্রাপথ', 'স্কুল পালানো' এই কবিতা দুটির বক্তব্যের সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র যথাক্রমে "ঘরের পড়া" অধ্যায় ও "স্কুলের পড়ার" বর্ণনা মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। 'যাত্রা' কবিতাটিতে যে স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হয়েছে সেই প্রসঙ্গে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের শুক্রবার ২২শে আগস্ট ১৮৯০ তারিখের লেখাটুকু স্মরণ করা যেতে পারে। এইভাবে রবীন্দ্র-জীবনস্মৃতির আলোকে স্মৃতির পটে আঁকা 'আকাশ প্রদীপে'র বহু কবিতারই মর্মোপলব্ধি করা যেতে পারে। আমরা উপরে যে দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতেই প্রমাণিত হয়েছে 'আকাশ প্রদীপে'র কবিতাগুলি কবির নিজেরই কৈশোর যৌবনের নানা স্মৃতিকথায় পূর্ণ এবং আমরা আগেই বলেছি অতীতের স্মৃতিরোমন্থন জীবন সায়াহ্নে মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক চিত্ত-প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-কুশলী মন, 'বিচার, মননশীলতা ও নিস্পৃহ সারল্যের জোরে এই লেখাগুলি রোমন্থক কাব্যের উচ্ছিষ্ট হবার দুর্দৈব থেকে রক্ষা পেয়েছে।'[৬১]

সমালোচক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য দিয়েই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা চলে—তিনি লিখেছেন,

"আকাশ প্রদীপেই ব্যক্তিগত জীবনের অতীত অনুধ্যান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং পরে জন্মদিনে পর্যন্ত এই ধ্যান কবিচিত্ত হইতে কখনও খুব দূরে সরিয়া যায় নাই।...রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বার্দ্ধক্যে জীবনস্মৃতি লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া শুধু কাব্যই রচনা করিলেন না, নিজের জীবনকেও নূতন করিয়া উদ্ঘাটন করিলেন।"[৬২]

নবজাতক (১৯৪০)

কবির উনআশি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ১৩৪৬ সালের বৈশাখে 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, আর আশি বছরের জন্মোৎসবে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হল 'নবজাতক' গ্রন্থখানি। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুধীরচন্দ্র করের 'কবি-কথা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লেখা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা জমা হয়েছিল। "সেই সমস্ত কবিতা দিয়ে একখানি নূতন কাব্য বের করাই স্থির হল। ভাণ্ডার শূন্য পড়লেই নূতন জোগানের তাগিদ আসত কবির মনে, দেখা দিত তার সৃষ্টির চালান, অনেক সময় সেই সঙ্গে নূতন চালও। জমানো সব বের করে দিতে গিয়ে, যত সব ভাবগম্ভীর বিশেষ ধারার কবিতার সঙ্গে চলে গেল সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে টুকরো টাকরা খুচরা কবিতাও। দুটো বইয়ের কবিতা নিয়ে দাঁড়াল একটা বই। হল সেটা স্তূপাকার এবং জবড়জঙ্। কবির নির্দেশ। পাঠানো গেল তাই প্রেসে। নববর্ষে কিছু দেবার নিয়ম রক্ষা হবে বটে, কিন্তু কবির মন ভারাক্রান্ত জিনিসগুলোর অসংগতির ভারে। ঘটনাচক্রে সেইদিনই এসে পড়েছেন অমিয়বাবু। কবির নির্ভরযোগ্য শ্রোতা ছিলেন তিনি। কবি কপিটা প্রেস থেকে আনিয়ে নিলেন—সেদিন এ পর্যন্তই।

পরদিন সকালে অফিসে আসতেই দেখা গেল আবহাওয়ার অদ্ভুত বদল। রাত্রে যেন কবির উপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেছে,—আসছে আরেক ঝড়। কথাবার্তা একরূপ বন্ধ। সব গুরুগম্ভীর থমথমে। কবিতার ফাইলটি এল ফেরত। ডাকিয়ে নিয়ে জানালেন সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা কবিতার আপাতত বিদায়। যা থাকল, দুটো কবিতার বই হবে তা দিয়ে।

বাদ পড়া কবিতার স্থান পুরাতে হবে, এ জন্য এখনই লিখতে বসতে হবে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। বললেন—'একটাতে সব ঠাসলে খুবই ক্ষতি হ'ত, সেই পরিশোধের মতো ভালোগুলি পড়ত চাপা। অমিয়র কথাই ঠিক, দুটো বই হওয়াই ভালো।' এর পরে যেমন ধ্যানে বসেন তেমনি করে বসলেন লিখতে। দুটো বইর সিদ্ধান্ত তো হল। কিন্তু সে পরিমাণে দুটোতেই কবিতার সংখ্যায় পড়ল কিছু কম্‌তি। নূতন লিখে এর মধ্যে তা আর ছাপিয়ে ওঠা যাবে কিনা সে থাকল এক বিষম উদ্বেগ। কিন্তু সেই বৈশাখেই বের করলেন 'নবজাতক', আষাঢ়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে আষাঢে নয় শ্রাবণে) বেরল বাকিগুলো দিয়ে 'সানাই'। দুই বইতেই নূতন কাবিতাগুলি ভাগ হয়ে গেল।"[৬৩]

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে 'নবজাতক' ও 'সানাই' কাব্য দুখানির জন্মকথাই শুধু নয় সেই সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির কালে কবির ভাবান্তরের বর্ণনাও পাওয়া গেল। প্রসঙ্গতঃ 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি-সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্যও মিলছে—ঐ কাব্য গ্রন্থে কিছু 'ভালো' কবিতা যে আছে কবি নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

'নবজাতক' সম্পর্কে কবির মন্তব্য অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর। তিনি এই গ্রন্থ সূচনায় লিখেছেন -

"আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নূতন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা ; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র ; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এতো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্য মনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়ালে থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার এক শ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারিনে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয় ; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে

থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশ বিদেশের সাহিত্যে ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।"

'নবজাতকে'র সূচনায় কবির যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে 'কবি কথা'-বর্ণিত এই কাব্যের জন্মকথার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে, ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী নবজাতক কাব্যগ্রন্থন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার পরিচয় কবির কথাতেও পাওয়া যায় এবং সুকবি ও সুসমালোচক শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর উপর কাব্যগ্রন্থনের ভার দিয়ে কবি উচিত কাজই করেছিলেন; তিনি এই কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্যটি—মনন প্রাধান্যের দিকটা হয়তো কবির কাছে মেলে ধরেছিলেন তাই কবি নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। "এরা বসন্তের ফুল নয়.. প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।"

'নবজাতকে'র সূচনায় কবি নিজের কাব্যসম্পর্কে আর একটা মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।' কবির এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি বিশ্বভারতী থেকে ধারাবাহিকভাবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের যে আয়োজন করা হয় রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থাবলীর জন্য নতুন করে কিছু কিছু সূচনা লিখে দেন। কবি লিখিত সেই সূচনাগুলি 'কবির ভণিতা' গ্রন্থে একত্র সংকলিত হয়েছে। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত সাতখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ছয় খণ্ডে ঐ সূচনাগুলি মুদ্রিত হয়েছিল। সূচনাগুলির রচনাকাল মোটামুটি ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন থেকে ১৯৪০ সালের ২০শে জুলাই। 'নবজাতকে'র সূচনাটি লিখিত হয় ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০। আমাদের মনে হয়—'নবজাতকের' ভূমিকাটি কবির ভণিতাগুলির সঙ্গে এক সূত্রেই গ্রথিত-সেই কারণেই কবি তাঁর সমগ্র কাব্য গ্রন্থাবলীতে বার বার ঋতু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। কাব্যের এই ঋতু পরিবর্তন তথা হাওয়া বদলের কথা পত্রাকারে কবি 'মহুয়া' কাব্যপ্রকাশকালেও বলেছিলেন, 'নবজাতকে' আরও একবার সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের কাব্যের ঋতুবদলের কথা কবি উল্লেখ করেছেন। এই ঋতু পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে কবি বিস্তারিত আলোচনা করেন নি কারণ সে আলোচনা তাঁর নিজের পক্ষে তিনি সংগত বিবেচনা করতেন না।

কিন্তু এই ঋতুপরিবর্তনের মূলে যে হাওয়া বদলের কথা কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে ক্ষণে ক্ষণেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু তার পরিণত রূপটি 'নবজাতকে' ও তার পরবর্তী কাব্য-সমূহে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। 'নবজাতকে' কবির যে নবজন্ম হয়েছে তার মূলে রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার অত্যাশ্চর্য নব-নবোন্মেষশালিনী শক্তির পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে কবির চারিপাশের হাওয়া বদলের প্রভাব। কাব্যে এই হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এটা খুবই স্বাভাবিক—কত স্বাভাবিক তার পরিচয় যে কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় স্পষ্ট হয়। 'কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না, এর কাজ হতে থাকে অন্য মনে।'

রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও এই হাওয়া বদল থেকে স্বাভাবিক সৃষ্টি-বদল-এর পরিচয় সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কালান্তরের ঘোষণা যখন চারিদিকের হাওয়ায় স্পষ্ট, তখন রবীন্দ্রকাব্যে তার সুস্পষ্ট না হোক ঈষদ্‌স্পষ্ট আভাস অবশ্যই লক্ষ্যগোচর হয়, তা না হলে রবীন্দ্রকাব্য যে যুগধর্মচ্যুত হবে। কিন্তু এই যুগধর্মকে অঙ্গীকার করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্য যে স্বধর্মচ্যুত হয় নি তার সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি প্রামাণ্য জ্ঞানে এখানে উদ্ধৃত হল—

"চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছেই সব সময়ে জানতে পারি বা না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করিনি—বোধ হচ্ছে না-করবার কারণ এই যে আমার বাসায় জায়গা ছিল যথেষ্ট। আমার মানসিক চলাচলে বিজ্ঞানের ঝোঁক ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার হালের লেখার মধ্যে তার প্রভাব প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়, সেই প্রভাবটা যদি ভিতরকার জিনিস হয় তা হলেই সেটা অকৃত্রিম হোতে পারে। দেশ বিদেশ থেকে নানা রকমভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেছে আমার মনে এবং রচনায়, তাকে স্বীকার করে নিয়েছে, তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয়নি'। ভিতরের দিক থেকে ভাবগ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত ; কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার সীমানায় বাঁধা, সেই সীমার মধ্যেই কিছু কিছু তার বাড়া-কমা, কিছু কিছু তার অদল-বদল চলতে পারে—কিন্তু আগাগোড়া রূপবদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ

করা নয়, আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তোমাকে আমি এতকথা বললুম তার মূলে আছে আমার নিজের কাব্যরূপের অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা নানা পর্বে নানা পথে গেছে কিন্তু সব নিয়ে স্বতই তার একটা চেহারার ঐক্য রয়ে গেল। যুগধর্মের তিলকলাঞ্ছিত হবার লোভে সেটাকে বদল করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"[৬৪]

বলা বাহুল্য কবির এই পত্রখানি ২৩. ২. ১৯৩৯ তারিখে লেখা এবং লিখিত হয় ডঃ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকেই। সুতরাং পত্রমধ্যে 'নবজাতক' রচনাকালীন কবি-মনোভাবেরই ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্বধর্মে অবস্থান করেও যুগধর্মকে কবি কিভাবে অস্বীকার করেছেন তারই ইঙ্গিত আছে ঐ পত্রে। কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যে যে কবি মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, তাতে বিজ্ঞানের ঝোঁক যে ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ 'নবজাতকে'র অনেক লেখাতেই পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আশ্রয় করে কবিতা লেখা কিংবা উপমা-রূপকের চমৎকারিত্ব সৃষ্টির উপরেই শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রকাব্যের মূল্য নির্ভর করে না। মহৎ সাহিত্য মাথা তুলে দাঁড়ায় বৃহৎ বক্তব্যের শক্ত ভিত্তির উপর ভর করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন যা সত্য সত্যই রবীন্দ্রকাব্যের স্বকীয় কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যে অভিনব কবির মহত্তম বক্তব্য 'নবজাতক' গ্রন্থের নাম কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে—

'মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী।' 'নবজাতক' মানবের দিব্য সম্ভাবনাময় আবির্ভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্জলন্ত বিশ্বাসের বাণীমূর্তি। 'নবজাতক' কবির সেই বিশ্বাসী মানুষ, মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে যাঁকে মহামানব বলে কবি অভিহিত করে তাঁর আগমনী গেয়ে গেছেন—

'ঐ মহামানব আসে।'

পৃথিবীর মানুষ আজ নবীন আগন্তুকের প্রতীক্ষায় উৎসুক—

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি।

এত পাপ অমঙ্গল, হিংসা হলাহল সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—এই মৃত্যুহীন বার্তাই কবি ঐ নবজাতকের কণ্ঠে শুনতে চান। কবি

নিজেও যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে শেষ বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করেছেন—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

'নবজাতকে'র দ্বিতীয় কবিতা "উদ্বোধন" সম্পর্কে কবির নিজস্ব কিছু বক্তব্য না পাওয়া গেলেও কবিতার প্রথম কুড়ি ছত্র 'গীতবিতানে'র দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থভূমিকারূপে মুদ্রিত হওয়ায় কবিতাটিতে যে কবির প্রিয় বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কারণ গীতবিতান কবির অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তাছাড়া আরও একটা কথা—১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখ কালিম্পঙে কবির জন্মদিনে এই কবিতাটি লেখা হয়। কবির শেষ জীবনে জন্মদিনগুলিতে লেখা কবিতাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ রচনা—সেদিক থেকেও কবিতাটির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি পত্রপুট গ্রন্থ বিধৃত গদ্যছন্দে লিখিত কবির একটি রচনা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র পুনর্লিখিত ছন্দরূপ। এই কবিতার শিরোভাগে গদ্যে কবি যে সংক্ষিপ্ত সূচনা লিখে দিয়েছেন সূত্রাকারে কবিতার বক্তব্য তাতেই বলা হয়েছে—কবিতাটি ঐ সূত্রের কাব্য-ভাষ্য বলা চলে। সূত্রটি এই—

"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানে সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

কবিতাটিতে বুদ্ধভক্তির নামে জাপানীদের শঠতার প্রতি যে শানিত বিদ্রূপ করা হয়েছে গদ্যভূমিকায় কবির সেই মনোভাবটিও আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ধরা পড়েছে। চীনের প্রতি জাপানের নিষ্ঠুর অত্যাচারে কবি হৃদয় কি পরিমাণে উৎপীড়িত সেই বেদনার পরিচয় আছে এই কবিতায়, সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বের অমর্যাদার ফলে বর্তমানে সমাজ ও সভ্যতার শোচনীয় রূপ কবির লেখনীতে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠেছে—

হত আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয় ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,

মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষ বাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে 'নবজাতকে'র "রাজপুতানা" কবিতায়। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন মংপুতে যান তখন একদিন স্টেটস্ম্যান থেকে প্রকাশিত সুন্দর ভারত 'Wonderful India' গ্রন্থে রাজপুতানার ছবি দেখে কবির মনে যে ধিক্কার লাগে তাহাই অভিঘাতে লেখা হয় এই কবিতাটি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে কবির মুখে এই কবিতা রচনার কথা এইভাবে পরিবেশন করেছেন—

"ঐ যে বইটা দিয়েছে না, "স্টেটস্ম্যানের সুন্দর ভারত ওর মধ্যে দেখছিলুম রাজপুতানার ছবি। দেখেই মনে হ'ল, হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে বেঁচে আছে। এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো এক রকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।

একি আত্মবিস্মরণ মোহ
বীর্যহীন ভিত্তি পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।

এযে ব্যঙ্গ করা নিজের সমস্ত অতীত গৌরবকে।"[৬৫]

'মংপু পাহাড়ে' কবিতাটিও লেখা হয় মৈত্রেয়ী দেবীর গৃহে বাসকালে এমনকি ঐ বাড়ির সামনে যে একটা প্রকাণ্ড সেগো পামগাছ ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কথাও ঐ কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। গাছটিকে কবি অমর করে রেখেছেন সেই সঙ্গে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-লেখিকা পাম গাছটির একটি আলোক চিত্র গ্রন্থভুক্ত করেছেন। অসময়ে বসন্তকালের মতো ঝুরঝুরে বাতাসে কবিকে ঝুরুঝুরু ছড়ার ছন্দ এই কবিতাটি রচনায় উৎসাহ দিয়েছে। কবিতাটি হাল্‌কা চালে লেখা হলেও উপসংহারে কিছু গুরুগম্ভীর বক্তব্য স্বভাব-দার্শনিক কবিকণ্ঠে সহজেই ধ্বনিত হয়েছে—

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।

'সাড়ে নটা' কবিতাটিও মংপুতে লেখা—উপলক্ষ রেডিওতে বিদেশিনীর কণ্ঠসংগীত। এই কবিতার রচনা প্রসঙ্গ কবি মুখে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

"ইয়োরোপের সংগীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন সুদূর থেকে কতরাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে দেশে

এখন কত কাণ্ডই চলেছে, মারামারি, হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়েনি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানারকম ব্যাপার চলছে, নানারকম ঘটনাপ্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে—যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল-সম্পর্ক-রহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে।··

যখন মেঘদূত রচনা হয়েছিল তখনও তো চলেছিল সংসারচক্র, কত লোকের যাওয়া-আসা, সে সব চিহ্ন লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এই আজ এই লেখাটা লিখলুম কিছুদিনের জন্য এও কালের সমুদ্রে সাঁতার দেবে। কিন্তু এই আজকের নীলাকাশ ওই রেডিওর গুঞ্জনধ্বনি তোমাদের যাওয়া আসা এবং আমারও সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে।"[৬৬]

কবির একটা বিশেষ মনোভঙ্গী ভাবুকতার সঙ্গে যে কবিতাতে প্রকাশিত হয়েছিল পরে তা দুটি পৃথক কবিতায় রূপ নেয়—প্রথম অংশে 'নবজাতকে'র এই 'সাড়ে নটা' কবিতা। কবিতাটি লিখেই কবির চিন্তা হয়েছে—

'বেশ স্পষ্ট হয়েছে তো কথাটা? আমার আবার ওই ভয় করে যা বলতে চাইলুম বলা হোলো কিনা। খামকা দুর্বোধ্য হয়ে উঠলে রচনার অর্থই থাকে না।'[৬৭]

কবির ভাষ্য পাঠ করার পর কবিতাটিকে আর দুর্বোধ্য মনে হয় না।

বিশ্বভারতীর ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দীন-এর অকালবিয়োগ উপলক্ষে শোক-প্রশস্তি রচিত হয় 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন' কবিতায়। শান্তিনিকেতনে একটি শোকসভায় কবি যে ভাষণ দেন সেই ভাষণের অনুলিপি ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলীর চব্বিশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটি রচনা ও ভাষণদান একই দিনের ঘটনা বলে উভয়ের মধ্যে বক্তব্যে মিল থাকা স্বাভাবিক। তাই একটির সাহায্যে অপরটিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

'প্রজাপতি' কবিতাটি লেখার সময়ে ও পরে কবির মনে যে ভাবনার উদয় হয় তা শ্রীসুধীরচন্দ্র করের লেখা এক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্রজীবনে' বর্ণিত আছে। এই সম্পর্কে কবি যা বলেছেন তা শারদীয়া 'যুগান্তর' ১৩৫৫ থেকে উদ্ধৃত করা হল—

"মনের কি রকম একটা অবস্থা হয়েছে, সব কিছুই জানতে ইচ্ছে হয়, জানতে পাইনে। এত যে পড়ি, যতই জানি—হঠাৎ এক এক সময় একটা সামান্য

সামান্য ঘটনায় মনে হয়, কিছুই জানি নে, কোনো দিন যে জানতেও পারব না, এইটেই আরো অসহ্য। এই যে পিঁপড়েটা মাটিতে চলে যাচ্ছে, এর জানা তো আমার জানা হয়ে ওঠেনি। দেশকালের ধারণা ওর কী রকম, কে জানে। ...আমরা ওদের কাছে আছি কি ভাবে...বাঘকে দেখে আমি ভয় পাব, একটা প্রজাপতি তো পাবে না। মধুর মধ্যে প্রজাপতি লুটে আছে। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ওর কাছে নেই। ওর জগৎ যত ক্ষুদ্রই হোক, ওর অনুভূতির কাছে তার যা রূপ রস, ভোগের যা নিবিড়তা সে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। সেই-জন্যেই চিরকাল রইল আমার কাছে একদিক দিয়ে ওর বিশিষ্টতা, তা মূল্যের অতীত। কাল রাত্রে স্নানের ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে টেবিলের ওপর লক্ষ্য করেছিলাম একটা প্রজাপতি। আজ সকালেও দেখি সেটা সেইখানেই; বুঝলাম ওটা মৃত। কিসে থেকে ওর মৃত্যু ঘটল। আমি থাকি আমার কবিতা নিয়ে, ওর বোধের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি ওর বোধ আমি পাইনে বলে ওর যেটা সত্য, আমার কাছে সেটা হয়তো মিথ্যা।...ঐ প্রজাপতি আর আমি—আমরা আলাদা বোধের জগতসীমায় যার যার কোঠায় বাঁধা।"

তুচ্ছ প্রজাপতিকে অবলম্বন করে কবির এই জিজ্ঞাসা, অতুচ্ছ বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছে কবিকে 'নবজাতকে'রই "কেন" ও "প্রশ্ন" কবিতা দুটিতে। এই কাব্যের সূচনায় কবি যে মন্তব্য করেছেন 'ভিতর থেকে মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে' তা এই কবিতাদুটি রচনার সমকালে ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে ডঃ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা এক পত্রে লিখেছিলেন—

"আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে সুদূরে—সেই দূরকে নিজের ভিতরে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি।" রবীন্দ্রজীবনীকার বলছেন এই সময় 'তাঁহার ইচ্ছা সান্নাস চর্চা করেন—নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আত্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া অসীমকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। তাই বলিতেছেন—'যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব (তু° 'এপ্রাণ তোমারি ছিন্ন তান, সুরের তরণী', "সাবিত্রী", 'পূরবী') আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে। সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ—যে অর্থ বহন করে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।"[৬৮]

কবির এই পত্রাংশ (রবীন্দ্র জীবনীকারের মন্তব্য সহ) পাঠ করলে 'প্রশ্ন' ও 'কেন' কবিতার তাৎপর্য উপলব্ধি কিছুটা হয় তো সহজ হবে যদিও একথা সত্য এই দুই কবিতায়—দার্শনিক মত ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংহত হয়ে যে আত্ম-জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটিয়েছে তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা কবি সে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন।

'জন্মদিন' কবিতায় কবির যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার অনুরূপ মন্তব্য বহু পূর্বেই কবি কবিতা ও পত্রে প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মহা আড়ম্বরে পুরীতে কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়, নানাজনে কবির গুণগান ও প্রশস্তি পাঠ করেন, ওড়িশার নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবিকে সালংকার প্রশস্তিযুক্ত মানপত্র দেওয়া হয়। কবি ঐ দিনই এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতার সূচনায় কবি যে কথা বলেছেন তা তাঁর অন্তরেরই কথা—খাঁটি সত্য ভাষণ—

তোমরা রচিলে যারে নানা অলঙ্কারে
তারে তো চিনি নে আমি, চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একাধিক পত্রে কবির অনুরূপ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে দেখা যায়। একখানি পত্রে কবি লিখেছেন—

"যারা আমাদের কাছে আসে অনেকটা পরিমাণে আমরা তাদের দ্বারাই রচিত। তারা বাদসাদ দিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে একটা রবীন্দ্রনাথ তৈরি করে নেয়, সেই রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা যা পায় এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মাপের মিল হয় বলে আমার তো মনে হয় না।

কিন্তু তাও বলি, এ রবীন্দ্রনাথ যে কী পদার্থ তা আমিও ভালো বুঝতে পারি নে। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে আমি ঋষিও না গুরুও না—এটাও নিশ্চিত সত্য যে আমি কবি।"[৬৯]

আর একখানি পত্রে আছে,—

"রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন নিকটবর্তী হচ্ছে—শেষদিনের পূর্বে গুটিকয়েক মাত্র মাইল পোস্ট বাকি আছে, আগামী জন্মদিন তারি মধ্যে একটি। এই নিয়ে গোলমাল করা কি ভদ্রতাসঙ্গত? প্রতিকূল পক্ষে ফুটবল খেলায় (গোল) দিলে তার দিক থেকে হর্ষধ্বনি ওঠে এও যে তদ্রূপ। যমরাজ আম্পায়ার বসে আছেন, ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ সালে আয়ু ডিঙ্গিয়ে একটা গোল দেওয়া হবে—তাই নিয়ে তুয়ো দেবার মতো শোনাবে জন্মদিনের উৎসব।"

অন্য একখানি পত্রে কবি লিখছেন—

'গেল রবিবারে সাহিত্য পরিষৎ আমার ৭৫তম জন্মদিনের সম্মানার্থে একটা সভা ডেকেছিল। অত্যন্ত ভিড়। অনেক মালা অনেক গান। মন বলে, আর কেন ? এর মধ্যে কতটুকু রস আছে ?"[৭০]

কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে উল্লিখিত পত্রাংশগুলির বক্তব্যের মিল দৃষ্টি এড়াবে না। কবিতায় কবি নানা বিশেষণে বিভূষিত তাঁর ব্যক্তি পরিচয়কেই শুধু অসত্য বলেননি, তাঁর এ-কালের কবি-পরিচয়কেও ক্ষণ-ভঙ্গুর বলেছেন—'এই কালের আশা-নৈরাশ্য, সাদা-কালোয় গড়া কবির ক্ষণিক অমরতার এই ভানকেও তিনি অস্বীকার করেছেন, তাঁর আত্মীয় বন্ধু ও স্তাবকবৃন্দের মনে তাঁর চিরন্তনতার এই মূর্তিখানি যত আশ্বাসই এনে দিক, কবি জানেন তা 'কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।' মংপুতে কবি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর এক স্তুতি কবিতার ['কুন্ঠিত কৈশোর যবে আপনারে আপনি না জানে'—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ৫৮-৫৯ (১৩৬৫) দ্রঃ] প্রত্যুত্তরে এই কবিতাটি পাঠ করে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ও উপস্থিত সকলকেই মর্মান্তিক সত্য কথা শুনিয়ে স্তব্ধ করে দেন। কবির কথায় সত্যতাকে স্বীকার করেও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী মন্তব্য করেছেন—

"জানি মহাকবি অনাগত দীর্ঘকালের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে সত্য হ'য়ে থাকবেন। কিন্তু শুধু তাতেঁ মন খুশি হয় না। এই মানুষ, এই শরীরী লৌকিক দেহধারী অলৌকিক মানুষ, যাঁকে রূপকার সৃষ্টি করেছেন অতি অপরূপ করে, সেই মানুষ কোথায় যাবেন। কাব্যের অমরতা সে ক্ষতিকে পূরণ করতে পারে না—সেদিন আজকের কথা মনে করতেই পারিনি—

সহসা মুহূর্তে দিয়ে ফাঁকি
মুঠি কয় ধূলি রবে বাকি,
আর রবে কাল রাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলা।"[৭১]

কবি কিন্তু এই সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই প্রশস্তি ও নিন্দা উভয়ই নিরাসক্ত চিত্তে গ্রহণ করেছেন। প্রশস্তি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি, সমালোচকের নিন্দা সম্পর্কে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা পরিপূরক তথ্য হিসাবে এখানে উল্লেখ করা চলে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"অবতারে আমার নামে অদ্ভুত কলঙ্কারোপের কথা প্রথম শোনামাত্র হিংস্র প্রবৃত্তি জেগে উঠল—মনে হল এত বড়ো মিথ্যুককে শাস্তি দেওয়াই চাই।

সেদিনর রাত্রি দুটো পর্যন্ত ক্রোধের উত্তেজনায় ঘুমই হল না·· আমার মধ্যে যখনি এই রকমের আতিশয্য ঘটে তার অনতিকাল পরেই আমার মন তাকে ধিক্কার দিতে কোমর বেঁধে লাগে।···এবারেও ঠিক তাই হল···দেখতে দেখতে ভালো মানুষটির মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলুম। তখন নিজের স্বরূপকে নিজের চিরকালের জগতের মধ্যে দেখতে পেলুম। ··বিধাতার কাছ থেকে আমি যে দান পেয়েছি তা কতখানি, আর ঐ হতভাগা সবদিক থেকেই বঞ্চিত, ওকে আমি মারতে যাব।···তারপরে মেয়েরা ঘরে এসে আমাকে গান শুনিয়ে গেল—আমার সেই নিজের গানের মধ্যে নিজের অন্তরতর প্রকাশকে দেখতে পেলুম, তখন নীচেকার যে হাওয়ায় ধুলো ও দুর্গন্ধ তার অনেক উপরের আকাশে উঠে সেখানে থেকে বিরাট বিশ্বকে দেখা গেল—তার মধ্যে এই সব মিথ্যা, এই সব দীনতা কোথায়?"[১২]

স্তুতি নিন্দায় সমান উদাসীন মুনি ঋষিদের মতো অতখানি স্থিতধী না হলেও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁদের অনেক কাছাকাছি পৌছুতে পেরেছিলেন উপরেব আলোচনাতেই তা প্রমাণিত হয়। উপরের উদ্ধৃতিতে কবি চিরকালের জগতের মধ্যে নিজের স্বরূপকে দেখাব কথা কিংবা নিজের গানের মধ্যে নিজের অন্তরতর প্রকাশকে দেখাব যে কথা বলেছেন স্বকাব্য সমালোচনায় কবির সেই কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

'অবর্জিত,' কবিতাটিতে কবি তাঁর রচনায় অবর্জিত অংশ সম্পর্কে তাঁর মতামত কি তাই জানিয়েছেন। কবিতাটি লেখা হয় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশে ৫ই জুন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বিষয়ে পরদিন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন,

"লেখবাব উৎস অনাবৃষ্টির দিনের জলের উৎসের মতো বহু নীচে নেবে গেছে সেখান থেকে পাম্প করে তোলবার মতো শক্তি নেই। কখনো কখনো খেয়াল মতো একটা বাজে কবিতা লিখেছি—কেন না, ছন্দের বুনোনি কাজটা এখনো সহজেই আসে—বরঞ্চ গদ্যকাব্য লিখতে গেলে কোমর বেঁধে বসতে হয়। কাল প্রশান্তকে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে পাঠিয়েছি, আমার অনেক দিনের নালিশ তার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, ফল কিছুই হবে না তা আমি জানি। কারণ ব্যাপারটা রত্নাকর দস্যুর মতো। নারদকে রত্নাকর বলেছিলেন স্ত্রী-পুত্র যাদের জন্য দস্যু বৃত্তি করে থাকি তারা আমার পাপের ভাগ নেবে। নারদ বললেন, জিজ্ঞাসা করে দেখ। স্ত্রী-পুত্ররা বললে, বা রে, আমরা ধন নেব, কিন্তু পাপ নেব কেন? কুকাব্য প্রকাশের পাপটা বরাবর আমারই, কিন্তু

গ্রন্থ প্রকাশের সমারোহটা গ্রন্থমণ্ডলীরই বিশেষত ওর সঙ্গে আয়ের সম্বন্ধ আছে।"[৭৩]

এই সময়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশকমণ্ডলী কবির সমগ্র গ্রন্থাবলী খণ্ডশঃ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে কবি কর্তৃক বর্জিত অচলিত রচনাবলীও প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত হয় এবং অধ্যাপক মহলানবিশই রচনার সূচী প্রস্তুত করেন। তাই তাঁর কাছে নালিশ জানিয়ে কবি বর্জিত রচনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। পত্রাদিতেও সেই বিষয়ে কবি বিস্তারিত আলোচনা করেন। কবির সেই সব বক্তব্য রচনাবলীর প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর মতে--

"ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়। ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়, সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পাবে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা, রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সবকিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্য রচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।"

কবি নিজের বাল্য কৈশোরের অপরিণত অপরিস্ফুট রচনার উপর কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রকাশকমণ্ডলীর প্রতিবন্ধকতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি তাই অচলিত সংগ্রহ দুইখণ্ডে কবির 'বাল্যলীলার লজ্জা ছাপার অক্ষরে কালিমাঙ্কিত' হয়েছিল। এ বিষয়ে কবির লেখা একখানি পত্র উল্লেখের দাবি রাখে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে তাঁর 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ' রচনা উপলক্ষে কবি ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৮ সালে এই পত্রখানি লেখেন। কবি জানান—

"তোরা কেউ যখন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা করতে বসিস তখন আমাকে কুন্ঠিত করে। জীবনের অভিব্যক্তি গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে চলে—ত্যাগ ক'রতে ক'রতে তবে সে পরিণত হয়ে ওঠে। আমাদের শিশুকালের আয়োজন শৈশবের পরিবেশের মধ্যেই সঙ্গতিলাভ করে। বেশি বয়সে যদি ছেলেবেলাকার খুদে জুতো, ছেঁড়া দোলাই নিয়ে নিয়ে বেড়াই তবে সেটা মানানসই হয় না। কাব্যেরও একটা ক্রমবিকাশ আছে—তার কাঁচা জগতেরই মধ্যে কাঁচা বয়সের সমস্ত উপসর্গ মিশ খায়, কিন্তু ছাপাখানার অনৈসর্গিক উপদ্রবে তাদের সরে দাঁড়াবার উপায় থাকে না, পর্দা একেবারে উঠে গেচে। মহাকাল যাকে বরখাস্ত করে দিয়েচে—ছাপাখানা তাকে কালির শিকলে বেঁধে রেখে মহানাকাল করে। আরম্ভের কচিপাতা ও অবসানের জীর্ণপাতা, প্রথম বয়সের নবীন কুঁড়ি ও শেষ বয়সের পাকা ফসল সমস্তই এক ডালে ঠাসাঠাসি ঝুলিয়ে রাখতে হয় কাব্য পাদপকে। কালিদাসের সময় ছাপাখানা ছিল না তাই কালের খেয়ায় তাঁকে রাজ্যের বাজে মাল বোঝাই করতে হয় নি। যে কয়টির মার নেই, সেই কয়টিই বেঁচে আছে। আমরা চালান ক'রে দিলাম বস্তা বস্তা ভুসো। তোরা যাচনদাররা তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিস। ছাপা কালির গুণে আমরাই সত্যকার কালিদাস।"[৭৪]

কবির এই উক্তির মধ্যে তাঁর কৈশোর রচনার প্রতি বিতৃষ্ণারই পরিচয় পাই। রচনাবলীর প্রকাশকমণ্ডলীর কাছে কবি নানা পত্রে তাঁর কৈশোর রচনার বিরূপ সমালোচনা করেছেন—আমরা প্রথম অধ্যায়ে কবি-সমালোচকের সেই বিরূপ মন্তব্যের কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু কবির মনোভাব জেনেও যে প্রকাশকমণ্ডলী অচলিত সংগ্রহে কবির কৈশোর রচনাসমূহ, তাঁর বর্জিত রচনাবলী, পুনঃপ্রকাশ করেছেন তার কারণ তাঁরা কেবল মাত্র রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাস রক্ষা করতেই চাননি, পরন্তু রসতত্ত্বের বিচারেও এই লেখাগুলির যে কিছু কাব্যমূল্য আছে তা তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরা বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয় কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই—ভাবীকালের উপরে রাখিয়াই এই গ্রন্থগুলি সংকলন করা হইল।"

অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-নিবেদনে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই উক্তি অতিশয় মূল্যবান। কবির বর্জিত রচনাকে 'অবর্জিত' রেখে বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশকমণ্ডলী রবীন্দ্রকাব্য পুনর্বিচারের কাজ সহজ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বে কাব্যের মধ্যে 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থখানির কবিকৃত আলোচনা কিছু বিস্তারিত আকারেই পাওয়া যায় তার কারণ কবি নিজেই বলেছেন—

"অমিয় বলে যে আধুনিক লেখাগুলিই হচ্ছে আসল সাহিত্য, যেমন 'নব জাতক' প্রভৃতি।"[৭৫]

সানাই (১৩৪০)

'নবজাতক' কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের জন্মকথা শুনিয়েছি। 'নবজাতক' ১৩৪৭ সালের বৈশাখে বার হয়, 'সানাই' বার হল শ্রাবণে। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা প্রেমের এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমসংগীত এই বইএ আছে। আকৈশোর বার্ধক্য পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথ গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখতে পেয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ আশির কাছাকাছি এসেও দেখলেন 'প্রেমের গান গগন ভরা', তাই শেষবেলায় কবি শেষ গানের রেশটুকু আমাদের কানে তুলে দিয়ে গানের জগৎ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। কবি নিজেই বলেছেন—

"আজকাল আমার নীরব হবার সময় এসেছে। এখন আমার গোধূলির সময়। এখন আমার দূরকালের স্মৃতিপটে নানা রং ভেসে উঠেচে। কিন্তু গানের সময় শেষ হয়ে এলো।"[৭৬]

'সানাই'-এর গানগুলি কবি আলোচনা করেন নি, কারণ গানের আলোচনা প্রজাপতির পাখনার রঙের রহস্য বিশ্লেষণের মতোই অসম্ভব। কবি সুরবেত্তা তাই সুর বাদ দিয়ে গানের কথার শুষ্ক সমালোচনা নিরর্থক জ্ঞানেই হয়তো তা বাদ দিয়েছেন। 'সানাই' মধুররসের শেষ কাব্যগ্রন্থ কিন্তু কবি সমালোচক এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রেম কবিতার কোনও বিশ্লেষণ করেন নি, কবি হয়তো ভেবেছেন কবিতা আস্বাদনেই ঐ মাধুর্যের স্বাদ মিলবে।

কিন্তু 'সানাই'এর কয়েকটি কবিতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা আমরা পাই। পরোক্ষ আলোচনা বলতে কবিতার পাঠান্তরকেই বুঝানো হয়েছে। সানাই-এর "কর্ণধার" কবিতাটির প্রথম রূপ ও তার ক্রমবিবর্তিত পাঠের পরিচয় পাওয়া যায় 'মংপুতে 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিকথায় এই কবিতার মোট পাঁচটি পাঠান্তর পাওয়া যায়। পাঠান্তরের আলোচনা কবিমানস ও কবিতার উৎস সন্ধানে আমাদের সহায়ক হলেও সেই রূপ আলোচনার অবকাশ এখানে কম। আমরা কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবে 'কর্ণধার'

কবিতার সূচনাংশটি সম্পর্কে জনৈক সুধী সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য সহ মৈত্রেয়ী দেবীর গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করবো।

"১১৩৯ মে মাসের ২৩ তারিখের সুন্দর সকালে ছুটির মেজাজ নিয়ে কবি প্রথমে এই কবিতাটির শুরুতে লিখলেন—

হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপন তরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার

ঐ দিন বিকালবেলায় কবিতাটি শুরু হল এইভাবে—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্চ পাড়ি
কর্মনদীর পার।

পরদিন সকালবেলায় "দেখি কবিতাটি আরো অনেক বদলে গেছে, তার প্রথম লাইনটা হয়েছে—

কে অসীমের লীলার কর্ণধার।

এমনি ক'রে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত হ'তে হ'তে বেশ কয়েকদিন পরে সে এক সম্পূর্ণ অন্য কবিতা হয়ে দাঁড়াল—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্চ পাড়ি
কর্ম নদীর পার···

কয়েকমাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'তে প্রকাশ হল তাকে চেনবার জো নেই।

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার
দিকে দিকে ঢেউ জাগাল
লীলার পারাবার।···

এবং তারিখ রয়েছে ২৮।১।৪০।"৭৭

এই পাঁচটি পাঠান্তরে সম্বোধন বাক্যটি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় বিশেষ কেমন করে নির্বিশেষত্বে পরিণতি লাভ করেছে। দীর্ঘ আট মাস (২৩.৫.৩৯-২৮. ১. ৪০) ধরে বিবর্তিত হতে হতে পরিণতিতে যে সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে তার অন্তরালে কবিমানসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে। পরিণততম বা শেষতম রূপের অন্তরালে পূর্ব পূর্ব যে সব রূপের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব তাতে দেখা যায় প্রথম পাঠে কোন বিশেষ নারীই এই

কবিতার উৎস। তিনিই কবির কর্মহীন ছুটির দিনগুলির কর্ণধার। অলস হাওয়ায় অবসর বিনোদন কালে পরিহাস ছলে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কবিতাটির সূত্রপাত। পরবর্তী পাঠে তরুণীর রূপধৃত ব্যক্তিত্ব অন্তরালে গিয়েছে, কবির বস্তুনিরপেক্ষ তত্ত্বপিয়াসী মন রূপ থেকে ক্রমে ভাবের নির্যাস টুকু ছেঁকে নিয়েছে এবং চতুর্থপাঠে মৌলিক প্রেরণার চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়েছে কর্ণধারটি তখন কোনও পার্থিব মানুষের (এমনকি কবি ব্যক্তিটিরও) কর্ণধার নন, তিনি এই বিশ্বসৃষ্টির ভাসান খেলার কর্ণধার অর্থাৎ বিশ্বদেবতা। শেষতম পাঠে অবশ্য কবি ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আছে 'আমার প্রাণের কর্ণধার' অর্থাৎ জীবনদেবতা বলে কবি তাঁকে সম্বোধন করেছেন কিন্তু এখানেও তত্ত্ব-প্রাধান্য। পরিণততম পাঠে আমরা ভগবানকেই কবিতাটির মূল প্রেরণা বলে মনে করি কিন্তু পূর্ববর্তী পাঠ ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর সাক্ষ্য-প্রমাণ মনে রাখলে জানতে পারি কোন নারীব্যক্তিত্বই এর মূল প্রেরণা ছিল।[৭৮]

সুতরাং পাঠান্তরের আলোচনা কবিমানস ও কাব্যপ্রেরণার উৎসের উপর যে আলোকপাত করেছে তা কবিতাটি উপলব্ধিতে সহায়তা করবে বলেই মনে হয় এবং কবিসমালোচকের সমালোচক-মানসের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কবিতার পাঠান্তর সাপেক্ষিত তা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক নয়।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী 'সানাই'-এর আরো একটা কবিতার পাঠান্তরের কথা তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যদিও সেই পাঠান্তরের পরিচয় দেন নি।

তিনি লিখেছেন—

"সমস্ত দুপুর একটা লেখা লিখেছিলেন—পাঁচ ছ'বার সে লেখা হোলো। তার পরে আরও পরিবর্তিত হয়ে 'পরিচয়' নামে সানাইতে প্রকাশিত হয়েছে। একবার একটা লেখা লিখে কখনো ছেড়ে দিতেন না, ঘষা মাজা ছাঁটা কাটা চলতই নিরন্তর। প্রত্যেকবার কপি করতেন আর একটি একটি ক'রে শব্দ বদলাতেন, সে যেন একটা কারুকার্য আলপনার মত সজ্জিত হয়ে উঠত। তাই বলতেন, "অন্যকে কপি করতে দিলে এই মুশকিল হয় প্রত্যেকবার লেখার সময় মনে পড়ে কোনটা কেন ঠিক শোনাচ্ছে না, অন্য কেউ লিখে দিলে তাই সে সুযোগ পাওয়া যায় না। এই কবিতাটার মধ্যে একটি বলবার কথা আছে, জানি না সেটা লোকের চোখে পড়বে কি না, লক্ষ্য হবে কিনা॰ সে হচ্ছে কোনখানে রোম্যান্সের শুরু, আর কোথায় অবসান। যেখানে সে প্রতিদিনের আলোতে প্রকাশিত ধুলোতে মলিন, যেখানে সে সুলভ, সেইখানেই অবসান রোম্যান্সের।"

এই আলোচনার পরই গ্রন্থ লেখিকা 'সানাই'এর "অদেয়" কবিতাটি কবিকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়ে কবি মুখে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"তোমাকে যখনই সাজিয়ে দিলেম দেহ, তখনই সেই বাইরের দেওয়ার সঙ্গে দিইনি আমার প্রেম—তাই সত্য আমার দিইনি তাহার সাথে—সেই প্রেমকেই বলি সত্য। সন্দেহ করেছিলে সে প্রবঞ্চনা। সে বঞ্চনা যে ঘোর অসম্মান। আমার স্বভাবের আমার যৌবনের অপমান। সেই অন্যায়, সেই অপরাধ, আজ আমাকে সমস্ত বিশ্বের কাছ থেকে, প্রকৃতির আনন্দ উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমি এই বসন্তের ফুলের নিমন্ত্রণে যোগ দেবার অধিকার হারিয়েছি। হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে, দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে, কিন্তু সে তো তার অযোগ্য তাই—কে দেয় দুয়ার রুধে, একলা ঘরের শুন্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে। কিন্তু না হয় আমিই অন্ধ হয়েছিলুম, তুমি কেন জোর করে কেড়ে নিলে না যা তোমার সত্যকার প্রাপ্য—সময় হলে রাজার মত এসে জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবা—ভেঙে কেন ফেললে না ঘরের চাবি? টেনে নিয়ে এলে না হৃদয়ের মধ্যে থেকে সেই সত্য তোমার দাবীর অধিকার? আজ যে সেই মিথ্যার বোঝা আমার সার্থকতার পথ বন্ধ করে দিল। অন্ধকার করে দিল জীবন, ছিন্ন করে দিল যোগ প্রকৃতির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক আনন্দের। তাই তোমার অভিমান আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ।"[৭৯]

অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে, ভেসে আসা যুগল প্রেমে বিশ্বাসী কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে যৌবন মধ্যাহ্নেও প্রেম ছিল 'অনন্ত প্রেম', প্রেম কল্পনাতে তিনি বিশেষের পরিবর্তে নির্বিশেষের পক্ষপাতী। প্রেমের ক্ষেত্রে দেহকে পুরোপুরি অস্বীকার না করলেও প্রেমকে সেই দেহ থেকে সেই ব্যক্তি সীমার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে অনন্ত ভাবময় সত্তা দান করতেই তার সমধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ কবি উপলব্ধি করেছেন মানবীর প্রেম বিশেষকেই কামনা করে একান্তভাবে, আজ তাই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় প্রেমের কবিতা লিখতে বসে কবি প্রথম জীবনের ভুলকে স্বীকার করলেন এবং প্রেমে মানসী মূর্তির পরিবর্তে মানুষী মূর্তিকে ধরতে চাইলেন।

'সানাই'-এর স্বল্পতম আয়তনের একটি উৎকৃষ্ট কবিতায় কবি মনের এই বেদনাই অপূর্ব ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে, কবিতাটি স্বয়ং ব্যাখ্যাত তাই কবির টীকা ছাড়াই এটা উদ্ধার করা হল—

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিইনি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূর পথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

'মানসী' ('মনে নেই বুঝি হবে অগ্রহান মাস') কবিতা রচনার ইতিহাস 'নবজাতকে'র 'সাড়ে নটা' কবিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি—

"মনে পড়ে যখন বোটে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ ধূ করছে, আমি লিখেই চলেছি "মানসী" ('মানসসুন্দরী') যখন শুরু করেছিলুম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, তারপরে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো আকাশ রঙীন করে অস্ত গেল সূর্য। একটিমাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, 'সে কখন নীরবে মিট্‌মিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি 'মানসী'। আজ কোন কাজ নয় সব ফেলে দিয়ে ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থগীত এসো তুমি প্রিয়ে! কোথায় গেল সেই দিন। সেই পদ্মার চর, ধূ ধূ করে সোনালী বালি, সেই মিট্‌মিটে শিখার ম্লান আলো সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী, তার যে পারিবেশ ছিল সে তো লুপ্ত হ'য়ে গেল এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকেও সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সে শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।"[৮০]

কবির এই মন্তব্য 'মানসী' কবিতা পাঠে বিশেষ সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

'অধীরা' কবিতাটি সম্পর্কেও 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মূল্যবান একটুকরা মন্তব্য পাই—

"বালি ঝড়ের প্রলয় মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে, সে বন্ধন মানে না সে দুর্বার··· সে

বিদ্রোহিণী…। সেই সমস্ত সংকোচ আবরণহীন একটা সত্যমূর্তি প্রকৃতির কাছে সে চঞ্চলা অধীরা, সৃষ্টির বেদনা বহন ক'রে অনাদি কাল থেকে ছুটে আসছে।"[৮১]

'স্মৃতির ভূমিকা' কবিতার সম্পর্কে ঐ একই গ্রন্থে কবি লিখেছেন—

"আজ সকালে হঠাৎ একটা প্রজাপতি আমার চুলে এসে বসল। চুপচাপ করে রইলুম পাছে ওকে চমকে দিই"—কবিতায় এই প্রজাপতির উল্লেখ আছে। 'বনবাণী'তে "ময়ূর" কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কবির এই ধরনের পশু-পাখি-পতঙ্গ প্রীতির কথা বলেছি। কবির পুষ্পপ্রীতির নিদর্শনও আছে এই কবিতায়। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ির বিদেশী ফুলের নাম অমর করতে চেয়েছেন এই কবিতাতে—ফুলটির নাম—'জিরেনিয়াম'।"

পাঠকের মনের স্মৃতির ভূমিকার কথা মনে রেখে এখানে অবশ্য একটা কথা বলা যেতে পারে যে, যে নাম বা যে শব্দ পাঠকের মনে অনুরূপ কোনও স্মৃতি জাগ্রত করে না তার সার্থকতা কাব্যে কতটুকু? ছন্দের খাতিরে মহুয়াতে 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' চলে গেছে বলেই যে 'জিরেনিয়াম' টিকে থাকবে এমন কথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় কি—এই শব্দের সাহায্যে পাঠক মনে সুনির্দিষ্ট কোন স্মৃতি যদি জাগ্রত না হয় তবে বলবো কাব্যে স্থান লাভ করেও পাঠক মনে ফুলটির কোন অস্তিত্ব নেই।

রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১)

রবীন্দ্রপ্রতিভার একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তা অদ্ভুত প্রাণ-শক্তির অধিকারী—ব্যাধির নির্দয় আঘাতও সেই প্রতিভাকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। ১৯৩৭ সালের 'ইরিসিপ্ল্যাস' রোগ তার কবিত্ব শক্তির এতটুকু হানি করেনি, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি 'প্রান্তিক' ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থাবলীতে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে কবি আবার 'কোমা' রোগগ্রস্ত হলেন—কবি তখন কালিম্পং-এ গৌরীপুর ভবনে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছে ছিলেন। সেখান থেকে অসুস্থ কবিকে কলকাতায় আনা হল এবং ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বড়ো বড়ো চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রেখে নভেম্বরের মাঝামাঝি তাঁকে সুস্থ করে তোলা হল। কবিকে যখন কলকাতায় আনা হয় তিনি 'কোমা'র বিষক্রিয়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন—এই রোগটা এমনই অদ্ভুত যে 'বাইরে যখন চেতনার লক্ষণ নেই ভিতরে তখন যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। রোগ-মুক্তির পর আচ্ছন্ন চেতনার অভিজ্ঞতা নিয়ে কবি 'রোগশয্যা'য় কাব্যগ্রন্থের

কবিতাগুলি রচনা করলেন। অবশ্য এবারের অধিকাংশ কবিতাই ডিক্‌টেশন্ দিয়ে লেখা—কবি মুখে মুখে বলে যেতেন কখনো জেগে, কখনো আধো জাগা আধো ঘুম অবস্থায়, দিনে অথবা রাত্রে—আর কবির সেবা পরিচর্যার জন্য যাঁরা কবির পাশে থাকতেন তাঁরা লিখে নিতেন। ১৯৪০এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কিছু জোড়াসাঁকোয় কিছু শান্তিনিকেতনে এইভাবে 'রোগশয্যায়' কাব্যের কবিতাগুলি লেখা হয়। এই কাব্যধারার সমাপ্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতা রচনা শুরু হল—১৯৪১এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতেই তা শেষ হয়। রোগভোগের সময়ে ও তার অব্যবহিত পরে লেখা এই দুই কাব্যগ্রন্থ আসলে একই বইয়ের দুই খণ্ড—পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ তাই এই দুই কাব্যের আলোচনা একত্রে করাই বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও এই দুই কবিতা পুস্তিকার আলোচনা একত্র করছি।[৮২]

অবশ্য এই দুই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবির নিজের আলোচনার পরিমাণ খুব অল্প আর সেইটাই স্বাভাবিক। যে কঠিন রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে কবি এই কবিতাগুলি লিখেছেন তাতেই আমরা বিস্মিত—এই কবিতার ব্যাখ্যা কবির কাছে আমরা প্রত্যাশাই করি না। কবির রোগশয্যায় যাঁরা তাঁর সেবা করেছেন তাঁরা এই দুটি গ্রন্থের বিষয়ে মূল্যবান অনেক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন, বস্তুতঃ তাঁরা তা করেছেনও। রবীন্দ্র কবিজীবনের এই সর্বশেষ পর্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যাবে প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থে। 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শ্রীমতী রাণীচন্দ এই পর্বের সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন, এছাড়া এই পর্বের স্মৃতিচারণ করে কেউ কেউ যেমন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় চিত্তাকর্ষক হলেও স্মৃতিকথার সবিশেষ সহায়তা নেবার সুযোগ নেই, আবশ্যকতাও নেই। আমরা প্রাসঙ্গিক দু'একটি মন্তব্য উদ্ধৃতি করছি মাত্র।

'রোগশয্যা'য় ও 'আরোগ্য' পর্বের কবিতা রচনা প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"প্রথম মাস (১৯৪০ অক্টোবর) বাবা-মশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন, দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরী করেন, কবিতা লিখতে থাকেন; সেই সময়ে আশে পাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা।

ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপদজনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হতে পারেন নি। তখন তিনি রুগী। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতের তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহমনকে সজাগ করে তুলল, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চ'লে ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেইগুলিই রোগশয্যায় নাম দিয়ে ছাপা হল। এই বই এবং আরোগ্যের অনেক কবিতাই তাঁর নিষ্ঠাবান অনুরাগী-সেবক-সেবিকার উদ্দেশে লেখা।"[৮৩]

'রোগশয্যা'য় গ্রন্থখানি যে ২টি নারীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত 'নির্বাণে' প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁরা নন্দিতা কৃপালনী ও শ্রীঅমিতা ঠাকুর—নন্দিতা কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর কন্যা, অমিতা স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অজীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী—তাদের বাড়ীর বৌ।

রোগশয্যার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন—

"রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী কাতরতা প্রকাশ করে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। যন্ত্রণাকে অবিচলিতভাবে সহ্য করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি নানারকম হাস্য পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবারও উপায়ও হয়তো তাই। বিমর্ষতার চর্চা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"[৮৪]

এ বিষয়ে কবির নিজের কথাও উদ্ধৃতিযোগ্য—

"কিছুদিন থেকে আমি দুঃসহ রোগ দুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি বলে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে।"[৮৫]

প্রকৃতির মধ্যে যে নির্মল প্রসন্নতা আছে তার দিক হতে কবির মন ফেরে নি চোখ ফেরে নি বলেই রোগশয্যাতেও কবিতা লেখা কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য 'অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস' কবি নিজেই তার সম্পর্কে

কুণ্ঠিত হয়েছেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে 'বাণীর ক্ষীণতা' 'অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা' উপলব্ধি করে কবি ব্যথিত হয়েছেন। শেষ-পর্বের অপটু রচনার সম্পর্কে কবির এ সব কৈফিয়তের হয়তো কোনও প্রয়োজনই ছিল না, তবু আজীবন যিনি একমনে বাণীর মূরতি গড়েছেন অপূর্ব কৌশলে আজ 'পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার যায় ছড়াছড়ি' এই দৃশ্য দেখে কবির মনে অবশ্যই বেদনা বেজেছে।

কবির নিজের দিক থেকে এই কুণ্ঠা হয়তো স্বাভাবিক কিন্তু রবীন্দ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীতে এই দুই গ্রন্থের যে গৌরবময় স্থান আছে সে কথা অবশ্য স্বীকার্য। এই দুই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের চিরকালের বাণীই সহজসুরে ক্ষুদ্র পরিসরে নিরাভরণ রূপে ঘোষিত হয়েছে—কবির সেই একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি প্রায় উপনিষদের সূক্তের মতোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীব ধূলি।
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি।

'রোগশয্যা'য় ও 'আরোগ্য' এই কাব্য দুখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কবির মৃত্যুচিন্তায় দার্শনিক প্রত্যয়নিমগ্নতা—মৃত্যু সম্পর্কে কবির পরিণততম বিশ্বাসের কথা আছে এই দুখানি গ্রন্থে। মৃত্যুকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেখা কিংবা অনন্তের পটভূমিকায় স্থাপনা করে দেখা কবির স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার সে কথা আমরা আগেই বলেছি, 'রোগশয্যা'য় গ্রন্থের ২৫ সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর সেই আন্তরিক বিশ্বাসকেই ক্ষুদ্র সংহত একটি শ্লোকে ঔপনিষদিক সুরে ব্যক্ত করেছেন—শ্লোকটি স্বয়ং ব্যাখ্যাত তাই তার ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন -

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
কবির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

খণ্ডরূপেই মৃত্যু ভয়ঙ্কর, অখণ্ডরূপে তা নিতান্ত স্বাভাবিক। কবির কাছে তাঁর শেষ জীবনে মৃত্যু তার স্বাভাবিক রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছে।

'রোগশয্যা'য় কাব্যগ্রন্থের কবিতা বিশেষের সম্পর্কে কবির নিজের আলোচনা পাওয়া না গেলেও 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের দু'একটি কবিতা সম্পর্কে কবির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়।

'নারী' কবিতা সম্পর্কে কবির নিজস্ব মন্তব্য শ্রীমতী রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ৮ই এপ্রিল ১৯৩৯ সালের দুপুরবেলায় কবি বলেছিলেন—

"সেবাটা মেয়েদের হাতেরই জন্য—ও হাতের জন্যেই সেবা। ও-হাত ছাড়া সেবা পেয়ে সুখ নেই। অমন দরদভরা সেবা পুরুষের হাতে হয় না; মেয়েদের ওটা নিজস্ব জিনিস।"

১৯৪১ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি একদিনের ডায়ারিতে শ্রীমতী চন্দ লিখেছেন—কবি তাঁকে বলেছিলেন--

"এক হিসেবে নারী হচ্ছে Universal, তাদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূলে। দয়া, সেবা, লালন-পালন এতেই তাদের সত্যকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি (কবির কথায় পুরুষ হচ্ছে individualistic) কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। সব নারী মিলে—এক নারী।"

সেই দিনই লেখা 'আরোগ্যে'র ২৩ সংখ্যক কবিতা 'নারী'। সেই কবিতাটি রানী চন্দকে দিয়ে কবি বলেছিলেন—

"তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে দেবতার মতো। যে নারী কর্তব্যকে নিজের মধ্যে নেয়--তার উপরেই পড়ে বিশ্বের সেবার ভার—পালনের ভার। সেখানে নারীরা Universal বিশ্বের পালনী শক্তি তোদের মধ্যেই আছে।"

আরোগ্যের ২২ সংখ্যকে কবিতা সম্পর্কে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর পত্রাংশটি মূল্যবান। উদ্ধৃতিতে ঐ কবিতা রচনার উৎসসন্ধান করা চলে। সুধাকান্ত শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীকে লিখেছিলেন—

"আপনার প্রেরিত কমলালেবু দেখে গুরুদেব যে কী আনন্দ পেয়েছেন সেটা ভাষায় বলতে পারব না। লেবুগুলো দেখেই আমাকে বল্লেন, "বেচারী আমাকে চিঠি লেখে না পাছে আমার পড়তে বা তার জবাব দিতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমার জন্য সর্বক্ষণ ভাবছে।" —কবির নাম স্বাক্ষরিত কম্পিত হস্তাক্ষর সংবলিত ঐ কবিতাটি প্রেরিত হয়। এই কবিতাটি রচনাবলীতে তারিখহীন

কিন্তু গ্রন্থলেখিকা ঐ গ্রন্থে রচনার স্থান নির্দেশ করেছেন শান্তিনিকেতন আর কাল ২৫।১১৪০ বলে উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ নির্ভুল হলে রচনাকালের দিক থেকে এই কবিতাটি 'রোগশয্যায়' কাব্যান্তর্গত হতে পারে। কবিতার বক্তব্যও রোগশয্যারই।

'আরোগ্যে'র উৎসর্গ কবিতাটি কবির শুশ্রূষাকারীদের অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ করকে উদ্দেশ করে লেখা। এই কবিতাটি রচনার ইতিহাস দিয়েছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ রাত্রে কবির সেবার ভার নিয়ে তিনি যখন কবির পাশে ছিলেন তখন প্রায় রাত দুটোর সময় 'অর্ধেক ঘুমের মধ্যে মুখে মুখে' কবি এই কবিতাটি রচনা করেন।

জন্মদিনে-শেষ লেখা (মে, ১৯৪১ , আগস্ট, ১৯৪১)

কবির অশীতিতম জন্মদিনে প্রকাশিত 'জন্মদিনে' কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ। শেষলেখা প্রকাশিত হয় কবির তিরোভাবের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮এর ভাদ্র মাসে। এই কাব্য দুখানির অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু কবিতার আলোচনা কবি নিজে বিভিন্ন সময় করেছিলেন এবং কবিকৃত সেই সব আলোচনা ছড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথায়, কারও কারও দিনপঞ্জীতে, কবির কোন কোন চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে। 'জন্মদিনে'র অনেকগুলি কবিতা সাময়িক পত্রে পূর্ব প্রকাশিত হয় সেগুলি ১৩৪৭ সালের গুরুতর ব্যাধির পূর্বে লেখা এবং কোনও কোনও রচনা সম্পর্কে কবির নিজের আলোচনা ও কবিভক্তবৃন্দের মন্তব্য পাওয়া যায়। জন্মদিবসাশ্রয়ী কয়েকটি কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিকথা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। 'জন্মদিনে'র পাঁচ থেকে আট সংখ্যক চারটি কবিতা মংপুতে রচিত। এই কবিতাগুলির রচনাকালীন ইতিহাস এই রকম—

"জন্মদিন এগিয়ে এল, আয়োজন চলছে, রথীদারা শীঘ্রই আসবেন, উনি খুশি হয়ে অপেক্ষা করে আছেন। পঁচিশে বৈশাখের দু'তিন দিন আগে একটা রবিবার এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হোলো। সকালবেলা দশটার সময় স্নান ক'রে কালো জামা কালো রং-এর জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। উনি ঈশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেইদিন দুপুরবেলা 'জন্মদিন' ব'লে তিনটে কবিতা (৫, ৬, ৭) লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধবৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেলবেলা

দলে দলে সবাই আসতে লাগল—আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজাতে লাগল, গেরুয়া রংএর জামার উপর মাল্যচন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বগায় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল। ঠেলা চেয়ারে ক'রে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনো মনে করি নি। তিব্বতীরা পরালো 'খর্দা' গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে ফুলে আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।"[৮৬]

'জীবনের আশিবর্ষে প্রবেশে'র দিনে 'শৈল আতিথ্যবাসে' কবির জন্মোৎসব পালনের এই যে অতি উপাদেয় বর্ণনা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে মনে হয় জীবনের একেবারে শেষ দিকের জন্মদিনগুলিতে ঐ দিনটিকে পরম পবিত্রজ্ঞানে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে কবি নিজেও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কবির পঁচাত্তরতম জন্মদিন পালন সম্পর্কে যে অনীহার ভাব আমরা লক্ষ্য করেছি তার তুলনায় এই উৎসাহবোধ আমাদের একটু আশ্চর্য করে, কিন্তু এই পবিত্র দিনটি সম্পর্কে কবি-মনোভাব যখন বিশ্লেষণ করি তখন কবি-মানসিকতার ঐ পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারি। কবি এই দিনটিতে যেন ব্যক্তিগত-জীবনের পরিধি অতিক্রম করে একটি বিশ্বজনীনতা লাভ করতেন—নিজের জীবনেও মহামানবের আবির্ভাবের আনন্দ অনুভব করতেন। জন্মদিনের ছয় সংখ্যক কবিতায় আছে—

> এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
> সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন…
> শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
> তাহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
> প্রবেশি মানবলোকে আশিবর্ষ আগে
> এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

জন্মদিন স্মরণের সার্থকতাই এইখানে। আমাদের আলোচ্য পবে সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল চিত্তে কবির শেষ জন্মদিনেব উৎসব এইভাবেই উদ্‌যাপিত হয়েছিল তার কারণ কবি হয়তো ভেবেছেন—তাঁর দেহটি সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁকে সৃষ্টির সার্থকতা মণ্ডিত করে তুলেছে, আনন্দরস সম্ভোগে সহযোগিতা করেছে, সেই

দেহটির প্রতি কবিরও কিছু কৃতজ্ঞতা আছে, তাই শেষ দিকে দু'একটি জন্মদিনে কবি তাঁর স্বদেহসজ্জায় সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন।

কিন্তু এই আনন্দময় জন্মদিনেই কবি সংবাদ পেলেন তাঁর স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বর্ণনা করেছেন—এই সংবাদ শ্রবণে কবি "সমস্ত দিন নীরব রইলেন, কিন্তু সব কাজই চলল। বিকেলবেলা 'মৃত্যু' (জন্মদিনে-৮) বলে একটা কবিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন 'জন্মদিনে' কবিতাগুলোর সঙ্গেই এটাও প্রবাসীতে যাক।"

কবির এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি' প্রিয় মৃত্যু-বিচ্ছেদের যে সংবাদ এসেছে তা কবিকে জীবনের পূর্ণ রূপ উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে—মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে প্রশান্ত উপলব্ধি কবিকে জানিয়ে দিল এরই নাম 'অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম-মৃত্যু এক হয়ে আছে'। সেই কারণেই জন্মদিনের কবিতাত্রয়ীর সঙ্গে 'মৃত্যু' কবিতাটি অখণ্ড সূত্রে আবদ্ধ বলে কবির মনে হয়েছে। জীবনের এই অখণ্ড রূপটির সম্পর্কে জীবনের পশ্চিম সীমায় এসে কবি যে দার্শনিক প্রত্যয়ে পৌঁছুতে পেরেছেন তাতে মৃত্যু সহজ স্বাভাবিক জীবন পরিণাম রূপেই তাঁর কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

'জন্মদিনে' কাব্যের দশ সংখ্যক কবিতা ঐকতান নামে বিখ্যাত। এই কবিতার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু বলেন নি কিন্তু কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্যের সমালোচনারূপে পঠিত হতে পারে, হয়েছেও তাই। প্রগতিবাদীরা খুশি হয়েছেন এই কবিতায় কবি নিজেই তাঁর কাব্যের অপূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন বলে—

> তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
> আমার সুরের অপূর্ণতা।
> আমার কবিতা, জানি আমি
> গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কিন্তু কবির এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিকে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে গ্রহণ করলে ভুল হবে। রবীন্দ্র কবিতা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দূরে রয়ে গেছে, তিনি চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলা, প্রভৃতি মানুষের জীবনে জীবন যোগ করতে পারেন নি তাই ও'পাড়ার মানুষগুলোর কথা তাঁর কাব্যে বলা হল না—ফলে তাঁর সুরের অপূর্ণতা রয়ে গেল, এই ধরনের কথা বলা রবীন্দ্রনাথের মতো মহদাশয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হলেও, আক্ষরিক অর্থে এই উক্তি রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে সত্য বলে মেনে নেওয়ার অসুবিধা আছে; বিশেষ করে

হার্তের কাছেই যখন 'আরোগ্যে'র দশ সংখ্যক কবিতাটি উপস্থিত আছে—'ওরা কাজ করে'। এই কবিতায় কালস্রোতে ভাসমান রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন কবিকে মনে করিয়ে দিয়েছে সাধারণ মেহনতী মানুষ চির অমর—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।···
ওরা কাজ করে,
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।···
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

বিচ্ছিন্নভাবে এইরকম এক-আধটা দৃষ্টান্ত চয়ন করে রবীন্দ্রনাথকে জনগণের কবি প্রমাণ করতে আমরা উৎসাহিত নই, তাহলে কবির সমাজ-সচেতনতা ও সময়-সচেতনতার দৃষ্টান্তরূপে কবির বলিষ্ঠ কণ্ঠের বাণীই আমরা উদ্ধৃত করতাম, 'প্রান্তিকে'র সতেরো সংখ্যক কবিতা, কিংবা শেষ কবিতাটির কথা বলতে পারতাম, কিংবা 'পুনশ্চ' কাব্য থেকে একাধিক কবিতার উল্লেখ করতাম। কিন্তু না, কবিকে যাঁরা 'আইভরি টাওয়ারে'র বাসিন্দা বলে জানেন তাঁদের ভ্রান্তি কবি নিজেই নিরসন করে দিয়ে বলেছেন—

"···লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘর গড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরাজিতে যাকে বলে রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন।. কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মত শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প

লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধা-বুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।”৮৭ [১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৬]

বলাবাহুল্য, কবির এ কথাগুলো তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কেই তিনি প্রয়োগ করেছেন। ছোট গল্পে ছোট ছোট মানুষগুলোর 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা' কবি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা খুব অল্প লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে কাব্য কবিতায়, গল্প-গল্পে কবি কৃষাণের জীবনের শরিক না হলেও কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কবি-কল্পনা ও রসবোধের চোখে কবি পল্লীসমাজের মানুষগুলির নিখুঁত বাস্তব মূর্তিই এঁকেছেন তাঁর সাহিত্যে; তবু জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় কবি যেচে যে পরাজয় স্বীকার করেছেন তাতে কবির অসাধারণ বিনয় প্রকাশ পেলেও, তাঁর উক্তি তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য একথা বলা যায় না। কবির নিজের কাব্য সমালোচনা যে সময় সময় কতদূর পর্যন্ত 'ধূম্রলোচনী' হতে পারে এখানে তারই নিদর্শন মেলে।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-লেখিকার সাক্ষ্য অনুসারে এগারো সংখ্যক কবিতাটি (প্রথম ঐপ্রতি) ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে মংপুতে রচিত হয়েছিল। কবিতাটির পূর্বনাম ছিল 'ঐপ্রতি'। কবিতাটি পড়ে কবির নিজেরই মনে হয়েছিল—'একটু শক্ত হয়েছে, বুঝতে পারা যাচ্ছে না।' তিনি বলেছিলেন—

"আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে কিনা। এই যে ক্ষণিকের জন্য বুদ্বুদের মত আমরা ভেসে উঠছি অসীমকালের প্রবাহের মধ্যে—এ কোথা থেকে আসছে। বিরাট অসীম এক বিশ্বসত্তা। যেন এতটুকু এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বাঁধছে। এসব চিন্তা কিন্তু এত abstract যে কথার frame-এর মধ্যে তাকে বেঁধে ফেলা শক্ত, কিছুতেই যেটি বোঝাতে চাই সেটি হয় না।”৮৮

কবি তাই প্রথম পাঠকে অনেক পরিবর্তিত করেন স্পষ্টতার প্রয়োজনে। অতঃপর এই কবিতা তথা রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা বুঝবার strandard কি তার সম্পর্কে কবি নিজে কিছু আভাস দিয়েছেন। কবিতা লেখা হয় আনন্দদানের উদ্দেশ্যে—এই আনন্দলাভের ক্ষেত্রেও অধিকারী অনাধিকারী ভেদ

আছে বা থাকা উচিত, ওর মর্ম গ্রহণ 'শিক্ষার অপেক্ষা রাখে', যে খুশি সে তার বিচারক হয়ে বসতে পারে না।'

বাস্তবিকই কবির অন্তিম পর্বের কাব্যোপলব্ধির জন্য কাব্যরসবোধই যথেষ্ট নয় সেই সঙ্গে কবির মননজাত অভিজ্ঞতার এই সব ফসলের আস্বাদনে আধুনিক বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান তথা পরমাণুলোক, জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা গ্রহনক্ষত্রলোক, ভূবিজ্ঞান তথা ভূলোক, প্রাণীবিজ্ঞান বা প্রাণলোকের এবং মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ মনোলোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা দরকার। আর এই সব জানতে বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ না করলেও চলে, কবির নিজেরই লেখা 'বিশ্বপরিচয়ের'ই মাধ্যমে বিজ্ঞানের আঙিনায় বিচরণ করলেই কবির কিছু কিছু দুর্বোধ কবিতার অর্থ বোঝা অনেকখানি সহজ হয়। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, কবির শেষ বেলাকার গান বুঝতে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞানই যথেষ্ট নয় দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানও থাকা দরকার—কারণ কবি এই পর্বে বিজ্ঞান থেকে নির্জ্ঞানে সেখান থেকে তত্ত্বজ্ঞানে অনায়াস বিচরণ করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচ্য 'প্রৈতি' কবিতাটি 'বিশ্ব-পরিচয়ে' বর্ণিত 'ভূলোকে প্রাণ চেতনার' আলোকে পাঠ করলে কবির বক্তব্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। 'বিশ্ব-পরিচয়ে' কবি লিখেছেন—

"বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। যোজনা করবার শোধন করবার,—অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালন করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।

মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্মবিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তার প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"

'প্রথম প্রৈতি' কবিতায় কবি বলেছেন—

'কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত ফেনপুঞ্জের মতোই অদেহ-কায়া ধারণ করেছে, সেই কায়া ক্ষণস্থায়ী মায়া মাত্র এবং ঐ কায়ার মধ্যে সত্তার আবির্ভাব

কিভাবে হল তা কবির জানা নেই। সৃষ্টির এই কৌতুকের পিছনে কোন কৌতুকী আছেন কিনা কবি তা জানেন না। তিনি শুধু এইটুকু জানেন সীমাবদ্ধ এই ক্ষণিক সত্তাটুকুকে নিয়ে অসীমের খেলা চলেছে, নববিকাশের সাথে শেষ বিনাশের হেলা—এই খেলার বৈশিষ্ট্য। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে ক্ষণিক সত্তার নিজস্ব আসন এরই মধ্যে পাতা হয়ে গেছে। অনন্ত-অন্তসীমায় তার আবির্ভাব ঘোষণা করেছেন।'

কবিতার ব্যাখ্যায় দেখা গেল সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুষের আসন গৌণ হয়ে গেছে, কবি-কথিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও এই কথাই আপাততঃ মনে হয় বটে কিন্তু একটু গভীরভাবে কবির ব্যাখ্যাটি অনুধাবন করলে 'বিরাট অসীম বিশ্বসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না আর সে ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মননকে মেনে নিয়েও ভারতীয় দর্শনকে স্বীকার করে নিতে হয়।

আসলে সত্তার অপরিজ্ঞেয় রহস্যময়তাই কবির শেষ পর্বের কবিতায় বারবার অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। কবি বারবার প্রশ্ন করেছেন 'কে তুমি' কিন্তু তার 'মেলেনি উত্তর। অসীম প্রশ্নেই রবীন্দ্রকাব্য সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছেছে। কবি মর্ত্য হতে বিদায় নেওয়ার মাত্র দশদিন আগে ২৭শে জুলাই ১৯৪১ জ্বরতপ্ত দেহে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে রহস্যগম্ভীর আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তুলেছেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল—
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,—
কে তুমি মেলেনি উত্তর ॥
বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,—
কে তুমি
পেল না উত্তর ॥

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবির নিজের একটি সকৌতুক মন্তব্য আছে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে। কবি বলেছিলেন,

"জানো, আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বলতো? প্রত্যেকবারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরে দেখি আবার একটা বেরোয়। এ লোকটাকে নিয়ে কি করা যাবে?"৯০

এই লোকটাকেই কবি প্রশ্ন করেছেন—'কে তুমি?' 'শেষ সপ্তকে'র ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতাকে যদি এই কবিতার পূর্বাভাসরূপে গ্রহণ করা যায় তাহলে এই প্রশ্ন ও তার সমাধানহীন রহস্যের কিছুটা অর্থ কবির কথাতেই বুঝতে পারা যাবে।

'আজকের দিনের নাম খাটবে না কালকের দিনে' 'শেষ সপ্তকে'র ঐ শেষ কবিতার বাণীকেই কবি যেন বিস্তারিত করেছেন 'জন্মদিনের' বারো সংখ্যক কবিতায়। কবিতাটি দীর্ঘ তাই উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রলোভন সংবরণ করতে হচ্ছে—নাহলে এই কবিতাটিকে কবির জীবনবাণী বলা চলে। এই কবিতায় কবি তার সুদীর্ঘকালের বাণীর সাধনাকে উপহাস পরিহাস করে 'বহু আবর্জনা বহু মিছে' বলে পিছনে ফেলে চলে যেতে চেয়েছেন সেখানে

যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।

পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে সত্তা-চৈতন্যের মহামিলনের কালে ব্যক্তি-চৈতন্যকে নিঃশেষে বিসর্জন দিতে হয়, সব বাহ্য আবরণ ক্ষয় করে সত্তা-চেতনাকে ভূমানন্দময় করে তুলতে হলে ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটাতে হয়, তখন 'কে তুমি' এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিতে পারলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। ওমর খায়েমের রূপকাখ্যানে আছে—

"পর্বতের তুঙ্গ চূড়ায় অপরিসর সাধন-মন্দির। সুফি সাধক তাহার গর্ভগৃহে (Holy of holies-এ) প্রবেশের জন্য দ্বারে করাঘাত করিলেন—কারণ, 'Knock and it shall be opened to you'. ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল 'কে তুমি?' সাধক উত্তর দিলেন 'আমি!' 'আমি!' "ফিরিয়া যাও—এখানে দুইজনের স্থান নাই।" সাধক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অনেক বৎসর নিবিড় সাধনায় পর আর একবার পর্বতে উঠিয়া মন্দির-দ্বারে করাঘাত করিলেন। আবার প্রশ্ন হইল 'কে তুমি?' উত্তর, 'তুমি!' অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—ভক্তও ভগবান মিশ্রিত হইলেন।"[৯১]

রহস্য সিন্ধুর নৈঃশব্দ্য চূড়ায় উঠে চৈতন্যসাগরে মিশবার আগে তরঙ্গরূপ ব্যক্তিসত্তার সম্পর্কে কবির এই সুগভীর প্রশ্ন—তরঙ্গ সম্বন্ধে, না সমুদ্র সম্বন্ধে, না উভয় সম্বন্ধেই? কিন্তু ঐ কে তুমি প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর আছে, উপনিষদের

ভাষায় যে কথা বলা হয়েছে—'যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' সুতরাং 'আত্মানং বিদ্ধি' 'Know thyself'—নিজেকে জানো। সেই নিজেকে জানলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর সম্ভব নয়। তাই প্রথম দিনের সূর্য যে প্রশ্ন করেছিল তার মেলেনি উত্তর, আবার জীবনান্তে পশ্চিম, সাগরতীরে অস্তগামী রবি যে প্রশ্ন করল তার 'পেল না উত্তর।'

জীবন প্রশ্নের শেষ উত্তর আমাদের না জানালেও কবি যে মনে মনে উত্তরটি পেয়েছেন তার ইঙ্গিত আছে 'জন্মদিনের নয় নম্বর কবিতায় আর আছে 'শেষ লেখা'র শেষ কবিতায়। 'জন্মদিনে'র ঐ কবিতায় কবি বলেছেন,

> মোর চেতনায়
> আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
> অর্থ তার নাহি জানি
> আমি সেই বাণী।

এইখানে কবির জীবনদেবতা তত্ত্বটির কথা পুনশ্চ স্মরণ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'চিত্রা' পর্বে জীবনদেবতার বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখেছি বিশ্বদেবতাই কবির অন্তর্যামী জীবনদেবতারূপে তাঁর মুখে কথা কয়েছেন, কবিকেই বীণা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে তাঁর আত্মকর্তৃত্বকে খর্ব করে নিজ করস্পর্শে বীণারূপে বাজিয়ে চলেছেন—জীবনের অপরাহ্ন বেলাতেও কবি তাঁর সেই প্রাণের কর্ণধারকে ভুলে যান নি, কিন্তু পরিসমাপ্তির পরমলগ্ন যখন সমাগত-প্রায় তখন কবি সবিস্ময়ে দেখলেন তিনি নিজেই 'ওঙ্কার মূরতি'। তাঁর জীবনদেবতা বিশ্বাসের সঙ্গে কে তুমি প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদের শ্রেষ্ঠ পরম সমাধান এসে মিলেছে। যে জীবনদেবতা কবির কাব্যজীবনের ও ব্যক্তিজীবনের নিয়ামক ছিলেন আজ 'সোঽহং' তত্ত্বে তার বিলয় ঘটল, তাই শেষ প্রশ্নের কোনই উত্তর কবির কাছে পাওয়া গেল না। কবির মুখে শেষ জীবনে ঔপনিষদিক ঋষিগণের বাক্যই তাই বার বার ধ্বনিত হয়েছে—কবি নিজেই 'জন্মদিনের' দ্বাদশ সংখ্যক কবিতায়। স্বীকার করেছেন—

> সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
> এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
> মন বলে, আমি চলিলাম,
> রেখে যাই আমার প্রণাম,
> তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
> ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

উপনিষদের ঋষি-কবিগণ যথার্থই অমূল্য উপাদেয় এমন কিছু সম্পদ দিয়ে গেছেন, জ্ঞানের আলোয় যা কবির সকল সংশয় ঘুচাবার কাজে সহায়তা করেছে। এই জন্যই শেষ জীবনে ঋষি কবিদের কথা কবির মনে পড়েছে বারবার। 'জন্মদিনে'র তেরো সংখ্যক কবিতায় আছে—

আজি এ প্রভাত কালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে উঠে আসা এই আকাঙ্ক্ষার শুদ্ধরূপের অভি-ব্যক্তি ঘটেছে ঋষিদের মন্ত্রমূর্তিতে—

হিরণ্ময়েণ পরে কোষে বিরাজে ব্রহ্ম নিষ্কলং
তত্ত্বং পুষণ অপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।

ঋষিকবিদের বাণী, তাঁদের ভাষা, তাঁদের সুর কবির কণ্ঠে তাই এমন অব্যর্থ ভাবে বারবার শোনা গেছে। ঋষিকবিদের মতোই তিনি বারংবার 'আলোক', 'আত্মা', 'আমি', 'চৈতন্য', 'সত্তা', 'মৃত্যু', 'অন্ধকার,' 'প্রাণ,' 'সৃষ্টি', 'পূষণ,' 'অপাবৃত',—প্রভৃতি শব্দ কাব্যে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈদিক ঋষি কবিদের উত্তরাধিকারী এই কবির কাব্য সমগ্রভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অবশেষে আমরা যে সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে পারি তা হল প্রাচীন ভারতীয় ঋষিকবিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, ঋষিদের জীবন সাধনার লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মলাভ, আমাদের এই ঋষিপ্রতিম কবিও জীবনের অন্তিম লগ্নে ব্রহ্মেতে বিলীন হয়েছিলেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ব্রহ্মে তাঁর নিশ্চিত গতি ও চরম প্রত্যয়ের কথা তাঁর সর্বশেষ কবিতার ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, ঐ কবিতার আলোচনা কালে আমরা তা দেখাতে চেষ্টা করবো, তার আগে 'শেষ লেখা'র এগারো সংখ্যক কবিতা সম্পর্কে কবির স্বরচিত সহজ সরল ভাষাটুকু শুনে নেওয়া যাক। এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করার অব্যবহিত পরেই কবি বলেছিলেন—

"রাত্রি হচ্ছে ঘুমে স্বপ্নে অন্ধকারে জড়িত। এই স্বপ্ন মানুষের বুদ্ধিকে দুঃখ দিয়ে বেড়ায়। এই কুহেলিকা যখন সরে যায় তখনি দেখা যায় সত্যের রূপ। আমরা রাত্রিবেলায় থাকি সেই কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে। সকাল চাই কেন। কেন থাকি ভোরের আলোর জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে। ভোরের আলো আমাদের প্রাণে আশ্বাস এনে দেয়। পৃথিবীর সত্যরূপ বাস্তবরূপ দেখায়। তখন আর ভাবনা থাকে না। সত্য কঠিন, অনেক দুঃখ, অনেক দাবী নিয়ে আসে। স্বপ্নে

তা তো থাকে না, কিন্তু তবুও আমরা সেই কঠিনকেই ভালোবাসি। ভালোবাসি সেই কঠিনের জন্য সব কিছু দুঃসহ কাজ করতে। এমনি করে জীবনের দেনা শোধ করে চলি আমরা।···

ধর্ না কেন আমার অবস্থা। এ'কে কি বেঁচে থাকা বলে। আমি তো ঘুমিয়ে আছি। মানুষের রোগ, জরা এসব হচ্ছে কী জানিস? এ হচ্ছে মানুষের শক্তির বিকৃতি। যদি আবার আমি এই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারতুম তবে জীবনের এই দুঃখের তপস্যায় সত্যের দারুণ মূল্য দিয়ে সকল দেনা শোধ করে দিতুম, দিয়ে মৃত্যুর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করতুম।"[৯২]

মৃত্যুর হাতে কবি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ আছে কবির সর্বশেষ কবিতায়। কবির সুদীর্ঘ কবি-জীবনের শেষ রচনা বলেই এই কবিতাটি আলোচনা-যোগ্য তা নয়, ঋষিপ্রতিম কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের চরম ও পরম উপলব্ধি, তাঁর কবিজীবনের ও ব্যক্তিজীবনের সর্বশেষ কথাটি—সত্তার পরম জিজ্ঞাসার চরম উত্তরটি এতে আছে বলেই এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে অনুভূতির প্রগাঢ়তা যে কবিতায় এত বেশি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। এই কবিতার কবিকৃত সাক্ষাৎ কোনও আলোচনা পাওয়া না গেলেও (না পাওয়ার কারণ এই কবিতা রচনাকালে কবি যে দারুণ রোগের কবলে পড়েছিলেন তার জের টেনে কবি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু কবলিত হন—সেই রোগ যন্ত্রণার পরিধি কাটিয়ে কবিতা লেখাটাই আশ্চর্য, তার উপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ—সে অসম্ভব ব্যাপার।) কবিতাটি সম্পর্কে কবি-সমালোচকের পরোক্ষ আলোচনার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

৩০শে জুলাই ১৯৪১ সকালে কবিতার যে অংশ লেখা হয় তার শুরুতে ছিল—

> তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
> বিচিত্র ছলনাজালে
> হে ছলনাময়ী।
> মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
> সরল জীবনে।"

কবিতার শেষে ছিল—

> "কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
> শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
> আপন ভাণ্ডারে।

কবিতার আদিরূপ যে এখানেই শেষ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ রচিত "বাইশে শ্রাবণ" গ্রন্থে। দ্বিতীয় ঝোঁকে অপারেশন টেবিলে নীত হওয়ার (এই সময় কবি এন্‌লার্জ প্রস্টেটের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর উপর বড়ো একটি অপারেশন করা হয়) মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে ঐ দিনই সকালে ৯-৩০ মিনিটে "আরও তিনটি ঐ কবিতার পঙ্‌ক্তি রানীকে (রানী চন্দ) মুখে মুখে বলিয়া বলিলেন—সকালের কবিতাটির সঙ্গে জুড়ে দিস।"[৯৩]

কবিতা রচনার সংক্ষিপ্ত এই ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে প্রথম ঝোঁকে লেখা কবিতাটির সমাপ্তিতে কবিমানস অতৃপ্ত, তাই মনে মনে সেই অসম্পূর্ণ লেখাটির সমালোচনা ক'রে রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ঘটেছে পূর্বোক্ত শেষ তিন পঙ্‌ক্তিতে—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এখানে যে 'ছলনা'র কথা বলা হয়েছে কবিতার সূচনায় সেই ছলনার কর্ত্রী যিনি তাঁকে 'ছলনাময়ী' বলে সম্বোধন করেছেন কবি। কে এই ছলনাময়ী আমাদের মনে সে প্রশ্ন জাগতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রসরণী' গ্রন্থে বলেছেন

'অভিধান ও ব্যাকরণের শাসন যদি গ্রাহ্য করা না যায়, শব্দকে যদি তদর্থে গ্রহণ করিতে হয় তবে ছলনাময়ী যে একটিমাত্র ধারণাকে অবিচলিত ইঙ্গিত করিতে থাকে তাহা বিশ্বপ্রকৃতি।'[৯৪]

আমাদের মনে হয় সমালোচকের এই ব্যাখ্যা যথার্থ। তবে এর সঙ্গে আরও একটু টীকা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে 'কুহক' অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মায়াবাদের উপরেই বেদান্ত দর্শনের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদেও প্রকৃতিকেই মায়াজ্ঞান করতে বলা হয়েছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরঃ।

আবার প্রকৃতিকে মায়া বা ছলনাময়ী বলেই উপনিষদ ক্ষান্ত হননি, মায়ার দুটি রূপের কথাও বলেছেন—

অন্য দেবাহুঃ বিদ্যয়াঃ অন্যদাহুরবিদ্যয়া।

কেউ কেউ বিদ্যা দ্বারা কেউ বা অবিদ্যা দ্বারা মায়াকে ব্যাখ্যা করে। বিদ্যা অর্থে যা ব্রহ্মবোধক ও মোক্ষসাধক এবং অবিদ্যা অর্থে যা বিশ্ববোধক ও ভোগ-সাধক—তাকেই বুঝতে হবে। প্রকৃতি অবিদ্যারূপে শব্দপর কিন্তু ব্রহ্ম শব্দাতীত

তাই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা যায় না। প্রবাদে বলে, 'বোবায় বলে, কালায় শুনে, অন্ধ কি তার মর্ম জানে।' কবি নিজেও ব্রহ্মের অশব্দপর রূপের কথা অন্যত্র বলেছেন। ব্রহ্ম বা সত্যের সেই বিরাট অব্যক্ত অর্থ যেন শব্দের সঙ্গে ছায়ার ছায়া হয়ে লেগে থাকে, শব্দের দ্বারা যা কিছু বলা হয় তা মিথ্যা বা মায়া। কবির কথায়—

এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে
বলি তারে মায়া
যাই বলি শব্দ সেটা অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।

এই শব্দরূপ অবিদ্যার মায়াজাল পেতে কবি দীর্ঘকাল নিজেকেই যেন প্রবঞ্চিত করেছেন—তাই বলেছেন—

করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।

নিজের স্বরূপ পরিচয় ভুলে কবি এতকাল প্রকৃতির ছলনাময়ী রূপের কাছে—তাঁর অবিদ্যা রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর আচ্ছন্ন করে প্রকৃতির নিপুণ হাতে যে মায়াজাল পাতা আছে তার ফাঁদেই ধরা দিয়েছিলেন। আর ধরা দিয়েছিলেন বলেই এত অজস্র সৃষ্টিতে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পেরেছিলেন। 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম'—জগৎ বা বিশ্ব প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ হলেও, ব্রহ্মের সেই রূপ অশব্দগোচর দৃষ্ট বিষয় মাত্র, যেমন বোবার কাছে দৃষ্ট-বস্তুর স্বরূপবোধ ভাষাহীনতায় অপ্রকাশ্য। আজ আসন্ন মৃত্যুর ছায়াতলে জীবনের সত্য-স্বরূপ দর্শনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় নচিকেত-কবি মায়ার কুহক ধরতে চেয়েছেন কারণ তিনি বুঝেছেন মায়ার এ কুহক যে ধরতে পারে, অনায়াসে সে তাঁর ছলনাজাল অতিক্রম করে যায়—

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

আর তখন,

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।

দৈবী মায়া দুরতিক্রম্য, কিন্তু ব্রহ্মের কৃপায় তাকেও অতিক্রম করা যায়। এ বিষয়ে গীতাই প্রমাণ—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েও মায়ার হাত এড়াবার জো নেই। সেখানেও মায়ার ছলনাজাল পাতা আছে। তাই অন্তরের চির স্বচ্ছ আলোয় ব্রহ্ম দর্শন করলেই পরম শান্তি লাভ সম্ভব নয়। ব্রহ্মকে পেতে হলে মায়ার বহস্যাধিকার মুক্ত হয়ে নিজেকেই ব্রহ্মভাবে ভাবিত করতে হয়—'অহং ব্রহ্মোঽস্মি' বা 'সোঽহং' ভাবসিদ্ধ হতে হয়। শাস্ত্রে বলে 'ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম আপ্নোতি'—ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মকে পেতে হয়। আর এই ভাবসিদ্ধ হতে হলে ও শব্দমাত্রকে আশ্রয় করে মনকে আত্মসংস্থ করে স্থির হতে হয়—

'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' গীতায় শ্রীভগবান নিজে এ কথা বলেছেন। সকল প্রসিদ্ধ উপনিষদে ও প্রণবমন্ত্রে উপাসনা করতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্ম ধর্মেও এই একটিমাত্র শব্দই আশ্রয়।

সুতরাং অন্তিমকালে কি ধর্মীয় দৃষ্টিতে, আর কি কবি দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুকেই মায়িক পদার্থ মনে করেছেন, যা মায়িক তা মোহকারী—প্রকৃতি এবং প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শ্রী। সৌন্দর্যও মায়ার ছলনা বলেই শেষ সময়ে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা তথা আত্মজ্ঞান লাভের পথের এই প্রতিবন্ধকের কথা বলা না হলে সর্বশেষ শান্তির শেষ কথাটি না-বলা রয়ে যায়। তাই ঐ কারণের পর অন্তিম ছত্রে শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভের উপায়ের কথা বলে কবির কথা ফুরিয়েছে।

প্রথম যৌবনে পরিহাসের সুরে এক সময় ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি বলেছিলেন—

'হয়ত কোন দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।'

এই পরিহাস বাণীই যে কবির জীবনে শেষ পর্যন্ত সত্য উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের এই জীবন্মুক্তি গীতাকার কথিত ব্রহ্মনির্বাণ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষতম অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে সত্তার পরম জিজ্ঞাসা বিষয়ক কবিতা 'কে তুমি'-র উত্তর মিলেছে। জীবন্মুক্ত কবি অমৃত স্বরূপ

ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মের মায়া অতিক্রম করে মহেশ্বরত্ব প্রাপ্তির চিন্তা করতে করতে তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। জীবনের এই চরম ও পরম উপলব্ধির মুহূর্তে কবি দেখেছেন

সম্মুখে শান্তি পারাবার।

মৃত্যুর তরণীতে পা দেওয়ার অনেক আগেই এই সত্যদ্রষ্টা কবি তাঁর প্রাণের কর্ণধারের কাছে অন্তরের শেষ আকৃতি জানিয়ে রেখেছিলেন[৯৫]

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

আত্মোপলব্ধির সাধনায়—সীমার মধ্যেই অসীমের উপলব্ধির ক্ষেত্রে অসীমের কৃপা, তাঁর ক্ষমা, তাঁর দয়াব মত অত্যাবশ্যক বস্তু আর কি আছে? ব্রহ্মেব কাচে কবির প্রার্থনা মন্ত্রটি যেন প্রাপ্তির আনন্দস্তবেরই রূপ নিয়েছে

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চির সাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুব তারকার।

আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে—আত্মার ধ্রুবজ্যোতির আলোয় পথ দেখে মৃত্যুর অন্ধকার পার হয়ে কবিসাধক জ্যোতির মধ্যগত জ্যোতিতে স্থির হতে চলেছেন। মর্ত্যপ্রেমিক কবি মর্ত্যের অসংখ্য বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়ে কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সব কাজ শেষ করে মর্ত্যেব বন্ধন ক্ষয় করে ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মকে লাভ করলেন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ই আগষ্ট ১৯৪১) দিবা দ্বিপ্রহরান্তে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' এই বাণী শুনতে শুনতে রবীন্দ্রাদিত্য আদিত্যে বিলীন হলেন।

---

১ আত্ম পরিচয়, পৃ. ১০২

২ 'লিপিকা'র একটি রচনার বাক্যাবলীকে আবৃত্তির ছন্দ-অনুযায়ী ভেঙে সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'ভারতী'তে। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৬ শ খণ্ড) পৃ. ৬৫

৩ Poetry and poetic Diction—Wordsworth, English Critical Essays xix. century p. ৮ (১৯৫৬)

৪ ভূমিকা, পুনশ্চ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৬শ খণ্ড) পৃ. ৩

৫ 'গদ্যকাব্য ভাষণ,' 'ছন্দ' পৃ. ২২৫ (১৯৬২)

- ৬ 'কাব্য ও ছন্দ', সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭শ খণ্ড) পৃ. ২৬৬

৭ 'কাব্যে গদ্যরীতি', ছন্দ, পৃ. ২০৭ (১৯৫৭)

৮ তদেব পৃ. ২১০

৯ 'গদ্যকাব্য', সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭শ খণ্ড) পৃ. ২৭১-৭২

১০ 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', কুলায় ও কালপুরুষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পৃ. ৫৩ (১৩৬৪)

১১ চিঠিপত্র, ছন্দ পৃ. ২০৮ (১৯৫৭)

১২ পত্রাবলী—শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা 'দেশ', ১৬ই পৌষ ১৩৬৭

১৩ 'কাব্য ও ছন্দ' সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭শ খণ্ড) পৃ. ২৬৮

১৪ 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', কুলায় ও কালপুরুষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পৃ. ৫৩ (১৩৬৪)

১৫ রবীন্দ্র সরণী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী পৃ. ৩১৮ (১৩৫৭)

১৬ 'গ্রন্থপরিচয়, 'পুনশ্চ' রবীন্দ্র-রচনাবলী (১৬শ খণ্ড) পৃ. ২৩৭-২৩৮

১৭ 'কবিতা' পত্রিকা পৌষ, ১৩৪৮

১৮ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুবাদ কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১৯ 'খৃস্ট', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭ খণ্ড) পৃ. ২৬৮

২০ 'পিতৃস্মৃতি', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃ. ৯৩ এর উদ্ধৃতি থেকে

২১ চিঠিপত্র, ছন্দ পৃ. ২০৮ (১৯৫৭)

২২ তদেব

২৩ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত, 'দেশ', ১৬ই পৌষ, ১৩৬৭

২৪ 'আমার ছন্দের গতি,' ছন্দ পৃ. ২২২ (১৯৫৭)

২৫ চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড) পৃ. ১০২

২৬ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ. ৪৬৩

২৭ 'প্রবাসী' ১৩৫০ বৈশাখ সংখ্যা

২৮ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) পৃ. ৩৫ (১৩৬৩)।

২৯ চিঠিপত্র, (৫ম খণ্ড) পৃ. ১০৩

৩০ ছেলে ভুলানো ছড়া—১, (লোকসাহিত্য), রবীন্দ্র-রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড)

৩১ ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৪

৩২ ভূমিকা, 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৬শ খণ্ড) পৃ. ৫৮৫

৩৩ ভূমিকা, 'ছড়ার ছবি', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২১শ খণ্ড) পৃ. ৫৯

৩৪ 'নূতন কবিতা পাঠের ভূমিকা', প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ

৩৫ ভূমিকা, 'ছড়ার ছবি', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২১শ খণ্ড) পৃ ৫৯

৩৬ চলতি ভাষার ছন্দ, ছন্দ পৃ. ১৩৮-১৩৯ (১৯৫৭)

৩৭ ভূমিকা, 'ছড়ার ছবি', রবীন্দ্র-রচনাবলী (২১শ খণ্ড) পৃ. ৬০

৩৮ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ৯০ (পাদ টীকা)

৩৯ "রূপকথা", 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২ (১৩৫৩)

৪০ সূচনা, 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্র-রচনাবলী (২য় খণ্ড) পৃ. ৩০

৪১ রবীন্দ্র সরণী, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী পৃ. ৩১৯ (১৩৫৭)

৪২ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ৯৮ (১৩৬৩)

৪৩ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ৬৪ (১৩৬৫)

৪৪ পত্রাবলী শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা 'দেশ' ১৩ মাঘ, ১৩৫৭

৪৫ তদেব, 'দেশ' ৬ মাঘ, ১৩৫৭

৪৬ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত সেনগুপ্তের নিকট প্রাপ্ত তথ্য।

৪৭ কবিকথা—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর পৃ. ৫৫ (১ম সং)

৪৮ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ৯৮ (১৩৬৩)

৪৯ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ১৩-১৫ (১৩৬৫)

৫০ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ২০৫

৫১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ ২২৭-২২৮ (১৩৬৫)

৫২ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র, 'দেশ' বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪৮

৫৩ তদেব, 'দেশ', ১১ই কার্তিক ১৩৫৭

৫৪ তদেব 'দেশ' ১৩ই মাঘ, ১৩৫৭

৫৫ গ্রন্থপরিচয়, প্রহাসিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৩ খণ্ড) পৃ. ৫৩৪

৫৬ তদেব, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯।

৫৭ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃ. ২১৫ (১৩৫৭)

৫৮ রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য, ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ পৃ. ২১০ (১৩৫৭)

৫৯ আত্মপরিচয়, (৫ম প্রবন্ধ) পৃ. ৯২-৯৩ (১৩৫৩)

৬০ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ২০৫ (১৩৬৫)

৬১ রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য, ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ পৃ. ১১০ (১৩৫৭)

৬২ রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃ. ২১৬-২১৭ (১৩৫৭)

৬৩ কবিকথা, সুধীরচন্দ্র কর পৃ. ৫৮-৫৯ (১ম সংস্করণ)

৬৪ প্রবাসী, ১৩৪৫ চৈত্র সংখ্যা

৬৫ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ৩৫ (১৩৬৫)

৬৬ তদেব পৃ ৮৫-৮৭

৬৭ তদেব পৃ. ৮৮

৬৮ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ১৪৮ (১৩৬৩)

৬৯ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত 'দেশ' ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

৭০ 'তদেব দেশ' অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

৭১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ৬১ ৬২ (১৩৬৫)

৭২ পত্রাবলী, শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র, 'দেশ' ২৭ ফাল্গুন, ১৩৬৭

৭৩ তদেব 'দেশ' ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

৭৪ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীকে লেখা কবির ১৫ ১.:৩৩৮ তারিখের পত্রের অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত। শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রসদন থেকে পাওয়া

৭৫ 'বাইশে শ্রাবণ', শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ, পৃ ১৬৪ (১৩৬৭)

৭৬ কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৫০

৭৭ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী. পৃ ১৬০-১৬৩ (১৩৬৫)

৭৮ এই কবিতা তথা রবীন্দ্রকাব্যে শাকাম্বর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবিচিত্রায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী কৃত মূল্যবান আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭৯ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ৭৯, ৮১-৮২ দ্রঃ

৮০ তদেব পৃ. ৮৫-৮৬

৮১ তদেব পৃ. ৩৯-৪০

৮২ রবীন্দ্র সরণী (১৭শ অধ্যায়), অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী দ্রঃ

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও ঐ 'একই কাজ করেছেন। দ্রষ্টব্য—পৃ. ২৪১

৮৩ 'নির্বাণ' প্রতিমাদেবী পৃ. ৩৪-৩৫

৮৪ রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ ২৩২ থেকে উদ্ধৃত

৮৫. কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮ শ্রীবুদ্ধদেব বসুর পুস্তক সমালোচনা থেকে উদ্ধৃত

৮৬ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ ২৬১, ২৬৮ দ্রষ্টব্য (১৩৬৫)

৮৭ বাঁকুড়া জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে কবির অভিভাষণ, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ

৮৮ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পৃ. ২৪১ (১৩৬৫)

৮৯ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৪শ খণ্ড) পৃ ৪১১-৪১৪

৯০ বাইশে শ্রাবণ, শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ, পৃ. ২১৯ ২২০ (১৩৬৭)

৯১ প্রেমধর্ম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ. ৩১২ (১৩৪৫)

৯২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরানী চন্দ পৃ. ১০০-১০ (১৩৫১)

৯৩ বাইশে শ্রাবণ, শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবীশ পৃ ২১৬ (১৩৬৭)

৯৪ রবীন্দ্র সরণী, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী পৃ. ৩০৩ (১৩৬৭)

৯৫ 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' গানটি রবীন্দ্রনাথের দেহান্তের পর ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ শান্তিনিকেতন মন্দিরে এবং ৩২শে শ্রাবণ তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গাওয়া হয়। কবির এটাই ছিল ইচ্ছা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র কথায় রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা শেষ হল। ভূমিকায় আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য কি তা জানিয়েছি—আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্য সম্বন্ধে তৎকথিত ও তল্লিখিত যাবতীয় তথ্য একত্রিত করে সুবিন্যস্ত করা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথের মনঃপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ কৃত রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার স্বরূপ নির্ধারণ করা। দীর্ঘ পরিশ্রমে নানা উৎস ও উপাদান অনুসন্ধান করে রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণ আকারেই সংগ্রহ করা হয়েছে। আপাতভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্য আলোচনা বিক্ষিপ্ত এবং তার পরিমাণ খুব অল্প বলে মনে হয়। এই সন্ধানকালে দেখা গেল তা পরিমাণে যথেষ্ট বৃহৎ। পূর্ববর্তী পাঁচ অধ্যায়ে বিন্যস্ত রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনার তথ্যাবলী স্মরণ করলেই রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-বক্তব্যের আয়তনের বিপুলতা সহজেই অনুভব করা যাবে।

সত্য বলতে কি, এই গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে এবং রবীন্দ্র-সদুক্তিকর্ণামৃতই এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্র কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্র উক্তিকে সদুক্তি বলছি তার কারণ বক্তব্যের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্যের আলোচনার গুরুত্ব অসাধারণ। এই গুরুত্বের বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও বিন্যাসকালেই কিছু কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এখন সমগ্রত ঐ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কি তা নিবেদন করা চলে। আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্যালোচনায় প্রধানতঃ পাঁচটি শ্রেণীর রচনা দেখতে পেয়েছি—

এক, কাব্য কবিতার প্রেরণা ও উৎস কথন—কবিতার পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ। কবিতার জন্মকথা বর্ণনা ও কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় দানই এখানে কবি সমালোচকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দুই, কবিতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কবিতার দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় দানই কবি-সমালোচকের এখানে উদ্দিষ্ট। এই সব তত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব, সীমা ও অসীম তত্ত্ব—প্রভৃতি সর্বকালিক তত্ত্বালোচনা যেমন আছে, তেমনি কিছু কিছু স্থানিক ও কালিক (spatio-temporal) তত্ত্বব্যাখ্যা যেমন—বের্গসঁর গতিবাদ, ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রভৃতিও আছে। এই সব তত্ত্বের সঙ্গে কবির কাব্য ও জীবনদর্শনের মূলগত যোগ কবিকথা আশ্রয়ে আমরা যথাস্থানেই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

তিন, কবিতা বা কাব্য বিশেষের অর্থ ও ভাবের ব্যাখ্যা ও আলোচনা। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে 'মানসী' ও 'বলাকা' সম্পর্কে কবির ধারাবাহিক আলোচনা যেমন এই পর্যায়ের স্বকাব্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি কৌতূহলী পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে চিঠিপত্রে বা নানা সূত্রে কবির নিজ কাব্য কবিতার বিক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে।

চার, কাব্যের নূতন রীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রেই রীতির সমর্থনে কবিতার টেকনিক নিয়ে আলোচনা। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ছান্দসিক মনীষিবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই গদ্য কবিতার ছন্দ ব্যাখ্যা কিংবা ছড়ার ছন্দের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য চয়ন করেই টেকনিক সম্পর্কিত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

পাঁচ, বিরূপ সমালোচনার উত্তরে নিজ কাব্য কবিতার বিষয়ে কবি বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। বিরুদ্ধ সমালোচকের ভ্রান্তি নিরসন ও কবিতার যথাথ তাৎপর্য গ্রহণে পাঠককে সহায়তা করাই কবির এই শ্রেণীর কাব্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এ ছাড়া আরও অনেক স্তরবিভাগ হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্য রাখবার জন্য মোটামুটি এই পাঁচটি শ্রেণীর আলোচনাকেই গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাতে চেষ্টা করেছি। প্রথমেই যে শ্রেণীর রচনার কথা উল্লেখ করেছি, বলতে বাধা নেই, স্রষ্টার কাছ থেকে আমরা এই জাতীয় সমালোচনাই আশা করতে পারি—স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রহস্য ব্যাখ্যার প্রয়াস যেমন স্বাভাবিক তেমনি কবিতাকে যাঁরা কবিতা পাঠ করেই বুঝতে চান—বাইরের সমালোচনার উপর যাঁরা নির্ভরশীল নন তাঁদের পক্ষে কবিতার ভাব গ্রহণে কবিতার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দিককার সংবাদ—অনেকখানি সহায়ক হয়। বলা বাহুল্য এ সংবাদ স্রষ্টা এবং কেবলমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন, অপর কোন সমালোচক কবির সাহায্য ব্যতিরেকে এই দিকটির উপর আলোকপাত করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ যদিও তাঁর সব কাব্যকবিতার উৎস ও প্রেরণার সম্পর্কে তথ্যগত পরিচয় দিতে পারেন নি, কিন্তু যেটুকু সন্ধান দিয়েছেন তার মূল্য অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের সৃজনাত্মক সমালোচনার শ্রেষ্ঠ কিছু নিদর্শন আছে এই সব আলোচনায়। এই সব আলোচনা আবার দু জাতের—কবিতা রচনার সমকালীন অথবা অব্যবহিত পূর্ব বা পরবর্তীকালীন এবং কবিতা রচনার দীর্ঘ পরবর্তীকালের লেখা। সমকালীন রচনায় কবিতার পরিচয় যতখানি সার্থক, যতখানি যথার্থ হয়ে

উঠতে পেরেছে, দীর্ঘ পরবর্তীকালের লেখায় সেই পরিচয় তত সার্থক তত যথার্থতা নিয়ে ফুটে উঠতে পারে নি। তার কারণ তখন কবি ব্যাখ্যাকালীন মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিংবা সৃষ্টিকালীন অনেক তথ্যই ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রথম জাতের রচনায় স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের প্রেরণা ও উৎস সন্ধানে, স্রষ্টার অন্তর রহস্য উদ্ঘাটনে সর্বোৎকৃষ্ট আলোচনাকারী যে কবি নিজে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দুঃখ কবির আলোচনা কেন এত অপর্যাপ্ত হল। তা নাহলে 'সোনার তরী-চিত্রা'র, বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার কবি রচিত ভাষ্যের মত আমরা রবীন্দ্রকাব্যের আরোও অনেক ব্যাখ্যা-আলোচনা পেতে পারতাম।

রবীন্দ্রনাথের নিজকাব্য আলোচনায় আর যে শ্রেণীর রচনা বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে তা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কাব্যের মধ্যে যাঁরা দর্শন চান তাঁরা কাব্যের রস বিশ্লেষণ অপেক্ষা কবির জীবনদর্শনের অনুসন্ধানেই অধিক আগ্রহী। এ ব্যাপারেও কবি নিজেই আমাদের অন্যতম ও নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। অবশ্য দেখতে হবে এই ব্যাখ্যা ও আলোচনা বাইরে থেকে আরোপিত পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা কোন তত্ত্বের বসভাষ্যরূপে নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করেছি নিজ কবিতার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কোন আরোপিত তত্ত্বের স্মরণাপন্ন না হয়ে কাব্য প্রেরণার উৎস সন্ধান করতে বসে ভিতর থেকে গড়ে ওঠা তত্ত্ব আবিষ্কার করে মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এবং তারই আলোকে নিজের কাব্য বিশ্লেষণ করেছেন। গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে নিজের খাঁটি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন, কিন্তু নিজ অন্তরে কবি যা সত্য বলে অনুভব করেছেন তাকে বাইরে ব্যক্ত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কবির নিজের কথায় তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আমরা আগেই করেছি—এখানে জীবনদেবতা তত্ত্বটি পুনশ্চ স্মরণ করা চলে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিজীবনের ক্ষেত্রেই নয়—সমগ্র জীবনে—সৃষ্টির মধ্যে ও কর্মের ভিতরে, বৃহৎকালের ভূমিকায় স্থাপিত জীবনে তার তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন—কবির ব্যক্তি-জীবন ও কাব্য-জীবন কোন্ প্রেরণা নিয়ন্ত্রিত তা অনুভব করে অপরকেও বুঝাতে চেয়েছেন। এইরকম আত্মনিরপেক্ষ-আত্মপরিচয় দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। খাঁটি আত্মপরিচয় দিতে হলে কবিকে যেমন মুখ্যতঃ লিরিক আত্মনিমগ্নতার অধিকারী হতে হয়, তেমনি সেই মুহূর্তেই উৎকৃষ্ট সমালোচনা শক্তিরও পরিচয় দিতে হয়—আপনা হতে বাইরে এসে আপনি দাঁড়াতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-পরিচয়

দানকালে আত্মনিরপেক্ষ-আত্মপরিচয়দানে সমর্থ হয়েছেন—তিনি গীতিকবি হিসাবে সৃষ্টির ভিতরের খবর যেমন জানতেন তেমনি সমালোচক হিসাবে সেই খবর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে বুদ্ধি ও যুক্তি গ্রাহ্যও করে তুলতে পেরেছেন। লিরিক আত্মমগ্নতা নিয়ে তিনি একদিকে যেমন জীবনদেবতা অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তেমনি সমালোচকের নৈর্ব্যক্তিকতা আশ্রয় করে সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তত্ত্বাকারে পাঠকের সামনে মেলে ধরতে পেরেছেন। কবি-সমালোচকের এইখানেই কৃতিত্ব।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর আত্মকাব্য বিশ্লেষণের পরিচয় আছে কবিতা বা কাব্যবিশেষের অর্থ ও ভাবের ব্যাখ্যা ও আলোচনায়। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে গুরুদেব হয়তো তাঁর অনেক কাব্যেরই এই রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন কিন্তু সেই সব কবি-কথিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা আমাদের হাতে আসেনি, 'মানসী' কাব্যপাঠের একটি দীর্ঘভূমিকা ও 'বলাকা'র অনেকগুলি কবিতার ব্যাখ্যা ও আলোচনার অনুলিপি এবং ছড়ার ছন্দে লেখা তার নতুন কবিতা পাঠের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এ পর্যন্ত মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে কৌতূহলী পাঠকের নানা প্রশ্নের উত্তরে কবি চিঠিপত্রে নানা জনের কাছে তাঁর বহু কবিতার আলোচনা করেছেন। এছাড়া কবি স্বেচ্ছায় অনুরাগী ভক্ত ও আত্মীয়জনের কাছে পত্রাকারে অথবা মুখে মুখে যে আলোচনা করেছিলেন তাও চিঠিপত্রে বা রবীন্দ্রস্মৃতিকথা জাতীয় রচনায় পাওয়া যায়। কবিকৃত এইসব আলোচনা তাঁর কাব্যের রসাস্বাদনে পাঠককে যথেষ্ট সহায়তা করবে। চিঠিপত্রে বা অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় কবি নিজ কাব্যের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাদের উৎকর্ষ কিছু পরিমাণে পত্র প্রাপক বা আলোচনাকারীর প্রকৃতির উপর যেমন নির্ভর করছে তেমনি কিছুটা রচনাকার্য ও ব্যাখ্যার কালগত দূরত্বের উপরেও নির্ভরশীল। 'বলাকা'র আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত আকারেই আমরা আমাদের বক্তব্য যথাস্থানে ব্যক্ত করেছি—'মানসী'র ভূমিকা বা নতুন কবিতাপাঠের ভূমিকা সম্পর্কেও আমাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। মোটকথা কবির এই জাতীয় আলোচনায় তাঁর কাব্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংবাদ আছে—কবি-লিখিত, কথিত ভাষণের অনুলিখিত রূপ অথবা তাঁর কথা বলে উল্লিখিত রচনায়—তাঁর কবিতা সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান তথ্য আছে যা তাঁর কবিতার রসাস্বাদনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

কাব্যের নতুন রীতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে ঐ রীতির সমর্থনে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা কবি মাঝে মাঝেই বোধ করেছেন। সক্রিয় স্রষ্টার পরীক্ষা-

নিরীক্ষা কালের বিচারে খুবই অভিনব বলে মনে হয়েছিল তাই শুধু সৃষ্টি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি সৃষ্টি বিজ্ঞানকেও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গদ্য কবিতার ছন্দ নিয়ে কবির বিস্তারিত আলোচনার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কবিতার বিচার এক অর্থে কাব্যরূপের বিচার—শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্রকল্প, এবং স্টাইলের বিচার। কবি নিজে তাঁর কাব্যের ছন্দ পরিচয় মাঝে মাঝে দিয়েছেন, অন্যান্য আঙ্গিকের বিচার রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের লেখায় পাওয়া যাবে। আমাদের আলোচ্য বিষয় একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত ও আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কাব্যসৃষ্টিতে আঙ্গিকের অভিনবত্বই দেখান নি, কাব্য জীবনে নতুন নতুন পথেরও তিনিই প্রদর্শক, কারণ নতুন সাহিত্যসৃষ্টির মহৎ প্রতিভা তাঁর ছিল। কিন্তু এই প্রতিভার মহত্ত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকেরই ছিল না। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিমাপ করতে তাই বার বার ভুল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে আজীবন নানা সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন তিনি আনতে চেয়েছেন তার স্বীকৃতি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কদাচিৎ পেয়েছেন, তা স্বাভাবিক বলেই কবির বিশেষ ক্ষোভ দেখা যায় না। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচকেরা যখন অসূয়া পরবশ হয়ে কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থে বা বাহাদুরী নেওয়ার লোভে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছেন তখন কবি মনে মনে বেদনা পেয়েছেন। কখনও সমালোচকের 'রুচির মার', কখনও নীতি বা দর্শনের দিক থেকে আক্রমণের ধার তাঁকে আঘাত দিয়েছে। কবিরা যেহেতু অতিশয় স্পর্শকাতর তাই সমালোচনা কণ্টক তাঁকে বিদ্ধ করেছে কিন্তু তিনি অভিজাত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই এবং নিন্দা প্রশংসায় কিছুটা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছিলেন বলেই প্রথম দু জাতের সমালোচনায় তিনি বিচলিত হননি। কিন্তু নীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন আনার জন্য স্বাভাবিক কারণেই বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা যখন তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে নীতিগত বা সাহিত্যগত প্রশ্ন তুলেছেন তখন কবিকে সেই সব সমালোচনার উত্তর দিতে হয়েছে। কখনও বিরুদ্ধ সমালোচনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, কখনও হয়ত তা করেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতা পাছে দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট বলে নিন্দিত হয় তাই কবি আগে ভাগেই সে বিষয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা অথবা ভূমিকা জাতীয় ভাষ্য লিখে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু সমালোচিত 'সোনার তরী' কবিতাটির ব্যাখ্যা ও কবিকৃত আলোচনার উল্লেখ করা চলে। কবি নিজে ঐ কবিতার ব্যাখ্যায় অযথা তত্ত্বের আরোপ করে

ভাষ্যের দ্বারা সূত্রকেই হয়তো কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, তবু কবির ঐ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, কারণ ঐ কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে কবি ও কবিভক্তবৃন্দের বাদ-প্রতিবাদের সূচনা হয়। বিরুদ্ধ সমালোচনায় 'রুচির মার' সময় সময় কবিকে কতখানি সহ্য করতে হয়েছে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রেভারেণ্ড টমসনের বই ও সে সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া।[১]

সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে কবি কখনও কখনও নিজের কাব্যের অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কখনও বা কবিতার পিছনকার দার্শনিক পটভূমিকার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন দেখা যায়। এবিষয়ে কবির বহু কথিত ও আলোচিত জীবনদেবতা তত্ত্ব কিংবা সীমা অসীম তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা চলে। কবির কাব্য ব্যাখ্যায় এই দুই তত্ত্বের গুরুত্ব কবির নিজের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে কবি লিখেছেন—

"কোনো গীতিকাব্য রচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্য দিয়া বিশ্ব কোন বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণির বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি আপনাকে কোন আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।"

কাব্যসৃষ্টির পিছনে এক বুদ্ধি-অতীত রহস্যময় শক্তির—বিশ্বজগতের প্রকাশ-শক্তির লীলা কবি আপনি অনুভব করে অপরকেও তাঁর অস্তিত্ব বিষয় সচেতন করতে চেয়েছেন। আর এইভাবে নিজের কাব্যের বিচার করতে গিয়ে সৃষ্টি কার্যের মূল কর্তৃত্ব কবি আরোপ করেছেন তাঁর জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সেই বিশ্ব-শক্তি—কবির জীবনদেবতার উপর। কবি বলেছেন—

"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয়

বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।"

এই অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য আবিষ্কারের সূত্রেই কবি উপলব্ধি করেছেন—তাঁর সমগ্র কাব্য রচনাকে একটি তত্ত্বসূত্রে গ্রথিত করা চলে। তিনি লিখেছেন—

"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"

কবির কাব্য ও জীবন দর্শনের এইটিই হল মূলবাণী। এই সূত্রেই কবি তাঁর জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি ধরতে পেরেছেন; এই সূত্রেই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীকে গ্রথিত করতে চেষ্টা করে কবি স্বয়ং রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার পথটিও সমালোচকদের ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কবির নিজের কথাতে বলা চলে—

"আমি ছন্দ-শিল্পী। কাব্য কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি।...

ছন্দেই সৃষ্টি; ছন্দে বিদ্যা ও অবিদ্যায় সীমা ও অসীমের মিলনভূমি! অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম, তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্তার সর্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দেশ করা; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান; সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান।"[২]

আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রকাব্য ও জীবন সাধনা সম্পর্কে সীমা ও অসীম তত্ত্বটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বহু আলোচনার ফলে রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যা অতি সাধারণ কথা হয়ে উঠেছে তা আসলে একটি অসাধারণ কথা। সীমা-অসীম তত্ত্বই রবীন্দ্রকাব্য বিচারের মূল সূত্র আর এই মূল্যবান সূত্রটির সন্ধান দিয়েছেন কবি-সমালোচক স্বয়ং। এই সূত্রেই রবীন্দ্রকাব্য জিজ্ঞাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আছে, আর যেসব তত্ত্ব রবীন্দ্রকাব্য বিচারে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে তা এই মূল তত্ত্ব থেকেই অনুসৃত।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কাব্যের আলোচনার শ্রেণী নির্ণয় শেষ করে অতঃপর রবীন্দ্রনাথকৃত রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার চরিত্র নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্য আলোচনার স্বরূপ কি, তাদের যথার্থ অর্থে সমালোচনা বলা যায় কি না যদি না যায় তবে তাদের প্রকৃতি কি তাই আমাদের বিচার্য। সমালোচনা কি, সমালোচকের কাজ কি, কোন ধরনের আলোচনা সমালোচনা নামের যোগ্য সমালোচক হিসাবে এসব কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না।

সমালোচনা সম্পর্কে—সাহিত্য তত্ত্ব, সমালোচনা তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট আলোচনা করেছেন—"আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিকের নজির নেই যিনি সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এত গভীরভাবে বিচার করেছেন ও এত প্রচুর লিখেছেন, যিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা ও একজন পয়লা নম্বরের সাহিত্যতত্ত্ববিদ।"[৩] বস্তুতঃ রবীন্দ্র কবি-চেতনায় সৃষ্টি ও সমীক্ষা, কাব্য নির্মিতি ও কাব্য নির্মিতিকৌশল পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো নিত্যযোগযুক্ত থেকে কবিকে সার্থকতা মণ্ডিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ সেইসব বিরল মানবদের অন্যতম কবি ও ক্রিটিক সংজ্ঞা যাঁদের সম্পর্কে যুগপৎ প্রযুক্ত হতে পারে। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্য-সমালোচনা—সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই তাঁর সাফল্য বিস্ময়াবহ। কবিজীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভার আত্মপ্রকাশ এই দুই ধারায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র পাতায় তাঁর অঙ্কুরোদ্গত কবি-প্রতিভা যখন সসংকোচে উপস্থিত, তখন থেকেই সমালোচক হিসাবে তাঁর আবির্ভাব এবং এই প্রথম আবির্ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাবয়িত্রী প্রতিভার দুর্জয় আত্মঘোষণা কান পাতলেই শোনা যায়। প্রতিভার উন্মেষ লগ্নে সৃষ্টিশক্তির চেয়ে বিচারশক্তিরই প্রাধান্য লক্ষণীয়। নিজের কবিশক্তিতে যখন আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় নি তখনই নিজের সমালোচনা শক্তির উপর কবির আস্থা এতদূর গভীর হয়েছে যে তিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী সাধকদের কঠোর সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সেইসব সমালোচনায় বয়সোচিত দম্ভ ও ঝাঁঝ থাকলেও কিশোর সমালোচকের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি অগ্রাহ্য করা যায় না। কারয়িত্রী প্রতিভার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবয়িত্রী প্রতিভার ক্রমপরিণত লক্ষ্য করা যায়—অল্প বয়সের সমালোচনার উত্তাপ ও উত্তেজনা কেটে গিয়ে সেই স্থানে মননশীলতা, তত্ত্বরসজ্ঞতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, সৌন্দর্য রসরসিতা এবং বিচারশক্তির প্রখরতা এসে যুক্ত হয়েছে। আকৈশোর বার্ধক্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন শক্তি যেমন অম্লান ছিল, তেমনি তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, সচেতন বোধশক্তি ও সমালোচনা প্রতিভা প্রখর ছিল। রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভার অদ্ভুত প্রাণশক্তি যেমন আমাদের আশ্চর্য করে, তেমনি অপূর্ব মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা সম্পর্কিত আলোচনা-সমূহ। কবিরূপে তিনি যেমন বহু বিচিত্র অজস্র উৎকৃষ্ট রচনার স্রষ্টা, সমালোচক হিসাবে তিনি তেমনি সাহিত্য আলোচনামূলক অত্যুৎকৃষ্ট নানা জাতীয় প্রবন্ধ নিবন্ধের রচয়িতা। সাহিত্য কি, সাহিত্যের নীতি কি, সাহিত্য বিচারের আদর্শ কি এইসব বিষয়ে তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং 'পঞ্চভূত', যাত্রী', 'জাপান যাত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থে সাহিত্য সম্বন্ধে কবির বহু আলোচনা ও মন্তব্য ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। শুধু বাঙ্‌লা ভাষাতেই নয়, বিদেশে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত কবির নানা ভাষণে তাঁর সাহিত্য চিন্তার পরিচয় আছে। সেগুলি একত্রিত করে অনুবাদ করা হলে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আবার শুধু সাহিত্যতত্ত্ব বা সমালোচনাতত্ত্ব বিচারই নয় সেইসব তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য,' 'লোক সাহিত্য,' 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থে ত।র পরিচয় আছে। রবীন্দ্রসাহিত্য সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তাঁর এইসব সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ যেমন অবশ্য কর্তব্য তেমনি সাহিত্য বিচারের তথা সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম স্তর নিজের সাহিত্যসৃষ্টির বিচিত্র প্রেরণার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁব আলোচনা ঠিকমত পড়লে তাঁর নিজের লেখা বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যাবে।

রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিকর্মেব বিচার করতে বসেই সমালোচক হয়ে উঠেছেন অথবা বলা যায় আত্মবিশ্লেষণ আত্ম-সমালোচনা বুদ্ধিসজাগ ছিল বলেই তিনি এত বড়ো সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা কতকটা পূর্ব-সংস্কারমুক্ত হয়ে নতুন সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র সাহিত্য বিচারের একটা মাপকাঠিও রবীন্দ্রনাথের নিজেরই হাতে গড়ে উঠতে পেরেছে। কবি নিজেই যেন নিজের সৃষ্টি-সমীক্ষার মানদণ্ড ইংবেজীতে যাকে বলে 'নর্ম' তা স্থির করে দিয়ে যেতে চেয়েছেন। তার কারণ কবির নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে। ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়।···নিজের ভিতরে যে একটা আদর্শ আছে সেইটাই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা করে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যেভাবে সমালোচনা করা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোক বিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মত বিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি— যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা

হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মতমাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই—তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই।··· আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকম ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তারপরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শিখা যায় না তেমনি ভাল সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে—প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীরভাবে আঘাত করে না বোধ হয় দুটোই খানিকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।”

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আদি পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথও কেন যে সব্যসাচী হয়ে রচনা ও সমালোচনা উভয় কর্মেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার কারণ বুঝা যায় উপরিলিখিত পত্রাংশ পাঠে। আপন সাহিত্য সমালোচনা ও আপন কবিত্ব সত্তার ক্রমবিকাশের কথা তিনিই নিজে লিপিবদ্ধ করে যেতে চেয়েছেন কারণ সমকালীন সমালোচকদের মধ্যে মনন বস্তুর দৈন্য ও সাহিত্য রসবোধের অভাবটা তাঁর বিশেষ করে চোখে পড়েছে। তাই সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও সমালোচনা, বিশেষ করে স্বসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। নিজের কাব্য পাঠককে দেখিয়ে দেবার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। কারণ কবির মতে, ‘যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।’

যৌবনে স্বকাব্য সমালোচনায় যে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় তিনি দিয়েছেন পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত সেই আত্মবিশ্বাস যে তাঁর বজায় ছিল, ঐ বিশ্বাস বরং বেড়েছে তার প্রমাণ পাই ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রীঃ ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির একখানি পত্রে। কবি লিখছেন,

“তখনকার (কৈশোর-যৌবনের) সাহিত্য রাজ্যে রাজত্ব পদার্থটা ছিল খুব হাল্‌কা।, একদল লোক পিঠ চাপড়ে বলেছে বাহবা, সেটা আকস্মিক সেটা মুখ্য কথা নয়, সম্পূর্ণ আমার নিজের গরজে লিখেছি, কোনো বারোয়ারি বাহবা এই কথাটাকে ছাড়িয়ে ওঠবার মত জোর পায়নি—নিন্দেও ছিল নিতান্ত ফ্যাকাশে। জোর ফরমাস ছিল না, লেখায় আনন্দ ছিল ডুব-সাঁতারের আনন্দ, ডাঙা থেকে মুরব্বির দল ঘন ঘন সাবাস বলে ওঠেনি। তার ফল

হয়েছে এবং তার মূল্য কতখানি, হয়তো এখনো তা নিশ্চিত বলবার সময় হয়নি। যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা নিশ্চিত ভালোই এই বিশ্বাসের পরে জোরে সাবল মারবার কোনো ধাক্কা তখন ছিল না, এই আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কোনো ধ্রুব আদর্শ যে আছে এখনো তার প্রমাণ হয় নি। কেমন করে হবে। আজ দেখতে পাচ্ছি এ বেলায় যাঁরা সমজদার সেজে আইন জারি করে বেড়াচ্ছেন ওবেলায় তাঁদের তকমা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটুকু বুঝেছি এই পুঁথি পাড়ার বাজারদর হিসেব করে যাঁরা নতুন খাতা খুলে কারবার ফেঁদেছেন তাঁদের অদৃষ্ট চলেছে চোখে ঠুলি দিয়ে।"[৪]

সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য বিচারের যুগল প্রতিভা নিয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বসাহিত্য সমালোচনার উপর সুগভীর আস্থার পরিচয় উপরের চিঠিতেও পাওয়া গেল। এবারে দেখা যাক নিজের কাব্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিচারের কি জাতীয় মাপকাঠির প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনাকে কখনো বলেছেন বিচার, কখনো বলেছেন ব্যাখ্যা, কখনো আবার পরিচয় বলেছেন। এই পরিচয়ের আবার নানা প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করা চলে ; যথার্থ সমালোচনা কখনো কখনো কবির কাছে মনে হয়েছে পূজা, সমালোচককে তিনি বলেছেন পূজারি পুরোহিত। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তাঁর কৈশোর পর্বের কাব্য সম্পর্কে যে স্মৃতিচারণ করেছেন তার অনেকখানিই উন্মেষ পর্বের কাব্য আশ্রয়ে কবির 'স্বরচিত কাব্য কথা', কিছু অংশ অবশ্য অতি কঠোর সমালোচনার পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকাতে নিজের কাব্যের ভূমিকা জাতীয় আলোচনাই আছে কোথাও কোথাও একটু কঠোর সমালোচনার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কাব্য সমালোচনায় বিচার বা মূল্যায়নের যে ভাব আছে তার জন্য প্রয়োজন বিচার্য কাব্য হতে বিচারকের বিচ্ছিন্নতা—উন্মেষ পর্বের কাব্যালোচনায় সেই বিচ্ছিন্নতা সম্ভব হয়েছে বলেই কবি বাল্য কৈশোরের অপরিণত রচনাগুলির মূল্যায়নে অনেকখানি সফলতা দেখাতে পেরেছেন। তবে তাঁকে সময় সময় যে অতি কঠোরতার পরিচয় দিতে দেখা যায় তার কারণ, আমাদের অনুমান, স্বকাব্য সমালোচনায় কবির অনেক উক্তিই অযোগ্য সমালোচকের প্রতিকূল সমালোচনায় ব্যথিত স্পর্শকাতর লেখকের উক্তি। নতুবা নিজের বাল্য-কৈশোর-রচনার প্রতি কবিমাত্রেরই মনে কিছু করুণা, কিছু মমতা থাকেই ; কবির নিজেরও যে বাল্য রচনায় প্রতি সেইরূপ স্নেহদৃষ্টি ছিল না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবু নিজের কৈশোর রচনার

তিনি যেরূপ বিরূপ সমালোচনা করেছেন তার কারণ অপরের কঠোর সমালোচনার কথা কবি হয়তো মনে রেখেছেন কিংবা যে 'মুডে' কাব্য লেখা সেই 'মুডে' কবিতার বিচার না করে কৈশোরের কাব্যকে প্রৌঢ় বয়সের সুপরিণত রচনার সঙ্গে সমশ্রেণীয় করে সেই মানে তার বিচার করতে চেয়েছেন, ফলে রচনাগুলির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। বাল্য-কৈশোরের কাব্য বিচারে তত্ত্বগতভাবে সমালোচক সুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা দেখাতে পারলেও নানা কারণে 'নিষ্কাম বিচারের লাইন' যে এখানে ঠিক থাকে নি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সাহিত্য সমালোচনায় বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটিই প্রধান কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকাব্য সমালোচনায় পরিচয় ও ব্যাখ্যার গুরুত্বই যেন বেশী। কবি নিজেই বলেছেন—'বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য', 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা'। এইজন্য নিজের কাব্য সমালোচনায় যে কাজটি করা কবির পক্ষে সহজ সেই পরিচয় দানের কাজেই কবি বেশী লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য এই পরিচয় নানা প্রকারের—রচনার ভাবগত ও রূপগত; রচনার জন্মগত তার প্রেরণা ও উৎসের পরিচয়, রচয়িতার অন্তর্জীবনের পরিচয় প্রভৃতি। আমরা লক্ষ্য করেছি নিজ কাব্য আলোচনায় এই পরিচয়মূলক সাহিত্য বিচারেই কবির কৃতিত্ব অধিক।

রচনাবিশেষ যখন পাঠকের কাছে সমস্যার আকার নিয়েছে, কিংবা বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য তা বিকৃত রূপলাভ করেছে, বা যখন বুঝেছেন কবিতার ঠিক তাৎপর্য গ্রহণে পাঠকের অসুবিধা হবে তখন সেই অসুবিধা দূর করার জন্য কবি তাঁর কাব্য ব্যাখ্যার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কৌতূহলী পাঠক যেক্ষেত্রে রচনা বিশেষ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন—তা সে যৌক্তিক হোক কি অযৌক্তিক হোক, সঙ্গত বা অসঙ্গত হোক, তখন সেই সব প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে কবি তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা করেছেন দেখা যায়। এই ব্যাখ্যা কখনও কবিতার অর্থ বা ভাবসম্পদের ব্যাখ্যা, কখনও দার্শনিক কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সেই দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যার সঙ্গে লেখকের জীবন দর্শনের যোগ কবির নিজের কথাতেই পরিস্ফুট হয়েছে। কখনও দেখি সমগ্র সাহিত্য রচনার সঙ্গে রচনাবিশেষের যোগসূত্রটি কবি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রেও নিজের বক্তব্য বিচার বা বিশ্লেষণ নয়, রচনার উপাদান উপকরণ কিংবা রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করাই কবি-সমালোচকের উদ্দেশ্য। নিজের লেখার যথার্থ সমালোচনা নয়, রচনার তথ্যাত্মক ব্যাখ্যা, রচনা সম্পর্কে নানা সংবাদ পরিবেশনের দিকেই

লেখকের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনায় ব্যাখ্যার গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী, পরিচয়ের স্থান তার পরে এবং বিচার একেবারেই গৌণ। তাঁর স্বকাব্য আলোচনা বিচারমূলক হয়েছে বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে কবি যখন আত্মপক্ষের সমর্থনের জন্য নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করছেন অথবা গ্রন্থরচনার বহু পরে যখন গ্রন্থ-ভূমিকা লিখছেন যেমন, 'ভানু সিংহঠাকুরের পদাবলী' সম্পর্কে কবির বিচারমূলক মন্তব্য।

সাহিত্য সমালোচনায় বিচারের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাই 'সাহিত্য সমালোচনা' শব্দটির পরিবর্তে 'সাহিত্য বিচার' কথাটির ব্যবহারে। সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব আলোচনায় সাহিত্য বিচার শব্দটি কবি বহুবার ব্যবহার করেছেন। এই সাহিত্য বিচারের কাজে সমালোচকের যে সব গুণ ও যোগ্যতার কথা বলেছেন তাতে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপটি চিনতে পারা যাবে। তিনি বলেছেন, "রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে" অর্থাৎ রসগ্রাহিতা সমালোচকের প্রথম ও প্রধান গুণ। তিনি আরো বলেছেন, 'সমালোচকেরা সাহিত্য কারবারীদের মুচ্ছদ্দি—তাদের নিজের পুঁজিপাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না।" সমালোচকের আর দুটি গুণ তাঁর 'সাহিত্যজ্ঞান ও পরখ করার শক্তি'। 'সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়' অর্থাৎ সাহিত্য অনুশীলন এবং সাহিত্য বিচারের স্বাভাবিক প্রতিভা এ উভয়ই প্রয়োজন যথার্থ সমালোচনার কাজে। বিচারকের নিরপেক্ষতা আর একটি প্রধান লক্ষণ—আর তার জন্য প্রয়োজন দলমত পরিত্যাগ করা কারণ "যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষ কালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।"

অবশ্য সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে সাহিত্য বিচার সম্ভব নয় তাই সাহিত্য বিচারে বিচারকের ভালো লাগা, মন্দ লাগারও একটা মূল্য আছে কিন্তু সেইটাই রস পরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা নয়; প্রচলিত সমালোচনায় ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা কথা দুটি যেরকম শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়, ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন তার সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে থাকে তাতে করে সাহিত্য বিচারে ভুলভ্রান্তি ঘটা স্বাভাবিক। এইজন্য সাহিত্য বিচারেরও একটা মানদণ্ড থাকা দরকার। অনেক পড়াশুনা করে, সাহিত্যের নিত্য বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করে এই মানদণ্ডটি গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই মানদণ্ডও নির্ভুল, ধ্রুব কোন আদর্শ নয়। সাহিত্য যেমন সজীব পদার্থের মতো ক্রমবিকশিত শিল্প—সাহিত্য বিচারের

মানদণ্ডটিও সেই রকম সজীব পদার্থ হওয়া চাই—দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে তা পৃথক হতে বাধ্য। তাই কবি সমালোচক বলেন—

"এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তা হলে শান্তি রক্ষা হয়। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা। সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্য রসেই।"[৫]

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে সমালোচক মহলে মতান্তর থাকলেও তা যে সাহিত্য হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সাহিত্য রসাস্বাদনের যে স্বাভাবিক ও অসামান্য ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং বহু অধ্যয়নজাত যে সাহিত্য বিচারশক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন, সেই সঙ্গে রসসিদ্ধ এই কবির যে আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও কবিপ্রতিভা ছিল তাতে সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তাঁর অগ্রপথিকরূপে এক্ষেত্রে আমাদের মনে আসবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বঙ্কিমের সাহিত্য সমালোচনা-মূলক রচনার স্বল্পতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এইজন্য ক্ষেত্র বিশেষে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য সমালোচনায় অদ্বিতীয় বলে মনে হয়েছে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের কাব্য-নাটকের আলোচনায়। সাহিত্যের রসাস্বাদনের সঙ্গে ক্লাসিক কবি কালিদাসের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ পূজার অর্ঘ্য নিবেদনে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র কালিদাসবিষয়ক প্রবন্ধগুলি অসামান্য সাহিত্য সমালোচনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। "মেঘদূত" "শকুন্তলা" প্রভৃতি আলোচনা সাধারণভাবে আস্বাদনাত্মক হলেও ভিতরে ভিতরে যুক্তি শৃঙ্খলা যথেষ্ট আছে। যেমন নিজ কাব্য বিষয়ে তেমনি অপরের কাব্য বিচারেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনায় মূল্যায়নের ভূমিকাটি সব সময়ে গুরুত্বলাভ করেনি। কিন্তু তাই বলে কবি যে বিচার-বিমুখ ছিলেন না তার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র' বা 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধেই আছে। চিঠি পত্রের মধ্যে সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন কবি তাতেও তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির পরিচয় আছে। কবির সঙ্গে রসের সমভাগিতাই কাব্য সমালোচনার মূল লক্ষ্য বলে কবি বিবেচনা করেছেন, এইজন্য রসের উপভোগ্যতা তথা কাব্যের রসাস্বাদনের উপরেই কবি সারাজীবন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবির প্রথম জীবনের কাব্য সমালোচনায় কাব্য রসোপভোগের সাহায্যে কাব্য বিশ্লেষণ চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা

যায় আর সেইভাবে কাব্যের প্রাণরসকে তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চণ্ডীদাসের কবিতার রসাস্বাদনের কথা স্মরণ করা যায়, চণ্ডীদাস পদাবলীর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস' প্রবন্ধ আজও অনতিক্রান্ত রচনা হয়েই আছে। বিচার বুদ্ধি ও রসবুদ্ধির সম্মিলনে কোন উৎকৃষ্ট সমালোচনা সম্ভব তার নিদর্শন 'লোকসাহিত্যে'র "ছেলে ভুলানো ছড়া।" মঙ্গল কাব্যাদির আলোচনায় তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কঠোর বিচারশীলতার প্রমাণ রয়েছে প্রথম যৌবনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সমালোচনায়। এই কঠোর সমালোচনার জন্য কবি পরে দুঃখ প্রকাশ করে বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের মহত্ত্বের প্রশংসা করেছেন কিন্তু ঐ কাব্য সম্পর্কে আপন মতামত বিসর্জন দেননি।

কিন্তু সাহিত্য সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথ কতো বড়ো তার বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্যের আলোচনার স্বরূপ বিচার। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উপরে লিপিবদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা সুধী সমালোচকের অনুসরণে ব্যাখ্যা করা যায়। সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রধানতঃ সৃজনধর্মী, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্রিয়েটিভ ক্রিটিসিজম্'। "বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক পন্থায় (judicious criticism) অথবা বিষয়গত যাথার্থ্যের (objective criticism) রীতি অনুসরণ করে সাহিত্য বিচার রবীন্দ্রনাথের ধাতুপ্রকৃতির অনুকূল নয়। নিজস্ব ভাবানুষঙ্গের রঞ্জনে আলোচ্য শিল্পবস্তুকে রঞ্জিত করে তাকে আস্বাদ করা—যাকে এক প্রকার নতুন সৃষ্টি বলা যায়, যাকে একাধারে impressionistic, expressionistic, intuitive সমালোচনার বিচিত্র সমাহার বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচার পদ্ধতি তারই সার্থক দৃষ্টান্ত।"[৬]

অপরের সাহিত্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনাত্মক সমালোচনা রচনার পারদর্শিতা সর্বজন স্বীকৃত—সৃজনধর্মী বলেই তাঁর সমালোচনা নিজেই রসাত্মক। সাহিত্যের সমালোচনাকে সাহিত্য করে তোলার দিকেই তাঁর ঝোঁক। কিন্তু কবির নিজের কাব্যের স্বকৃত সমালোচনা কোন জাতীয় রচনা সেকথা কি সমালোচক, কি কবি কেউই স্পষ্ট করে বলেন নি। রসপথের পথিক যে কবি তিনি নিজের কাব্যের রস-পরিচয়ে যে সমালোচনা লেখেন তাও সৃজনধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক। আর সেক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সব অভিমত যদি আমরা গ্রহণ নাও করি তবুও সেইরকম আলোচনায় নিজস্ব একটা

সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। সেই সাহিত্য মূল্যের কথা মনে রেখেই আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য সম্পর্কিত যাবতীয় মন্তব্য একত্র সংগ্রহ করেছি। একথা আমাদের অজানা নেই যে, যিনি অপরের সাহিত্যের সুস্পষ্ট সমালোচনা লিখেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার রসবিচারে চরম লেখা লিখে যেতে পারেন নি। সেটা সম্ভবও নয় কারণ যিনি স্বয়ং স্রষ্টা তিনি সুসমালোচক হলেও তাঁর নিজের পক্ষে নিজের লেখার সমালোচনা করা প্রায় অসম্ভব। যেহেতু সেইরূপ সমালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"পাঠক যে ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে এ কাজ করা যায় না।"[৭]

নিজের রচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে না পারলে নিজের লেখার সমালোচনা করা সম্ভব নয়, অথচ সেইরকম বিচ্ছিন্নতা সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। এইজন্য কবির কাছ থেকে তাঁর নিজের কাব্যের যথার্থ সমালোচনাটি আশা করা উচিত নয়। তবু রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনা আদৌ মূল্যবান কিছু নয় একথা মনে করলে ভুল হবে। এ জাতীয় আলোচনার গুরুত্ব আমরা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করেছি আমরা দেখিয়েছি— রবীন্দ্রনাথের বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা বাইরের সহায়তা ব্যতিরেকেই বুঝা যায়—তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যক্ত করে। এইসব কবিতার রসোপলব্ধির জন্য সমালোচকের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন সব সময় অনুভূত হয় না। কবির নিজের লেখায় তাঁর চিঠিপত্র বা অন্যান্য রচনায় কিংবা আলোচনায় নিজের কাব্য বিষয়ে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত যেসব মন্তব্য পাওয়া যায় তারা কবির কাব্যের উপরেই শুধু আশ্চর্য আলোকপাত করে না সেই সঙ্গে কবির অন্তর্জীবনের রহস্য সন্ধানেও আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করে—বাইরের সমালোচনার কল-কব্জা দিয়ে যাকে ধরা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেইসব তথ্যের আলোকে তাঁর কতকগুলি কাব্য কবিতার ব্যাখ্যা অনেকখানি সহজ হয়েছে। দ্বিতীয়ত:, মহৎ সাহিত্য শুধু বাইরের সৌন্দর্য নিয়েই সত্য নয়—মহৎ বক্তব্য, গভীর জীবনদর্শন থেকেই তার উদ্ভব—সেই জীবনদর্শনই তাঁর শিল্প প্রেরণার উৎস, তাঁর রসবোধের ভিত্তি। নিজ সাহিত্যের এই জীবনদর্শন কবি স্বয়ং যতখানি সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পেরেছেন অপর কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচকের পক্ষেও বাইরে থেকে তা

ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কবির নিজের মুখে তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়ায় আমাদের আরো লাভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির প্রতিভা—যার বিশালতা ও গভীরতার সীমা নেই এবং কোনও স্থির নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে যাকে ধরা যায় না, তেমন প্রতিভার পরিমাপ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই কারণেই রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমায়—রবীন্দ্র প্রতিভার উৎস ও নিয়ন্ত্রী শক্তির সন্ধানে রবীন্দ্রনাথকেই অন্যতম পথ-প্রদর্শক গুরুরূপে বরণ করতে হয়। কবির আত্ম-প্রকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার যে যাত্রা কবি স্বয়ং শুরু করেছেন 'জীবনস্মৃতি', 'আত্ম পরিচয়ে' তাকে পূর্বাহ্নে বুঝে নিতে পারলে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলব্ধি সহজ হবে, কারণ কবির অন্তর্জীবনের 'রেকর্ড' হিসাবেই তাঁর কাব্যের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত চিন্তা ও ভাবনাসূত্র নিয়ে রবীন্দ্রকাব্য জগতে প্রবেশ করতে পারলে রবীন্দ্রকাব্য বুঝবার কাজ অনেক সহজ হবে—কবির বক্তব্য নিরপেক্ষ না হতে পারে কিন্তু তাঁর কাব্য সম্পর্কে তাঁর নিজের সাক্ষ্য এমন অপূর্ব কিছু উপাদানের সন্ধান আমাদের দিয়েছে যা রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নিজের কাব্যালোচনায় অধিকাংশ সময়ই রবীন্দ্রনাথ যদিচ স্রষ্টার নিজস্ব দৃষ্টিকোণটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেইভাবে দেখাকেই একমাত্র দেখা বলে কবি-সমালোচক দাবী করেন নি, সময় বিশেষে পাঠকের দৃষ্টিকোণ হতেও নিজ কাব্যের দোষ গুণ নির্ণয়ে কবিকে সচেষ্ট হতে দেখা যায়। এইভাবে কখনও স্রষ্টার, কখনও সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে নিজের কাব্যের আলোচনা ও বিচার করে কবি একই সঙ্গে নিজের আত্মপরিচয়, ও কাব্যপরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন। অবশ্য সর্বত্র যুগপৎ এই দুই দৃষ্টির ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি কিংবা ধারাবাহিকভাবে নিজের কাব্যের আলোচনাও করেন নি, তাই রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য আলোচনা অংশতঃ স্রষ্টার আত্ম প্রকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন অংশতঃ সাহিত্য-সমালোচনা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্য পাঠে রবীন্দ্রনাথকে সব সময় আমরা পথ-প্রদর্শকরূপে পাব না; কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কাব্যের স্বকৃত আলোচনা পাই সেখানে পাঠকের কাছে রবীন্দ্রকাব্য পাঠের অন্যতম পথ-প্রদর্শক গুরুরূপেই তিনি অবস্থান করবেন। কবির মনের ক্রমবিকশিত রূপটি তাঁর কাব্যে কিভাবে ধরা পড়েছে, কাব্যের মধ্য দিয়ে কবিমানস কিভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে তা তিনি অনেকখানি সুস্পষ্টভাবেই আমাদের ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। রবীন্দ্রকাব্য রসাস্বাদনে পাঠককে সহায়তা করতে কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যের অল্প বিচার, কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেমন করেছেন তেমনি রচনার জন্ম-

গত ও রচয়িতার অন্তর্জীবনের পরিচয় দিয়ে কবিমানসের স্বরূপ উপলব্ধিতে আমাদের পথ নির্দেশ করেছেন।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থে কবি-মানসের উদ্ঘাটনে আমরা দেখলাম 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তাঁর কাব্য কবিতায় প্রকাশের যে অস্ফুটতা, অপূর্ণতা ছিল, যা ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে কবি-সমালোচকের কলমে তাকেই যেন কতকটা পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তবে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তাঁর কবি-জীবনের যে ব্যাখ্যান রেখে গেছেন—যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন আমরা তাকেই তাঁর উন্মেষপর্বের কবিজীবনীর সব কথা বলে মেনে নিতে পারিনি, সেই কারণে গ্রন্থ-বহির্ভূত, অপরিণত এবং কবি কর্তৃক অস্বীকৃত কিংবা বিস্মৃতির চরম দণ্ডে দণ্ডিত রচনাকেও আমরা মূল্যবান মনে করে তাঁর প্রথম কবিতা থেকে শুরু করে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তিনি যেখানে যা কিছু মন্তব্য করেছেন তা একত্রিত করে তাঁর উন্মেষ পর্বের অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর কবিজীবনী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি।

কবি-প্রতিভার উন্মেষপর্বে কবির উপর যুগশ্রেষ্ঠ কবির প্রভাবের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কারণ "প্রতিভার প্রথম বিকাশ যুগরীতির অনুকরণের মধ্য দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাবসম্পদ ও রীতি বৈশিষ্ট্যের আত্মসাৎকরণের দ্বারাই স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা নিজ জয়যাত্রা আরম্ভ করে।"[৮]

রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষপর্বেও রবীন্দ্রনাথের উপর সেই যুগের শক্তিমান কবির প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিজেই কিছু স্বীকারোক্তি রেখে গেছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের যুগরীতিকে তিনি ভুলে ছিলেন, বিহারীলালকে তিনি সজ্ঞানে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি অনুযায়ী 'কড়ি ও কোমল' রচনার আগেই তাঁর কাব্য থেকে বিহারীলালের প্রভাব সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে রবীন্দ্র কবি-মানসে সূক্ষ্মভাবে বিহারীলালের প্রভাব 'কড়ি ও কোমল'-এর পরেও অনুভব করা যায়। সমালোচকের সুচিন্তিত অভিমত—'বিহারীলালে যে সৌন্দর্যবাদের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে তাহারই প্রতিষ্ঠা।'[৯] রবীন্দ্রনাথ নিজে এই প্রভাবের বিষয়ে 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধে যেটুকু আলোচনা করেছেন তা পর্যাপ্ত বলে স্বীকার করা চলে না। অবশ্য কবি স্বীকার করেছেন, বিহারীলালের কাব্যের ত্রুটিগুলিই কবিকে শিল্প-সচেতন করে তুলেছিল, তাই কাব্য বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শেলী ও কীটসের মতোই রবীন্দ্রনাথ "স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট,

অমার্জিত আতিশয্য রুচিবিকার হইতে মার্জিত, রুচিবিশুদ্ধ সংযম, ভাবালুতা হইতে প্রগাঢ়, মর্মোৎসারিত ভাবানুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।"[১০]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি-প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে কবির আলোচনা যেমন যথাযথ তেমনি কিছুটা পূর্ণাঙ্গ। উন্মেষপর্বে যে সৌন্দর্যবাদকে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র বলেছি—এই অধ্যায়ে কবির কথা অনুসরণে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই সৌন্দর্যবাদ ক্রমশঃ পরিণত ও গভীর হয়েছে—কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মী ক্রমে জীবনদেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। কবির ব্যাখ্যা অনুসরণে এই অধ্যায়ে তাঁর কবিতা আলোচনার তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তিটিও আবিষ্কার করেছি। কবি কথা অনুসরণে জীবনদেবতা তত্ত্বের উদ্ভব হতে ক্রমবিকাশ এবং শেষ পরিণতির আভাস দিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি কবির মানস-সুন্দরী জীবনদেবতা এবং বিশ্বদেবতা মূলতঃ এক এবং অভিন্ন—এঁদের মধ্যে aspect এর তফাৎ, attitude-এর পার্থক্য থাকলেও এদের অন্তর্নিহিত ভাবটি এক।

রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূলসূত্র—সীমা ও অসীম এর মিলন সাধনের চেষ্টার কথাও এই অধ্যায়ে আমরা কবির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যেই বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আমরা দেখিয়েছি—কবি এই পর্বে 'রিয়াল' ও 'আইডিয়াল'—বাস্তব ও আদর্শের দ্বন্দ্বের সামনে এসে ক্রমে সেই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছেন এবং সীমা ও অসীমের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনেও কখনো কখনো সক্ষম হয়েছেন।

এই পর্বের কাব্য কবিতার পাশাপাশি সমকালীন চিঠিপত্রগুলিকে কালানুক্রমে সাজাবার ফলে কবির নিজের লেখায় কবিতা রচনার যে পটভূমি পাই, সেই পশ্চাৎপট বিশ্লেষণে তথ্য ও তত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধনের ফলে কবিকৃত যে আলোচনা পেয়েছি তাতে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব বিশ্লেষণ ও বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কবি যথার্থই সৃষ্টিশীল সমালোচক হয়ে উঠেছেন। মোটকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত রবীন্দ্রকাব্যের পরিণতি পর্বের মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য—সৌন্দর্য-সম্ভোগ তথা প্রকৃতি-প্রীতি, জীবন-দেবতা তত্ত্ব তথা রবীন্দ্রকাব্যের মূল প্রেরণাদাত্রী শক্তি এবং বাস্তব সচেতনতা তথা রবীন্দ্রকাব্যের মানবপ্রেমের কথা কবির নিজের কথাতেই যথাসম্ভব ধরে দিতে চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রকাব্যের পরিণতি পর্বের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই পর্বের কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পর্কে কবির নিজের আলোচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এই পর্বে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভক্তিরসের সংশ্লেষে কাব্য বহু ক্ষেত্রেই অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। 'নৈবেদ্য-

খেয়া-গীতাঞ্জলি' পর্বের কবিতার এই অন্তর্মুখিনতাই কবিকে হয়তো এই পর্বের কাব্য কবিতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত রেখেছে। তাই এই পর্বের কবিতাবলী কবির একান্ত অন্তরের কথা বলেই কবি সেই সম্পর্কে মিতভাষী হয়েছেন।

কবি স্বয়ং এই পর্বের ভক্তিরসাত্মক গূঢ়ার্থপূর্ণ কাব্য বোঝাবার চেষ্টা না করে কাব্য রচনার বাহ্যিক বিষয়ের আলোচনাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন দেখা যায়। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ আমাদের বর্তমান আলোচনার এক্তিয়ার বহির্ভূত তাই এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে সংক্ষিপ্ত যে মন্তব্য সংগ্রহ করেছি তার থেকে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি পঞ্চাশোর্দ্ধ কবি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য কবিতার ইংরেজী অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন বটে কিন্তু ঐ আকস্মিকতার পিছনেও জীবনদেবতার অদৃশ্য হাত ছিল। এবিষয়ে কবি সচেতনভাবে যাই ব্যাখ্যা করুন, কবির অবচেতন মনে য়ুরোপের সাহিত্য সভায় নিজের আসনটি কোথায় তা যাচাই করার একটা ইচ্ছা যে সুপ্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই পর্বের কাব্যালোচনায় তথ্য হিসাবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কবির নোবেল পুরস্কার লাভ। কিন্তু কবি স্বয়ং এই পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন নি, তার কারণ, কবির সুস্পষ্ট অভিমত নোবেল পুরস্কারের দ্বারা কোনও রচনার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না।

তাছাড়া নোবেল পুরস্কার কবির ভাগ্যে অবিমিশ্র প্রশংসাই জোটায় নি, সেই সঙ্গে তাঁকে স্বদেশে বিদেশে যথেষ্ট সমালোচিতও করেছে। তারই ফলে 'গীতাঞ্জলি' ও নোবেল পুরস্কারকে কেন্দ্র করে স্বদেশে ও বিদেশে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল কবিকে তা স্পর্শ করলেও বিচলিত করতে পারেনি। সেই সব প্রশংসা যতই মূল্যবান অলঙ্কার হোক কবি তাকে 'অতিশয়োক্তি অলঙ্কার' বলেছেন এবং যেন বলতে চেয়েছেন 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।' নিজ কবিত্ব শক্তির প্রতি কবির অটল বিশ্বাস ছিল বলেই—'গীতাঞ্জলি'তে বিশ্ব-দেবতার পদে নিজেকে সমর্পণ করে, সকল অহংকার চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়ে কবি নিজের কাজের মাঝে বিশ্বদেবতার ইচ্ছাকে সফল করে তুলতেই উৎসাহিত হয়েছেন। তাই আর পাঁচজন কবি সাহিত্যিক পরিণত বয়সে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়ে যেমন নির্বাপিত হয়ে যান আমাদের কবির কবিত্ব-প্রতিভায় সে রকম ভাঁটার টান দেখা না দিয়ে বরং জোয়ারজলেই কবিত্বের সোনার তরী ভেসে চলেছে। ফলে বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনাথের হাতে যৌবনে পৌঁছেই শেষ হয়ে যায়নি, প্রৌঢ় পরিণতির ঐশ্বর্য-মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রকাব্যের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি। সেই সঙ্গে এই পর্বের একখানি কাব্য 'বলাকা' সম্পর্কে কবির প্রায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পেয়ে কবির নিজের কাব্য ব্যাখ্যা ও আলোচনার রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পেরেছি। 'বলাকা'র কবিকৃতি আলোচনার অনুলেখক শ্রদ্ধেয় ৺প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের মুখে শুনেছি—কবিতা আলোচনার আগে কবি সম্পূর্ণ কবিতাটি একবার আবৃত্তি করে নিতেন। কবির কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ও পাঠের বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি শ্রোতার মনে সহজেই একটি রসাবেশ সৃষ্টি করত। এইভাবে শ্রোতাকে রসাস্বাদনের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে কবি যেদিন যে কবিতাটি ব্যাখ্যা করবেন তার রচনার স্থান ও কালের অর্থাৎ পশ্চাৎ পটের পরিচয় দিয়ে ঐ কবিতার উৎস ও প্রেরণার কথা কিছু বলার থাকলে বলে নিতেন, তারপর প্রতিটি শ্লোক অর্থাৎ স্তবকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন এবং এইভাবে কবিতার আলোচনা শেষ করে কবিতার মধ্যে দুর্বোধ্য বা টীকা-টিপ্পনীযোগ্য কোনও অংশ থাকলে তার সহজ অর্থটি ধরিয়ে দিতেন। শ্রোতাদের মধ্যে অবাঙালী কেউ কেউ থাকায় কবি মাঝে মাঝে দু একটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করতেন। এইভাবে সমঝদার পাঠক হিসাবেই নিজের কবিতার নিজেই রসস্বাদন ও রসবিশ্লেষণ করে কবি অপরকে কবিতার রসোপভোগে সহায়তা করতেন। কবিতা-বিশেষ কি হয়েছে বা হয়নি এই জাতীয় কোন রায় দিতেন না অর্থাৎ কবিতা সমালোচনায় রসোপভোগ ও রসবিশ্লেষণ এই দুটির উপরেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিতেন, নিজের কবিতা বলেই হয়তো মূল্যায়নের উপর তেমন গুরুত্ব দিতেন না। কবি-সমালোচকের বিশ্বাস ছিল রচনা-বিশেষের পরিচয় দেওয়াও সাহিত্য সমালোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। 'বলাকা'র কবিতা আলোচনায় কবি এই আদর্শই অনুসরণ করেছেন, অন্যান্য কাব্য-কবিতার আলোচনাতেও কবি হয়তো এই আদর্শকেই প্রধানতঃ মনে রেখেছেন।

'বলাকা'র মূলসুর বলে যে গতিতত্ত্বের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, কবি নিজে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এই গতিতত্ত্বে ফরাসী দার্শনিকের প্রভাবের কথাও আলোচনা করেছেন। সীমা-অসীম তত্ত্বে বিশ্বাসী কবি গতি ও স্থিতির সমন্বয়ের সত্যেই যে অধিক আস্থাশীল তা কবির নিজের কথাতেই পরিস্ফুট হয়েছে।

এই পরিণতি পর্বের আর একখানি কাব্য 'পূরবী'র কবিকৃত বিস্তারিত ভাষ্য আশ্রয়েই কবির লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে জীবনদেবতার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আমরা

সমর্থ হয়েছি। রবীন্দ্রকাব্যের প্রৌঢ় প্রেমচেতনা ও পরিণত প্রকৃতিচেতনার কথাও কবির নিজের কথাতেই 'মহুয়া' ও 'বনবাণী' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ কবির কাব্যের মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য—জীবন-দেবতা-চেতনা, প্রেম-চেতনা ও প্রকৃতি-চেতনার পরিচয় এই পর্বের কবিকৃত আলোচনা আশ্রয়েই নেওয়া গেছে।

আমাদের আলোচনায় রবীন্দ্রকাব্যের দীর্ঘতম পর্ব পঞ্চম অধ্যায়টি। সত্তরোত্তর কবির কাব্যে স্বাভাবিক কারণেই পরিপক্কতা লক্ষ্য করা গেছে—তাঁর কবিতা যে ক্রমেই প্রৌঢ়ত্ব লাভ করেছে সেকথা কবি নিজেই বলেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই শেষ পর্বেও কবি নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ছন্দমিল বর্জন করে গদ্য কবিতা লেখায় মন দিয়েছেন কবি, এই পর্বের সূচনায়। অবশ্য গদ্য ছন্দ সম্পর্কে কবির বিস্তারিত আলোচনা সত্ত্বেও আমাদের সন্দেহ থেকে গেছে 'পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজির মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা,' গদ্য কবিতার উপর কবি নিজেই যে শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেন নি তার প্রমাণ কবির শেষ জীবনের লেখা অজস্র ছন্দ-কবিতাতেই আছে। তবে রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা নিরূপণে পরীক্ষা হিসাবেই গদ্য কবিতার আবির্ভাবের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। এই গদ্য কবিতার ভাষাই রবীন্দ্রকাব্যকে শেষ পর্যন্ত এই পর্বের শেষদিকে যে কবি-ভাষায় পৌঁছে দিয়েছে তাতে একদিকে ভেতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতার প্রকাশ যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে সংযমিত সংক্ষিপ্ত কবিতাগুলির অপরূপ কবিভাষার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই শেষ পর্বের কবিতা দিয়েই রবীন্দ্রকাব্য বুঝে নেওয়ার সুযোগ হয়েছে—কবিতার ভাষা এত স্পষ্ট যে তার আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আশ্রয়েই আমরা এই অধ্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, কবি-জীবনের এই সর্বশেষ পর্যায়ে একদিকে রবীন্দ্রনাথের আত্মমুখী মন সত্তাচেতনার রহস্য আবিষ্কারের দিকেই নিজেকে যেমন মগ্ন রেখেছে, অন্যদিকে কবির মানবমুখী মন বাইরের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছে। জীবন-সায়াহ্নে আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ কবি একদিকে যেমন নিজের সত্তার মধ্যেই মহাচৈতন্যের আবরণ উন্মোচনের সাধনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বকীয় ভঙ্গিতে সমাজ ও যুগজীবনকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। সত্তর বৎসর বয়সে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে কবি তাঁর কাব্যের মানবমুখিনতার কথা এই বলে বুঝিয়েছেন—

"আমার সব অনুভূতি এবং রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ—রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।"[১১]

কবি মানসের এই দ্বিমুখী ক্রিয়াশীলতা আমরা এই পর্বের কাব্যালোচনায় লক্ষ্য করে যথাসম্ভব কবি-কথা আশ্রয়েই তাকে পরিস্ফুট করেছি। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি কি আত্মজিজ্ঞাসায় আর কি জীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-কাব্যের এই সর্বশেষে পর্বটি বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী এবং তা রবীন্দ্রকাব্যের সুপরিণতির পরিচয়বাহী। সীমার মধ্য থেকেই অসীমের সঙ্গে মিলন সাধনের যে পালাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য ব্যাখ্যাকালে তাঁর কাব্যসাধনার একটি মাত্র লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন আমরা দেখেছি কবি-জীবনের পরিসমাপ্তিতে কি আশ্চর্য সার্থকতার সঙ্গে কবি তাঁর কাব্য-সাধনার সেই শেষ ঠিকানায় এসে পৌচেছেন। ব্যক্তে এবং অব্যক্তে, রূপে এবং অরূপে, সীমায় এবং অসীমে বিশ্বচৈতন্যকে উপলব্ধি করে কবি যেমন সার্থক হয়েছেন, কবির নিজের কথায় তাঁর কবিমানসের সেই ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করে আমরাও তেমনি কৃতকৃতার্থ হয়েছি।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদে ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা সভায় সভাপতির ভাষণে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেন—কবিই তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ টীকাকার কিনা। অভ্যর্থনার উত্তরে কবির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'কবিতা রসমাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ'—অনেকটা এই মতের অনুমোদন করে বলেন—

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—আনন্দরূপের অমৃত বাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে জলে স্থলে ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে রূপে সঙ্গীতে নৃত্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন করে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন করে নেওয়াটা ব্যক্তিভেদে কিছু না কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কতরকম ক'রে বুঝেচে, সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষের যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর একজন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠক শ্রেণীর। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কি কথাটি বলচে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে—যারা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই।"[১]

রবীন্দ্রকাব্য কি কথাটি বলছে তা শুনবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সমালোচকদের কাছে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ শিরোধার্য করেও আমরা এসেছিলাম রবীন্দ্রনাথেরই কাছে, কারণ কবি হিসাবে কাব্যসৃষ্টি করে সমঝদার পাঠক হিসাবে তার রসাস্বাদনও তিনি করেছেন এবং তাঁর কাব্য উপলব্ধির জন্য অপরের দ্বারস্থ না হওয়ার পরামর্শও তিনি কখনও কখনও দিয়েছেন। এছাড়া কবির নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে সম্পূর্ণ করে শুনবার ক্ষমতা সমালোচকদের নেই। রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে তাই সমালোচকদের কথা শুনবার পরেও বা তার আগেই কবির নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁর নিজের কোন কথা থাকলে তা শুনে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে। সেইজন্যই রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের কাছেই বার বার এসেছেন সমালোচনার সূত্র সন্ধানে এবং কবি-প্রদত্ত সূত্র তাঁর কাব্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার কার্যতঃ রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্র পরিচয়েই পর্যবসিত হয়েছে। আমরাও গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজারই মতো রবীন্দ্র কথায় সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

---

১ Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist—এডওয়ার্ড টমসনের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে একাধিক পত্রে কবি ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ৩রা আষাঢ়, ১৩৩৪ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন—

"আমার সঙ্গে টমসনের কথাবার্তা যা কিছু হয়েছে কোনো ছাপার বহিতে তার গতি হবে এমন আশঙ্কা মনেও উদিত হয়নি। সেগুলো যে আমাকে দেখিয়ে নেবে এমন মানুষই ও নয়।"

৮ই এপ্রিল, ১৯২৭ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে কবি লিখেছিলেন—

"নিজের সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধিকে আমি কখনোই অন্ধ করতে চাইনে—আমার শুভ বুদ্ধির বিরুদ্ধে যে অন্ধকার কখনো আসে না এতবড় স্পর্ধা করা চলবে না—

কিন্তু প্রায় মাঝে মাঝে স্থির হয়ে বসে আমি নিজেকে নিজের বাইরে ফেলে তাকে অপর পক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে দেখে থাকি। টমসনের বইয়ে তেমনি নিরাসক্তভাবেই আমি নিজেকে দেখবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলুম। কিন্তু পদে পদে যেটা আমাকে আঘাত করেছে সে হচ্চে সমস্ত বইয়ের ভঙ্গীটা। কোথার আশঙ্কার লেশমাত্র নেই পাছে বিষয়টার প্রতি অবিচার করা হয়। অথচ অবিচারের সম্ভাবনা পদে পদেই। কারণ বাংলা ভাষা টমসনের ভাষা নয়।...কিন্তু এমন উদ্ধত নিঃসংশয়তার সঙ্গে তিনি আমার রচনা সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন যেন বাংলা ভাষায় তাঁর দৃষ্টির কোন বাধা নেই।"

টমসনের বিরূপ সমালোচনা কবিকে এতদূর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ করেছিল যে কবি সাধারণতঃ যে কাজ করতে কুণ্ঠিত হতেন, সেই প্রতিবাদের কাজেও তাঁকে নামতে হয়েছিল। প্রবাসী ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছদ্ম নামে কবি স্বয়ং 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রেভারেণ্ড টমসনের বহি' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

২ ১৯২৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কলকাতা সিনেট হলে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন, 'প্রবাসী' মাঘ, ১৩৩২।

৩ সূচনা, 'ব্যক্তিত্ব', শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত পৃ. ১-২ (১৩৬৭)

৪ ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিটির জন্য 'ছিন্ন পত্রাবলী' পৃ. ৫৩৩ দ্রষ্টব্য এবং ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত কবির পত্র 'প্রবাসী' চৈত্র, ১৩৫৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

৫ সাহিত্য বিচার, সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (২৭শ খণ্ড) পৃ. ২৭৩-৭৪

৬ 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' (১ম) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ সূচনা, নৌকাডুবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী (৫ম খণ্ড) পৃ. ১৬৫

৮ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১ (১৩৬৭)

৯ 'বিহারীলাল ও সৌন্দর্যবাদের সূত্রপাত' 'কাব্যবাণী' ডঃ ভবতোষ দত্ত পৃ. ৫৭

১০ রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ২ (১৩৬৭)

১১ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা কবির পত্র

১২ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪

———

নির্ঘণ্ট

অক্ষয় চৌধুরী ৭
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৯, ১৪০
অক্ষয় বড়াল ১৮৪
'অক্ষমা' ৭৯, ৮১
'অচলিত সংগ্রহ' ৯
অজিতকুমার চক্রবর্তী ২৯, ৫৬, ৯৯, ১০০, ১০৮, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২৩২, ২৭৩
'অতিথি' ২৫৯
'অতীত ও ভবিষ্যৎ' ১৪
'অত্যুক্তি' ১১
'অদেখা' ২৫৯
'অনাদৃত' ৭৫
'অন্তর্যামী' ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৩
'অন্তর্হিতা' ২৫৯
অপরাজিতা দেবী ৩৩৪
'অবচেতনার অবদান' ৩২৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯২, ২৯৩, ৩ ৮
'অবসর সরোজিনী' ৭
'অবসাদ' ৮, ৯
'অবুঝ মন' ২৮০, ২৮১
'অভিলাষ' ১০, ১৭
'অভিসার' ১৩৮
অমিত রায় ২৮৪, ২৮৫, ২৯০, ৩৫০
অমিয় চক্রবর্তী ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬
'অশেষ' ১৫০, ১৫১, ১৫৬
'অসময়' ১৫৬
অসিত হালদার ২২৫
'আকাশ প্রদীপ' ৩৩৭-৩৪২
'আকাশের চাঁদ' ৭৭
'আত্মপরিচয়' ৫৭, ৮২, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১১৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ২০০, ২১৫
'আধুনিকা' ৩৩৪
আন্না তরখড় ১৪, ১৫
আর্নল্ড, ম্যাথু ২
'আবির্ভাব' ১৬৬-১৬৭
আবু সয়ীদ আইয়ুব ৩১৩
'আমার কাব্যের গতি' ৩০৯
'আরেক দিন' ২৮০, ২৮১-৮২
'আশঙ্কা' ২৫৯
আশুতোষ চৌধুরী ৪৮, ৪৯
'আহ্বান' ২৪৩, ২৫৫-১৬
'আহ্বান গীত' ৫১
ইংরেজি গীতাঞ্জলি ২০১, ২০৩
ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু. বি. য়েটস' ২০৪
ইন্দিরা দেবী ১০৩, ১২৩, ২০৬, ২০৭, ২১৫, ২৪৯, ২৭৪, ৩১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩৭৯
'উজ্জীবন' ২৬৬-২৬৭
'উৎসর্গ' ৩৬, ১৩০, ১৯২-.৯৬
'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' ২৮৩
'উদ্‌বোধন' ১৬০, ৩৪৭
উপহার ২৫, ৫৯
'উর্বশী' ১১২

এণ্ড্রুজ. সি. এফ. ২৩০
'এবার ফিরাও মোরে' ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯
এর্লা ভিতাল ২৩০, ২৩৬
এলিয়ট, টি. এস্. ২, ৩, ৩০৪
'এষা' ১৮৪
'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' ১৫৩
ওয়ার্ডস্বার্থ ২, ১০১, ২৯২
ওয়ালেস ১০০
'কড়ি ও কোমল' ৫, ৪০, ৪৩, ৪৭-৫৪ ৫৬, ৬৮, ১৭৮, ১৮১, ২৮৫
'কণিকা' ১৩৪-১৩৫, ২৬২
'কথা' ১৩৯-১৪৫
'কথা ও কাহিনী' ১৩৫-১৩৯
'কবি' ১৬২
'কবি ও কবিতা' ২৩৮
'কবিকথা' ৩৪৭
'কবিকাহিনী' ৮, ১৪-১৮
'কবির বয়স' ১৬২
'কবির ভণিতা' ১৩৫, ১৪৪
'কর্মফল' ১৬২, ১৬৩-৬৪
'কল্পনা' ১৪৯-১৫৬, ২৭৯
কাদম্বরী দেবী ৫১, ৬৪, ১৮১, ১৮২, ২২৩
কানিংহাম ১৫৩
কার্জন, লর্ড ১১
কালান্তর ২১৯
কালিদাস ৬২, ২৪৫
কালিদাস নাগ ২৫৮
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৫৩
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৭-১৮
'কাব্যগ্রন্থ' ১৮৭
কাব্য-গ্রন্থাবলী ২৪, ২৫, ১০৪, ১২৭, ১৬৫
'কাব্যপরিক্রমা' ১০০
'কাহিনী' ১৪৫-১৪৯
কীটস ১৬, ২৯২
'কুটিরবাসী' ২৭৭
কৃষ্ণ কৃপালনী ৫২, ২০১
'কেন' ৩৫০, ৩৫১
কৈলাস মুখুজ্যে ৩৪০
'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' ৪৩
কোলরীজ ২, ৬১, ২৯২
ক্রমবিবর্তন বাদ ৮১
ক্ষণিকবাদ ১৬১
ক্ষণিক মিলন ৫০
'ক্ষণিকা' ৫, ১৫৬-১৬৭, ২৫৬, ২৫৭
ক্ষতিপূরণ ১৬২, ১৬৪
ক্ষিতিমোহন সেন ২২২, ২২৩
'খাপছাড়া' ৩১৭-৩১৮
'খেয়া' ১৯৬-২০১, ২৭৩
'খেলা' ২৫৫, ২৫৭
খ্রীষ্ট ১১৭
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০৮
গদ্যকবিতা ২৯১-৩০২
'গদ্যকাব্য' ১৪৪
গান্ধীজী ২৪৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৯১
'গীতবিতান' ৪৭, ৩৪৭

'গীতাঞ্জলী' ৪, ২০২-২১৩, ২৩৭, ২৪২, ২৪৬, ১৯১
'গীতালি' ২১৫, ২২৬, ১৭৯
'গীতিমাল্য' ২১৩
'গীতোচ্ছ্বাস' ৫০
'গুরুগোবিন্দ' ১৪১

গ্যেটে ২
গোবিন্দদাস ৪২
'গৌড়ী রীতি' ৩৩৫

'চঞ্চলা' ২৩১
চণ্ডীদাস ৪৪, ৪৫, ৩৯৮
চন্দ্রনাথ বসু ৯২, ১৫৯, ১৬১
'চামেলি বিতান' ২৭৭
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯, ৭২, ১২৩, ১২৪, ১৫৪, ২২৬, ২২৮
'চিঠিপত্র' ৪০
'চিত্রা' ৬৩, ৮৪, ৯০, ৯৩-১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৫৩
'চেয়ে থাকা' ৩৬
চৈতন্য ১১৭
'চৈতালি' ৩৭, ৯০, ১২৭-১৩৬, ১৩৬, ১৫০

'ছড়া' ৩২১-৩২৬
'ছড়ার ছবি' ৩১৮-৩২৬
'ছন্দ' ৩২৬
'ছবি' ২২৩-২২৫, ২৫৬
'ছবি ও গান' ৩৬-৪০, ৪৮
ছান্দোগ্য উপনিষদ ১০৫, ১১২
ছিন্নপত্র ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৯৭

'ছুটি' ৩১৪
'ছেলেবেলা' ৩২০, ৩৩০, ৩৪১
'ছেলেভুলানো ছড়া' ৩১৯, ৩২৪, ৩৯৮

জগদীশচন্দ্র বসু ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ২৭২, ২৭৩
'জন্মদিন' ৩৫১
জন্মান্তর ১৬২, ১৬৩
জয়দেব ৪২
জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১১, ৭২, ১৬৪
জীবনদেবতাতত্ত্ব ৯৩-১১৫
'জীবন মরণ' ২৩৩
'জীবনস্মৃতি' ৫, ৭, ৯, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৭৩, ৭৭, ৮৩, ৯১, ১০০, ১৭৫, ১৯৫, ৩৪০, ৩৬১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১১
'জ্ঞানাঙ্কুর' ১২
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' ১২

'ঝড়' ২৫৮
'ঝড়ের খেয়া' ২৩৮
'ঝুলন' ৮৭, ৮৮

'টমসন' ৯৬, ৩৮৮
'টলষ্টয় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' ১৬২
টেনিসন ১৮৫

ডাউডেন ১২১
ডারউইন ৮১, ১০০
ড্রাউডেন ২

'তথ্য ও সত্য' ১৪০
'তরী বোঝাই' ৬৯, ৭১
'তত্ত্ববোধিনী' ১১
'তাজমহল' ২২৭-২২৮
'তীর্থযাত্রী' ৩০২, ৩৭৪
তেজেশচন্দ্র সেন ২৭৫, ২৭৭
'তে হি নো দিবসাঃ' ২৮০, ২৮২
'দরিদ্রা' ৭৯, ৯১
দান্তে ২
'দাসী' ১২২
দি ক্রিসেণ্ট মুন ১৯২
দি চাইল্ড ৩০২
দিলীপকুমার রায় ৪৯, ২৭৯, ৩৩৫, ৪০৫
'দুই নারী' ২৩, ২৩৩
'দুই পাখী' ৭৭, ৭৮
'দুই বোন' ২৩, ৩০৬
'দুঃখ' ২১২
'দুঃখ সঙ্গিনী' ৭
'দুঃসময়' ১৫৬
'দুরন্ত আশা' ৬১
'দেউল' ৭৫, ৭৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২, ১০৫, ১০৬, ১৭৫, ২১০, ২১১
দেশ নায়ক ১৯৯
'দেশীয় রাজ্য' ১৯৯
'দেশের উন্নতি' ৬১
'দেহাতীত' ৩১৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১০৩
দ্বিপদী ২৬১
ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৯৬, ২৯৯, ৩০৭
'ধূলা মন্দির' ৭৬
নন্দলাল ২৬৯, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৭, ৩২২, ৩২৫
'নবজাতক' ৩৪২
'নবজীবন' ৪৬
'নববর্ষা' ৬২
নবীন সেন ১১
নরহরিদাস ১৭৭
নলিনী দেবী ৭৪
'নাটক' ২৯৮
'নিঃস্ব' ৩১২
'নিদ্রিতা' ৭৪
নিবারণ চক্রবর্তী ২৮০, ২৮৫, ২৯০
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ২৯, ৩০, ২২৯
'নির্ঝরিণী' ২৬৯-২৭০
নির্মলকুমারী মহলানবিশ ৫৮, ১৫৭, ২৫০, ২৬৪, ২৭১, ২৯৮, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৭২, ৩৭৭
'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ৮৪, ২৯০
'নিষ্ফল উপহার' ১৪২
'নিষ্ফল কামনা' ৬৭
'নিষ্ফল প্রয়াস' ৬৩
নীতীন্দ্রনাথ ১৮৩, ১৮৪, ৩০৫
নীহাররঞ্জন রায় (ডঃ) ১২৯, ৩৪২
'নূতন কাল' ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫
'নূতন কবিতা পাঠের ভূমিকা' ৩২০
'নৈবেদ্য' ৮৭, ১৭৩-১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৬, ১৯৭
'নৌকাডুবি' ১৯

'পতিতা' ১৪৬-১৪৭
'পত্রপুট' ৩১৪-৩১৬
'পথপ্রান্তে' ২২৮
'পথিক' ২৪৬-২৪৭, ৩১৭
'পবিত্র জীবন' ৫১
'পবিত্র প্রেম' ৫১
'পরশ পাথর' ৭৭, ১৪৫
পরিমল গোস্বামী ২৬২
'পরিশেষ' ৫, ২৭১-২৮৬, ২৮৯
'পলাতকা' ২৪৬-৪৭, ৩১৭
'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ৩১৪, ৩১৫
'পাড়ি' ২৪৪
'পাত্র পাত্রী' ৩১৭
'পান্থ' ২৮৩
'পাপের মার্জনা' ২৩৯
'পুনর্মিলন' ৩২
'পুনশ্চ' ৫, ২৮৯-৩০৭
'পুরস্কার' ১৫, ৮৫, ৯৫
'পুরাতন' ৫১
'পুষ্পাঞ্জলি' ১৮২
'পুঁটু' ১৩৪
'পূজারিণী' ১৪৩
'পূর্ণতা' ২৫৩-৫৪
'পূর্ণিমা' ৩৮, ১২১
'পূরবী' ২২, ২৩৬, ২৫২-২৬০, ২৬৩, ২৬৫
'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' ১৫
'প্রকৃতির খেদ' ১০, ১১
'প্রজাপতি' ৩৪৯
'প্রতিধ্বনি' ৩২, ৩৩
'প্রতিবিম্ব' ১১
প্রতিমা দেবী ২৯৮
প্রথম শোক ১৮২
প্রদ্যোত সেনগুপ্ত ২২২, ২২৩, ২২৬, ২৩৪ (পা. টী.), ২৩৫, ২৪১, ৪০৪
'প্রবাহিণী' ২৫৯
'প্রভাত উৎসব' ৩১
প্রভাতকুমার ১২২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭, ২০, ৪৬, ১২১, ১২৮, ১৩৭, ১৮৪, ৩২৩, ৩২৫, ৩৫০
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৩১২
'প্রভাত সংগীত' ২৮-৩৬, ৩৭, ৪৮
প্রমথ চৌধুরী ৩৯, ৪৯, ৬২, ৬৯, ৭৭, ২৪৭, ৩১৪
প্রমথনাথ বিশী ২২৬, ২২৮, ৩৭৭
'প্রলাপ' ১২
'প্রশ্ন' ৪৪, ৩৫০, ৩৫১
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ২৬৪, ৩০৩
'প্রহাসিনী' ৩[illegible]৭-৩৩৭
'প্রাণ' ৪৮, ৪৯
'প্রান্তিক' ৩১১, ৩২৬-৩৩০
প্রিয়নাথ সেন ২৭, ৬৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৭৭, ১৯৭
প্রিয়ম্বদা দেবী ২৬২
'প্রেমের অভিষেক' ১২০

বঙ্কিমচন্দ্র ২, ২৯১, ৩৯৩, ৩৯৭
'বঙ্গদর্শন' ১৮৭
'বঙ্গবীর' ৬১
'বঙ্গভাষার লেখক' ৯৩, ৯৬, ১০৩, ১৯৪

'বড়োদিন' ৩০৪
'বধূ' ৩৪০
'বনফুল' ৮, ১২, ১৩-১৪, ১৭
'বনবাণী' ২৬৫, ২৭২-২৭৯
'বনস্পতি' ২৫৯
'বন্দীবীর' ১৪৩
'বরণডালা' ২৬৩, ২৬৮
'বলাকা' ৫, ২৩, ২১৯-২৪৬, ২৬৫, ২৯২
'বসুন্ধরা' ৭৯, ৮২
'বর্ষ শেষ' ১৫১-১৫৩, ১৫৪, ১৫৬
'বাইশে শ্রাবণ' ৩৭২, ৩৭৭
বায়রণ ২১
'বালক' ১৮৭
'বাসা' ২৯৮
'বিচারক' ১৪৩
বিচিত্রা ২৮০
বিচিত্রিতা ৩০০, ৩০৭-৩০৮, ৩১২
'বিচ্ছেদ' ২৯৮
'বিজয়া' ২৫৯
'বিদায়' ১৯১-১৯২, ১৯৭
বিদ্যাপতি ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫
'বিপাশা' ২৫৯
'বিবেচনা-অবিবেচনা' ২১৯
'বিম্ববতী' ৭৪
'বিশ্বশোক' ৩০৫, ৩০৬
'বিশ্বপরিচয়' ৩৭১
'বিরহকাব্য' ৬২
বিহারীলাল ৮, ২৮
'বীথিকা' ৩১২-৩১৪
বীরগুরু ১৪২
বীরচন্দ্র মাণিক্য ২০
বীরেশ্বর গোস্বামী ৭২
বুদ্ধ ১১৭
'বুদ্ধভক্তি' ৩৪৭
'বৃক্ষবন্দনা' ২৭৫
বেন জনসন ২
বের্গসঁ ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ৩৮৪
'বৈকালী' ২৬০, ২৬৩
'বৈশাখ' ১৫৪-১৫৬
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৭৬, ১৭৭
ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান ১০৫, ২১০

'ভক্তমাল' ১৪৫
'ভগ্নতরী' ১৮-১৯
'ভগ্নহৃদয়' ৮, ১৭, ১৯-২৩
'ভবভূতি' ৭৬
'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ৪৬
'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ৪০, ৪৩-৪৭, ৪৮, ১৮০, ৩৯৬
'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ৪৭, ৫৪
ভারতী ১৯, ৪৭, ১৮৭
ভারতী ও বালক ১৮৭
'ভাষা ও ছন্দ' ১৪৭-১৪৯
ভিক্টোরিয়া ও কাম্পো ২৫৯
ভীরুতা ১৬৫
'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' ৭
'ভুলে' ৬৫
'ভ্রষ্টলগ্ন' ১৫৬

মণিলাল ১৯২
মধুসূদন ৭, ২৯১, ৩৯৮

'মরণ' ৪৪, ৪৭, ১৮০
'মহুয়া' ২২, ২৬৩-২৭২
'মংপু পাহাড়ে' ৩৪৮
'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ৩৪৮, ৩৫২, ৩৭০
'মাতাল' ১৬৫-১৬৬
'মানবপুত্র' ৩০৪, ৩০৮
'মানসসুন্দরী' ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫
মানসী' ৫, ৫০, ৫৬-৬৮, ৭৩, ৮২, ৮৯, ৯০, ১১৫, ১২৬, ১৩২, ১৪১
'মানসী কাব্যপাঠের ভূমিকা' ৬৪
'মানুষের ধর্ম' ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৮৫, ৮৭, ৯৪, ১০৮
'মায়া' ২৬৭
'মালতী পুঁথি' ৯
'মিঠে কড়া' ৫৩
মিলটন ২১, ১ ১
'মিলের কাব্য' ৩৩৬-৩৩৭
মীরাদেবী ১০০, ২১৪, ৩০৫
'মুকুল' ১৮৭
'মুক্তি' ২৭২
মৃণালিনী দেবী ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২২৫
'মৃত্যুশোক' ১৮২
মেণ্ডেল ১০০
'মেঘদূত' ৬২
'মেঘনাদবধ কাব্য' ২৪, ৪৭, ৩২৮
মৈত্রেয়ী দেবী ৭৭, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৭০
মোহিতচন্দ্র সেন ২৫, ৩৬, ১০৪, ১৬৫, ১৮৭, ১৮৮, ৩৯৩
মোহিতলাল ২, ১৪২
মৌলানা জিয়াউদ্দিন ৩০৯
যতিনাথ ঘোষ ১১
'যথাস্থান' ১৬২, ১৬৫
'যাত্রাগান' ২৪১
যাত্রী ২৩৬, ২৫৬, ২৫৭, ২৮৩-২৮৪
'যেতে নাহি দিব' ৭৮, ৭৯
'যৌবন বিদায়' ১৭৩
'রবিতীর্থে' ২২৫
'রবিরশ্মি' ১৫৯
'রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্রজীবন' ৩৪৯
'রবীন্দ্র কাব্যে পাঠভেদ' ২৫
'রবীন্দ্রজীবনী' ৯০, ৩০৯, ৩১৪
'রবীন্দ্রনাথ' ১০০
'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' ২৮২, ৩১২
রথীন্দ্রনাথ ২২১
রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী ৩২১
রমাদেবী ২৮৩
রমেশচন্দ্র ২৭
রাজকৃষ্ণ রায় ২৯১
রাজশেখর ২
রাজশেখর বসু ১৮
'রাজা' ৩০৬
'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' ৭৪
রানী চন্দ ৩৭৭
রানু মুখার্জী ৪৭
রামগড় ২২০, ২২১
রামপ্রসাদ ১৬০
রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ ১২
'রুদ্রচণ্ড' ৮, ১৯
'রুদ্ধগৃহ' ২২৮
রেণুকা ১৮৮
রোটেনস্টাইন ২০৩, ২০৪

'লক্ষ্যশূন্য' ২৩৬
লিটন, লর্ড ১১
'লিপি' ২৫৬, ২৫৭
'লিপিকা' ২৯১, ২৯২
লুথার ১১৭
'লেখন' ১৩৫, ২৬০-২৬৩
লোকেন্দ্রনাথ পালিত ৫৭, ১৫৮

'শঙ্খ' ২৪৪
শনিবারের চিঠি ৩২৩
শমীন্দ্রনাথ ১৮৩, ১৮৫, ১৯০
শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ডঃ) ১৪২
শান্তিনিকেতন ১৭৯, ২০২, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩
'শাপমোচন' ৩০৬, ৩০৮
'শাল' ৩১৪
'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' ১৪৩
'শিশু' ১৯৩, ১৪৯, ১৮৭-১৯২
'শিশুতীর্থ' ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮
'শিশুর জীবন' ২৪৯
'শিশু ভোলানাথ' ২৪৮-২৫২
'শুভ যোগ' ২৬৮
শেকস্‌পীয়র ২১
'শেলী' ১৬, ১২৪, ১৫৩, ১৮৫, ২৯২
'শেষ খেয়া' ১৯৯
'শেষ গান' ২৪৭
'শেষ প্রতিষ্ঠা' ২৪৭
'শেষ বসন্ত' ২৫৯
'শেষ শিক্ষা' ১৪১
'শেষ সপ্তক' ৩০৮-৩১৪
'শেষের কবিতা' ২৬৯, ২৮৪, ২৮৫, ২৯০
শৈলেশ ১৮৮
'শৈশব সংগীত' ৮, ৯, ১০, ১৩, ২২, ২৩, ৪৭
'শৈশব সন্ধ্যা' ৭৫
'শ্যামলী' ৩১৬-৩১৭
'শ্রান্তি' ৫০
'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' ১৪০
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৭৩
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬, ১৯৪, ১৯৬, ৩২৪

'সঞ্চয়িতা' ২৫, ৪৪, ৪৭, ৫৬
সতীশ রায় ১৯৭
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪
সনাতন গোস্বামী ১৪৫
সন্তোষকুমার মজুমদার ২১৪
'সন্ধান' ২৬৮
সন্ধ্যাসংগীত, ২২, ২৩-২৮, ২৯, ৩০, ৫৮
'সর্বনেশে' ২২১, ২৪৩
'সমাপন' ৩৭
'সমাপ্তি' ১৭৮
'সমুদ্রের প্রতি' ৮৭
'সম্পূরণ' ১৪৪
সবুজ পত্র ২১৯, ২৪৪
সবুজের অভিযান ২১৯
সল্লি (সরলাদেবী) ১৯
'সাড়ে নটা' ৩৪৮, ৩৪৯
'সাধনা' ১২০
'সাবিত্রী' ২৫২-৫৩, ৩১৫
'সাহিত্যতত্ত্ব' ৮৭, ১৬৩
'সাহিত্যের তাৎপর্য' ৩৭

,সিন্ধুপারে' ১১৩, ১৮৬
সিলভ্যাঁ লেভি ৩১৫
সুইনবার্ণ ১২৪
সুকুমার সেন (ডঃ) ৭৪
'সুখ' ১৫৭
সুধীরচন্দ্র কর ৩৪২, ৩৪৯
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ২৯৮, ৩০১, ৩৩৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডঃ)
১২২, ১২৫
'সুন্দর' ২৯৮
সুরেন্দ্রনাথ ৩১৬, ৩১৭
'সুপ্তোত্থিতা' ৭৪
সুশীলাদেবী ১৯০
সুক্তি কবিতা ২৬৩
সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদ ২৩০, ২৩২
২৩৫, ২৩৬
'সেঁজুতি ৩১১'
'সোনার তরী' ৬৮-৯২, ১২৯, ১৩১,
১৩২, ২৫০, ২৫৯, ২৭৯
'সোফিয়া' ১৭৭
'সৌন্দর্য' ২১০
সৌরীন্দ্র মিত্র ২০৪
'স্বদেশ ও সংকল্প' ১৭৯
'স্বপ্ন' ১৫৬
'স্বপ্ন মঙ্গল' ৯২
'স্বপ্নময়ী' ১১
'স্ফুলিঙ্গ' ১৩৫, ২৬০
'স্মরণ' ১৮০-১৮৭, ১৯৩
স্নেহলতা সেন ১১৫

'হতভাগ্যের গান' ১৫৬
'হাইকাই' ২৬২
'হাসির পাথেয়' ২৭৮
'হন্দু মেলায় উপহার' ১০
'হিং টিং ছট' ৯২
'হীরেণ মুখোপাধ্যায় ৩০৩
হৃদয় অরণ্য' ২৬
'হিমন্তবালা দেবী ১১৫
'হাক ভারতের জয়' ১০

Aristotle ১৪৯
Bradley ১ ১
Lett's Diary ৯
Religion of Man ১০৯
Stapford Brooke ২০৩, ২০৮,
২০৯, ২১৩
Tennyson ১৪৯
Yeats ২০৩